বাংলাদেশ
এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা

ISSN 1609-4409

ত্রিংশ খণ্ড	গ্রীষ্ম সংখ্যা	জৈষ্ঠ ১৪১৯/জুন ২০১২

সম্পাদক
নূরুর রহমান খান

সহযোগী সম্পাদক
প্রদীপ কুমার রায়

এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ
৫ পুরাতন সচিবালয় রোড (নিমতলী)
রমনা, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ

সম্পাদকীয় পর্ষৎ

সভাপতি	:	অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদ
সম্পাদক	:	অধ্যাপক নূরুর রহমান খান
সদস্য	:	অধ্যাপক নজরুল ইসলাম
		অধ্যাপক মাহফুজা খানম
		অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
		অধ্যাপক হাবিবা খাতুন
		অধ্যাপক ভীষ্মদেব চৌধুরী

মূল্য	:	২০০.০০ টাকা
প্রকাশক	:	সাধারণ সম্পাদক
		এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ

মুদ্রণ	:	নূর প্রিন্টিং প্রেস
		১৯/১, নীলক্ষেত, কাঁটাবন, ঢাকা

Bangladesh Asiatic Society Patrika (Bengali Journal) edited by Professor Nurur Rahman Khan, published by the General Secretary, The Asiatic Society of Bangladesh, 5 Old Secretariat Road, Nimtali, Ramna, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 02-7168940

Price : Tk. 200.00
US$ 10.00

সূচিপত্র

বাংলা ব্যাকরণের আলোকে সমাসের শ্রেণীকরণ : একটি সমীক্ষা
অসীম সরকার ১

রবীন্দ্রনাথের ভাষা-চিন্তা
সেলিনা জেসমিন ও রওশন আরা ৫৫

ভারতীয় শিক্ষা কমিশনে (১৮৮২) নবাব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী ও সৈয়দ আমির হোসাইনের সাক্ষ্য : একটি পর্যালোচনা
মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম ৭৭

বাংলার প্রাক-মুঘল শিলালিপিতে হাদিসের ব্যবহার : একটি পর্যালোচনা
মোহাম্মদ মাহমুদুর রহমান ১০৭

উনিশ শতকে বাংলায় পাটচাষ বিরোধী আন্দোলন
এস.এম. রেজাউল করিম রেজা ১১৯

আরজান শাহ্'র গানে ভজন-সাধন
মো. আবদুল ওহাব ১৪৫

লেখকদের জ্ঞাতব্য

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা-য় এশিয়ার সমাজ, সাহিত্য, শিক্ষা, দর্শন ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে রচিত মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। লেখকদের জ্ঞাতার্থে পত্রিকায় প্রবন্ধ জমা দেয়ার নিয়মাবলি নিম্নে প্রদত্ত হলো:

১. পত্রিকায় প্রকাশের জন্য দুই কপি পাণ্ডুলিপি কম্পিউটার কম্পোজ করে সিডিসহ জমা দিতে হবে। কম্পিউটার কম্পোজ করার নিয়ম নিম্নরূপ:

- কম্পিউটার কম্পোজ করার জন্য বাংলা বিজয় সফটওয়্যার ব্যবহার করতে হবে (ভারসন বিজয় ৪.০ বা বিজয় ২০০৩)। টাইপ/ ফন্ট SutonnyMJ ব্যবহার করতে হবে।
- কাগজের সাইজ A4। প্রতি পৃষ্ঠায় মার্জিন থাকবে উপরে ২ ইঞ্চি, নিচে ২ ইঞ্চি, ডানে ১ ইঞ্চি এবং বামে ১.৬ ইঞ্চি। প্রবন্ধে লেখকের পেশাগত পরিচয় ও ঠিকানা থাকতে হবে।

২. প্রত্যেক প্রবন্ধের সাথে লেখক-কে/-দের এই মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে যে:

- জমাকৃত প্রবন্ধের লেখক তিনি/ তাঁরা;
- এটি একটি মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ;
- প্রবন্ধটি ইতঃপূর্বে অন্য কোনো পত্রিকা বা গ্রন্থে প্রকাশিত হয়নি কিংবা প্রকাশের জন্য অন্য কোথাও জমা দেওয়া হয়নি;
- এই প্রবন্ধ বিষয়ক সকল দায়িত্ব লেখক বহন করবেন।

৩. প্রকাশের জন্য মনোনীত কিংবা অমনোনীত কোনো পাণ্ডুলিপি ফেরত দেওয়া হয় না। প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে লেখক পত্রিকার একটি কপি ও প্রবন্ধের ১০ কপি অফপ্রিন্ট বিনা মূল্যে পাবেন।

৪. প্রবন্ধ *বাংলা একাডেমী প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম* অনুসরণে অথবা *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান*, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, *চলন্তিকা* প্রভৃতি অভিধানের প্রথম ভুক্তি (entry) অনুযায়ী রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫. উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে মূল বানানের কোনো পরিবর্তন হবে না। লেখক কোনো বিশেষ বানান-বৈশিষ্ট্য রক্ষায় সচেষ্ট হলে তা অক্ষুণ্ন রাখা হবে। টীকা ও বক্তব্যের উৎস ও উল্লেখ স্বতন্ত্রভাবে করতে হবে। টীকার ক্ষেত্রে শব্দের উপর সুপারস্ক্রিপ্টে (যেমন বাংলাদেশ[১]) সংখ্যা ব্যবহার করাই নিয়ম। প্রবন্ধের শেষে সংখ্যা অনুসারে টীকা উপস্থাপন করতে হবে।

৬. বক্তব্যের উৎস উল্লেখের ক্ষেত্রে সরাসরি গ্রন্থ বা প্রবন্ধ-লেখকের নাম, প্রকাশকাল ও পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করতে হবে। এশীয়, বিশেষত বাংলার মুসলমানদের নাম পূর্ণভাবে লেখা যাবে। কিন্তু ইউরোপীয় নামের ক্ষেত্রে প্রথমে পদবি ব্যবহার করা হবে।

৭. মূল পাঠের মধ্যে উদ্ধৃতি তিন লাইনের বেশি হলে পৃথক অনুচ্ছেদে তা উপস্থাপন করতে হবে। কবিতার উদ্ধৃতিতে মূলের পঙ্‌ক্তি-বিন্যাস রক্ষা করতে হবে।

৮. বই ও পত্রিকার নাম বাঁকা (italics) অক্ষরে হবে (যেমন, বই: *বৃহৎ বঙ্গ;* পত্রিকা: *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*)। মূল পাঠে বিদেশী শব্দ থাকলে তা-ও একই নিয়মে লিখতে হবে। বিদেশী শব্দ বাংলা বর্ণীকরণের নিয়ম অনুযায়ী লিখিত হবে। কিন্তু ব্যক্তি ও বইয়ের নাম প্রথমবার উল্লেখের সময় তা প্রথম বন্ধনীর মধ্যে ইংরেজিতে লিখতে হবে।

৯. প্রবন্ধের শেষে টীকা (যদি থাকে) এবং টীকার পরে গ্রন্থপঞ্জি সংযোজিত হবে। প্রত্যেক ভাষার গ্রন্থ ও প্রবন্ধ পৃথকভাবে উপস্থাপিত হবে এবং এ উপস্থাপনরীতি হবে বর্ণানুক্রমিক। গ্রন্থের একাধিক লেখক থাকলে গ্রন্থপঞ্জিতে সকলের নাম উল্লেখ থাকতে হবে।

১০. প্রবন্ধের একটি সারসংক্ষেপ অবশ্যই দিতে হবে।

এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ

কাউন্সিল ২০১২-২০১৩

সভাপতি	:	অধ্যাপক নজরুল ইসলাম
সহ-সভাপতি	:	অধ্যাপক মাহফুজা খানম
		অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদ
		অধ্যাপক খন্দকার বজলুল হক
কোষাধ্যক্ষ	:	অধ্যাপক আমিরুল ইসলাম চৌধুরী
সাধারণ সম্পাদক	:	অধ্যাপক আহমেদ এ. জামাল
সম্পাদক	:	অধ্যাপক এ কে এম গোলাম রব্বানী
সদস্য	:	অধ্যাপক আনিসুজ্জামান (ফেলো)
		অধ্যাপক সুফিয়া আহমেদ (ফেলো)
		অধ্যাপক আব্দুল মমিন চৌধুরী
		অধ্যাপক মেজবাহুস সালেহীন
		অধ্যাপক জিয়া উদ্দীন আহমেদ
		অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম
		জনাব একরাম আহমেদ
		অধ্যাপক হামিদুজ্জামান খান
		অধ্যাপক ফকরুল আলম
		অধ্যাপক আকমল হোসেন
		অধ্যাপক প্রদীপ কুমার রায়

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, ত্রিংশ খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৯/জুন ২০১২

বাংলা ব্যাকরণের আলোকে সমাসের শ্রেণীকরণ : একটি সমীক্ষা

অসীম সরকার*

সারসংক্ষেপ

সমাসের স্বরূপ এবং ব্যবহার জানতে হলে এর শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা থাকা প্রয়োজন। প্রাচীন বৈয়াকরণগণ পদের প্রাধান্যের ভিত্তিতে সমাসকে অব্যয়ীভাব, তৎপুরষ, দ্বন্দ্ব ও বহুব্রীহি এই চার ভাগে ভাগ করেছেন। কর্মধারয় ও দ্বিগু তৎপুরুষ সমাসের অন্তর্ভুক্ত। কোনো কোনো বৈয়াকরণ এই চতুর্বিধ শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে একমত পোষণ করেননি। তাঁদের মতে কর্মধারয় ও দ্বিগু স্বতন্ত্র সমাস। এ হিসেবে সমাস ছয় প্রকার। আবার লুক্ ও অলুক্, নিত্য ও অনিত্য প্রভৃতিভেদেও সমাসের শ্রেণীবিভাগ পরিলক্ষিত হয়। বক্তার ইচ্ছা অনুসারে একই পদ নানা ব্যঞ্জনায় রূপ পরিগ্রহ করে। এ কারণে একই পদে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশিত হয়। এই অর্থগত ভিন্নতার কারণে একই পদে ভিন্ন ভিন্ন সমাস হয় এবং একই সমাসের ভিন্ন ভিন্ন রূপও হয়। বৈয়াকরণগণও ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণপূর্বক সমাসের শ্রেণীবিভাগ করেছেন এবং এ বিষয়ে বৈয়াকরণদের মধ্যে মতভেদও পরিদৃষ্ট হয়। তবে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমাসের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীবিভাগ করা হলেও পদার্থের প্রাধান্যের ভিত্তিতে বিভক্ত অব্যয়ীভাবাদি চতুর্বিধ (মতান্তরে ষড়্বিধ) শ্রেণীবিভাগই অধিকাংশ বৈয়াকরণ গ্রহণ করেছেন। সমাসের কোনো কোনো শ্রেণীবিভাগ আপাতদৃষ্টিতে অপ্রয়োজনীয় বা অবান্তর মনে হতে পারে, কিন্তু কোনো শ্রেণীবিভাগই অপ্রয়োজনীয় বা অবান্তর নয়। সমাসের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে হলে তথা সমাসের সামগ্রিক মূল্যায়নের জন্য সকল প্রকার শ্রেণীবিভাগই জ্ঞাতব্য। আলোচ্য প্রবন্ধে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমাসের শ্রেণীবিভাগ আলোচনাপূর্বক এ বিষয়ে একটি স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করার চেষ্টা করা হয়েছে।

বাংলা ব্যাকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সমাস। শব্দগঠনের অন্যতম উপায় বা রীতি হচ্ছে সমাস। পরস্পর অর্থসঙ্গতিপূর্ণ দুই বা ততোধিক পদের সমন্বয়ে নতুন অর্থবোধক পদ সৃষ্টির প্রক্রিয়া হলো সমাস। সমাস শব্দের অর্থ সংক্ষেপ। ভাষায় সমাসের প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করা। বাক্যে শব্দের ব্যবহার সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যেই সমাসের সৃষ্টি। পরস্পর অর্থসম্বন্ধযুক্ত (অর্থের দিক থেকে মিল রয়েছে এমন) দুই বা ততোধিক পদের একপদে সংক্ষিপ্ত হওয়া বা একপদে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াই সমাস। যেমন– বৃক্ষের ছায়া = বৃক্ষচ্ছায়া। 'বৃক্ষের ছায়া' বাক্যে পদদুটির মধ্যে একটি অর্থগতসম্বন্ধ রয়েছে। 'বৃক্ষের ছায়া' না বলে 'বৃক্ষচ্ছায়া' বললে শুধু যে কেবল সংক্ষেপে বলা হলো তা নয়, সুন্দর করেও বলা হলো। বাগ্‌যন্ত্রের সুবিধা ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের আনন্দ একই সঙ্গে বিধান

* সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

করার এ কৌশল বা প্রক্রিয়াটি ব্যাকরণে সমাস বলে পরিচিত। সমাস কেবল বাক্যকে সংক্ষিপ্তই করে না, বাক্যের শ্রুতিমাধুর্য এবং ভাব প্রকাশের শক্তিও বৃদ্ধি করে। পরিভাষা সৃষ্টিতেও সমাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনাবশ্যকভাবে বড় আকারে প্রকাশ না করে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করা হলে বক্তব্য অর্থবহ, তাৎপর্যপূর্ণ ও ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে। সমাসের মাধ্যমে ভাষা সহজ-সরল, শ্রুতিমধুর, প্রাঞ্জল ও ছন্দোময় হয়। এসব কারণে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমাসের ব্যবহার ও গুরুত্ব লক্ষণীয়।

সমাসের স্বরূপ এবং ব্যবহার সম্বন্ধে যথার্থভাবে জানতে হলে এর শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা থাকা প্রয়োজন, নতুবা সমাসের তত্ত্বগত বিশেষ প্রতীতি লাভ সম্ভব নয়। দৃষ্টিভেদে সমাসের অনেক প্রকার বিভাগ হতে পারে। বৈয়াকরণগণও ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমাসের শ্রেণীবিভাগ করেছেন এবং এ বিষয়ে বৈয়াকরণদের মধ্যে বিভিন্ন মত রয়েছে। সমাসের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকলে সমাসের ব্যবহার সহজতর হয়। এ কারণেই আলোচ্য প্রবন্ধে সমাসের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করার চেষ্টা করা হয়েছে।

বাংলা ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুগামী, সমাসের শ্রেণীবিভাগের ক্ষেত্রেও এটা পরিলক্ষিত হয়।[১] সংস্কৃত ব্যাকরণে প্রাচীন বৈয়াকরণগণ সমাস-বিধি অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করে অর্থাৎ সমাসের গঠন এবং পূর্বপদ ও উত্তরপদের (বা পরপদের) পরস্পর সম্পর্ক, আর সমস্তপদের অর্থ অনুযায়ী সমাসের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। সমাস সাধারণত দুই পদে অর্থাৎ পূর্বপদ ও উত্তরপদে গঠিত হয়। সমাসগঠনে কোথাও প্রত্যেকটি সমস্যমান পদের অর্থ অর্থাৎ দুটো পদের অর্থ প্রধানভাবে বোঝায়, কোথাও পূর্বপদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, কোথাও উত্তরপদের অর্থ প্রধান হয়, আবার কোথাওবা পূর্ব বা উত্তর কোনো পদের অর্থ প্রধান না হয়ে তদাশ্রিত একটি পৃথক অর্থ ফুটে ওঠে অর্থাৎ অনুল্লিখিত তৃতীয় কোনো পদের অর্থ প্রধানভাবে বোঝায়। প্রাচীন বৈয়াকরণগণও পদের প্রাধান্যের ভিত্তিতে অর্থাৎ সমাসবদ্ধ পদের অর্থ, বিশেষত উপাদান অংশের অর্থগত প্রাধান্য অনুসারে সমাসকে চার ভাগে ভাগ করে অব্যয়ীভাবাদি নামে অভিহিত করেছেন। এরূপ বিভাগের ভিত্তি হচ্ছে – (১) পূর্বপদের অর্থের প্রাধান্য, (২) উত্তরপদের অর্থের প্রাধান্য, (৩) অন্যপদের অর্থের প্রাধান্য ও (৪) উভয়পদের অর্থের প্রাধান্য। এরূপ অর্থগত প্রাধান্য অনুযায়ী যথাক্রমে অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি ও দ্বন্দ্ব নামে চার প্রকার সমাসের কথা স্বীকৃত।[২] যে সমাসে পূর্বপদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তা অব্যয়ীভাব সমাস; যে সমাসে উত্তরপদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তা তৎপুরুষ সমাস; যে সমাসে সমস্যমান পদসমূহের কোনোটির অর্থ প্রধান না হয়ে অন্যপদের অর্থ প্রধান হয়, তা বহুব্রীহি সমাস; যে সমাসে উভয়পদের অর্থাৎ প্রতিটি পদেরই অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তা দ্বন্দ্ব সমাস।

সমাসগঠনের মূল ভিত্তি ন্যূনপক্ষে দুটি পদ, এ কারণে অর্থপ্রাধান্যের দিক থেকে সমাস চার শ্রেণীর অধিকভাগে বিভক্ত হওয়া সম্ভব নয়। তবে সকল বৈয়াকরণ সমাসের এরূপ শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে একমত নন। অব্যয়ীভাবাদি চতুর্বিধ সমাস ব্যতীত আরো দুটি সমাসের অস্তিত্ব (বিভাগ) স্বীকার করা হয়। অর্থাৎ অনেক বৈয়াকরণের মতে কর্মধারয় ও দ্বিগু স্বতন্ত্র সমাস; সে হিসেবে কর্মধারয়াদিভেদে সমাস ষড়্‌বিধ (ছয় প্রকার)। যেমন– অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ, দ্বন্দ্ব, বহুব্রীহি, কর্মধারয় ও দ্বিগু। কিন্তু ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে সমাস পাঁচ প্রকার। তিনি বলেছেন, "সমাস সাধারণতঃ পাঁচ প্রকার– দ্বন্দ্ব, তৎপুরুষ, কর্মধারয়, বহুব্রীহি, অব্যয়ীভাব।"[৩] তিনি কর্মধারয় সমাসকে স্বতন্ত্র সমাস এবং দ্বিগু সমাসকে কর্মধারয় সমাসের অন্তর্গত বিবেচনা করে সমাসকে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক পূর্বপদ ও পরপদের অর্থের গুরুত্ব বিবেচনা করে সমাসকে অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ, দ্বন্দ্ব ও বহুব্রীহি– এই চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। যেমন –

"(১) পূর্ব-পদের অর্থ-প্রধান সমাস – অব্যয়ীভাব
(২) উত্তর বা পর-পদের অর্থ-প্রধান সমাস – তৎপুরুষ
(৩) উভয় পদের অর্থ-প্রধান সমাস – দ্বন্দ্ব
(৪) উভয় পদের অর্থাশ্রিত তৃতীয় অর্থদ্যোতক সমাস – বহুব্রীহি।"[৪]

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক (১) নিত্য-সমাস; (২) প্রাদি-সমাস; (৩) কর্মধারয়-সমাস; (৪) নঞ্-সমাস; (৫) উপপদ-সমাস; (৬) দ্বিগু-সমাস; (৭) অলুক-সমাস; (৮) সুপ্‌সুপা-সমাস শ্রেণীগুলোরও উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে এই সমাসগুলোর কোনোটিই নতুন বা স্বতন্ত্র সমাস নয়। তিনি বলেছেন, "প্রকৃতপক্ষে, এই সমাসগুলিকে নূতন বা পৃথক্ সমাস বলিয়া গণ্য করা যায় না। এইগুলিকে উপরোক্ত চতুর্বিধ সমাসের কোন-না-কোন একটির মধ্যে অর্থ-প্রাধান্যের দিক্ হইতে সহজেই ফেলিয়া দেওয়া যায়।"[৫]

ড. মাহবুবুল হকও পদার্থের প্রাধান্যবিচারে সমাসকে চারভাগে ভাগ করেছেন। তবে তৎকৃত শ্রেণীবিভাগে একটু ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন –

"(১) পূর্বপদের অর্থ প্রধান: অব্যয়ীভাব ও দ্বিগু
(২) পরপদের অর্থ প্রধান: তৎপুরুষ ও কর্মধারয়
(৩) পূর্ব ও পরপদ – উভয় পদের অর্থই প্রধান: দ্বন্দ্ব
(৪) পূর্ব ও পরপদের অর্থ গৌণ, তৃতীয় অর্থ প্রধান: বহুব্রীহি।"[৬]

পূর্বপদে সংখ্যাবাচক বিশেষণ ও উত্তরপদে বিশেষ্য যোগে দ্বিগু সমাস হয় বলে পদ বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এই সমাসের সঙ্গে কর্মধারয় সমাসের সাদৃশ্য রয়েছে। এ কারণে অধিকাংশ বৈয়াকরণের মতে দ্বিগু সমাস কর্মধারয় সমাসের অন্তর্ভুক্ত এবং কর্মধারয় সমাস তৎপুরুষ সমাসের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ড. মাহবুবুল হককৃত সমাসের উপর্যুক্ত শ্রেণীবিভাগ থেকে

এটা বোঝা যাচ্ছে যে, তাঁর মতে কর্মধারয় ও দ্বিগু স্বতন্ত্র সমাস। এছাড়া তাঁর মতে অব্যয়ীভাব সমাসের ন্যায় দ্বিগুও পূর্বপদার্থপ্রধান সমাস। তিনি বলেছেন, "অর্থের দিক থেকে দ্বিগু সমাসে পূর্বপদের অর্থই প্রধান। কারণ, পূর্বপদের সংখ্যাবাচক শব্দ উত্তরপদের অর্থকে সীমাবদ্ধ বা নির্দিষ্ট করে দেয়। যেমন: ত্রিভুজ শব্দের পূর্বপদ ত্রি (তিন) সংখ্যাবাচক বিশেষণ হিসেবে উত্তরপদ ভুজ (বাহু) শব্দের সংখ্যাকে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে।"[৭] উল্লেখ্য যে, অধিকাংশ বৈয়াকরণের মতে দ্বিগু তৎপুরুষের ন্যায় পরপদপ্রাধান সমাস।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ* গ্রন্থে (প্রকৃতি অনুসারে) সমাসকে ৩টি প্রধান বিভাগে ভাগ করেছেন। যেমন– (১) সংযোগ-মূলক বা দ্বন্দ্ব সমাস, (২) ব্যাখ্যান-মূলক বা আশ্রয়-মূলক সমাস এবং (৩) বর্ণনা-মূলক সমাস।[৮] পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য-প্রণীত *ভাষাবিদ্যা পরিচয়* এবং মুহাঃ মনসূর উর রহমান-প্রণীত *ভাষা পরিক্রমা* (দ্বিতীয় পর্ব) গ্রন্থেও সমাসের এরূপ তিন প্রকার শ্রেণীবিভাগ পরিদৃষ্ট হয়।[৯]

(১) **সংযোগ-মূলক সমাস:** এই সমাসে সমস্যমান পদসমূহ দ্বারা দুই বা ততোধিক পদার্থের (বস্তুর বা ভাবের) সংযোগ বা সম্মিলন প্রকাশিত হয়। মিলিত পদগুলোর মধ্যে কোনোটি কারও অধীন হয়ে থাকে না। দ্বন্দ্ব সমাস এই জাতীয় সমাস। 'দ্বন্দ্ব' শব্দের একটি অর্থ মিলন। এ সমাসে অর্থ-প্রাধান্য রক্ষিত অবস্থায় এক পদের সঙ্গে অন্য পদের মিলন ঘটে। ও, এবং, আর, বা, কিংবা ইত্যাদি (সংযোজক) অব্যয়ের সাহায্যে এ সমাসের ব্যাসবাক্য করতে হয়। যেমন – ভাই ও বোন = ভাইবোন, চা ও চিনি = চাচিনি, রাম এবং শ্যাম = রামশ্যাম, হার বা জিত = হারজিত ইত্যাদি।

(২) **ব্যাখ্যান-মূলক বা আশ্রয়-মূলক সমাস:** এই সমাসে প্রথম শব্দটি দ্বিতীয় শব্দটিকে সীমাবদ্ধ করে দেয়, কিংবা তার বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয় যেন তাকে আশ্রয় করে থাকে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও মুহাঃ মনসূর উর রহমানের মতে তৎপুরুষ, কর্মধারয় ও দ্বিগু এই তিন প্রকার সমাস ব্যাখ্যান-মূলক সমাসের অন্তর্ভুক্ত।[১০] কিন্তু ঋষিদাসের মতে তৎপুরুষ, কর্মধারয়, দ্বিগু ও অব্যয়ীভাব এই চার প্রকার সমাস ব্যাখ্যান-মূলক সমাসের অন্তর্ভুক্ত (পরে উল্লিখিত)। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য কিন্তু অব্যয়ীভাবকে তৎপুরুষের অন্তর্ভুক্ত সমাসরূপে উল্লেখ করেছেন (এ বিষয়ে অব্যয়ীভাব ও প্রাদি সমাসের আলোচনা প্রসঙ্গে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে)।

(৩) বর্ণনা-মূলক সমাস: এই সমাসে সমস্যমান পদগুলো মিলে যে অর্থ প্রকাশ করে তার দ্বারা অপর কোনো পদার্থের বর্ণনা হয়। বর্ণনা-মূলক সমাস বহুব্রীহি নামে অভিহিত। বর্ণনা-মূলক সমাসে কোনো পদের অর্থই প্রধান নয়, পূর্বপদ বা পরপদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়। যেমন – দশ আনন যার = দশানন। 'দশানন' এই সমাসবদ্ধ পদের অর্থ দশও নয়, আননও নয়। 'দশানন' পদটি দশটি আননবিশিষ্ট ব্যক্তিকে

অর্থাৎ রাবণকে বোঝায়। এরূপ – নীল কণ্ঠ যার = নীলকণ্ঠ, দশ বছর বয়স যার = দশবছুরে ইত্যাদি।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত *সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙলা ব্যাকরণ* গ্রন্থে কিন্ত সমাসের উপর্যুক্ত ত্রিবিধ শ্রেণীবিভাগ দৃষ্ট হয় না। এ গ্রন্থে বলা হয়েছে, "সংস্কৃতে সমাস ছ'প্রকারের ধরা হয়ে থাকে: 'দ্বন্দ্ব', 'তৎপুরুষ', 'কর্মধারয়', 'দ্বিগু', 'বহুব্রীহি', 'অব্যয়ীভাব'। কর্মধারয়কে তৎপুরুষের এবং দ্বিগুকে কর্মধারয়ের অন্তর্গত বলে ধরলে, সমাস মুখ্যতঃ চার প্রকারের হয়।"[১১] এ গ্রন্থে নিত্য-সমাস, অলুক্-সমাস, অসংলগ্ন সমাস, মিশ্র সমাস বা পদগর্ভ সমাস সম্বন্ধেও আলোচনা দৃষ্ট হয়।

বামনদেব চক্রবর্তীর মতে সমাস ছয় প্রকার। তিনি বলেছেন, "সংস্কৃতে সমাস প্রধানতঃ চারিপ্রকার – দ্বন্দ্ব, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি ও অব্যয়ীভাব। কর্মধারয় তৎপুরুষের অন্তর্ভূত, এবং দ্বিগু আবার কর্মধারয় সমাসের অন্তর্ভূত। কিন্ত আমরা বাংলা সমাসকে মোটামুটি ছয় প্রকার ধরিয়া লইয়াছি – দ্বন্দ্ব, তৎপুরুষ, কর্মধারয়, দ্বিগু, বহুব্রীহি ও অব্যয়ীভাব।"[১২]

সমাসের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে মাহবুবুল আলম বলেছেন, "সমাস ছয় প্রকার। যেমন: দ্বন্দ্ব, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি, কর্মধারয়, অব্যয়ীভাব ও দ্বিগু। এই প্রধান শ্রেণীবিভাগ ছাড়াও কোন কান সমাসের উপবিভাগ রয়েছে। কারও কারও মতে কর্মধারয় ও দ্বিগু সমাস তৎপুরুষ সমাসের শ্রেণীভুক্ত। সেদিক থেকে সমাস চার প্রকার বলে বিবেচিত হতে পারে।"[১৩] তিনি পদার্থের প্রাধান্যের ভিত্তিতে সমাসকে চার ভাগে ভাগ করেছেন; যেমন –

"১। পূর্বপদ প্রধান: অব্যয়ীভাব সমাস, যেমন: ভিক্ষার অভাব = দুর্ভিক্ষ।
২। পরপদ প্রধান: তৎপুরুষ, কর্মধারয়, দ্বিগু, যেমন: গাকে ধোয়া = গাধোয়া; লোনা যে পানি = লোনাপানি; সপ্ত অহের সমাহার = সপ্তাহ।
৩। উভয় পদ প্রধান: দ্বন্দ্ব, যেমন: ছেলে ও মেয়ে = ছেলেমেয়ে।
৪। ভিন্ন অর্থ: বহুব্রীহি, যেমন : চার পা যার = চারপেয়ে।"[১৪]

সমাসের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে ঋষিদাস বলেছেন, "সমাস প্রধানতঃ ছয় প্রকার: ১. দ্বন্দ্ব, ২. তৎপুরুষ, ৩. কর্মধারয়, ৪. বহুব্রীহি, ৫. দ্বিগু ও ৬. অব্যয়ীভাব। এইগুলি ছাড়া আরও কয়েক প্রকার সমাস আছে – অলুক, মিশ্র, নিত্য ও সুপ্সুপা। অবশ্য, কর্মধারয় ও দ্বিগু মূলতঃ তৎপুরুষেরই অন্তর্গত। সেই হিসাবে সমাস প্রধানতঃ চারি-প্রকার বলাও চলে।"[১৫] তিনি সমাসগুলোকে অর্থের দিক থেকে প্রধান তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন– "১. সংযোগমূলক – দ্বন্দ্ব সমাস; ২. বর্ণনামূলক – বহুব্রীহি সমাস; ৩. ব্যাখ্যানমূলক – তৎপুরুষ, কর্মধারয়, দ্বিগু ও অব্যয়ীভাব।"[১৬]

ঋষিদাস আবার সমস্যমান পদের প্রাধান্য অনুসারে সমাসগুলোকে চার ভাগে ভাগ করেছেন; যেমন– "১. পূর্বপদপ্রধান – অব্যয়ীভাব; ২. পরপদপ্রধান – তৎপুরুষ, কর্মধারয় ও দ্বিগু; ৩. উভয়পদপ্রধান – দ্বন্দ্ব; ৪. অন্যপদপ্রধান – বহুব্রীহি।"[১৭]

সমাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সমস্যমান পদদুটি কোথাও বিশেষ্য, কোথাও বিশেষ্য-বিশেষণ ভাবাপন্ন, কোথাওবা তাদের একটি অব্যয়। ড. মাহবুবুল হক সমাস বিশ্লেষণপূর্বক সমস্যমান পদদুটির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য অনুসারে তথা পূর্বপদ ও পরপদ বিশেষ্য, বিশেষণ, নাকি অব্যয় তা বিবেচনা করে সমাসের নিম্নরূপ শ্রেণীবিভাগও করেছেন।

"১। পূর্বপদ ও পরপদ – দুটিই বিশেষ্য: দ্বন্দ্ব
২। পূর্বপদ বিশেষ্য বা বিশেষণ এবং পরপদ বিশেষ্য বা বিশেষণ: কর্মধারয়, বহুব্রীহি
৩। পূর্বপদ অব্যয়: অব্যয়ীভাব
৪। পূর্বপদ সংখ্যাবাচক বিশেষণ শব্দ: দ্বিগু
৫। পূর্বপদে কারক-সম্পর্কজাত বিশেষ্য: তৎপুরুষ "[১৮]

১। **পূর্বপদ ও পরপদ – দুটিই বিশেষ্য:** ড. মাহবুবুল হকের মতে দ্বন্দ্ব এই শ্রেণীর সমাস। কেননা দ্বন্দ্ব সমাসে সাধারণত পূর্বপদ ও পরপদ উভয়ই বিশেষ্য; যেমন – কালি ও কলম = কালিকলম, এখানে পূর্বপদ 'কালি' এবং পরপদ 'কলম' উভয়ই বিশেষ্য। এরূপ – চা ও বিস্কুট = চাবিস্কুট, ঘর ও বাড়ি = ঘরবাড়ি ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে, বিশেষ্য ভিন্ন অন্য পদের যোগেও দ্বন্দ্ব সমাস হয়। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বলেছেন, "বিশেষ্যে-বিশেষ্যে; বিশেষণে-বিশেষণে; ক্রিয়ায়-ক্রিয়ায়; সর্বনামে-সর্বনামে; ক্রিয়াবিশেষণে-ক্রিয়াবিশেষণে দ্বন্দ্ব-সমাস গঠিত হয়।"[১৯] ড. মাহবুবুল হকও দ্বন্দ্ব-সমাসকে (১) বিশেষ্য-বিশেষ্য জাতীয় দ্বন্দ্ব, (২) বিশেষণ-বিশেষণ জাতীয় দ্বন্দ্ব, (৩) ক্রিয়াবিশেষ্য-ক্রিয়াবিশেষ্য জাতীয় দ্বন্দ্ব এবং (৪) ক্রিয়া-ক্রিয়া জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রভৃতি কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন।[২০]

(ক) দুটি বিশেষণ পদেও দ্বন্দ্ব সমাস হয়; যেমন – লাল ও নীল = লালনীল, ভালো ও মন্দ = ভালোমন্দ ইত্যাদি।

(খ) দুটো সর্বনাম পদেও দ্বন্দ্ব সমাস হয়; যেমন – তুমি ও আমি / তুমি আর আমি = তুমি-আমি, যে ও সে = যে-সে। এরূপ– যাকে-তাকে, যার-তার ইত্যাদি।

(গ) দুটো ক্রিয়াপদের যোগেও দ্বন্দ্ব সমাস হয়; যেমন – নাচ ও গাও = নাচ-গাও, দেখে ও শুনে = দেখে-শুনে ইত্যাদি।

(ঘ) দুটো ক্রিয়াবিশেষণ পদের যোগেও দ্বন্দ্ব সমাস হয়; যেমন – ধীরে ও সুস্থে = ধীরে-সুস্থে। এরূপ – আগে-পাছে, পাকে-প্রকারে ইত্যাদি।

(ঙ) দুটো সংখ্যাবাচক শব্দের যোগেও দ্বন্দ্ব সমাস হয়; যেমন– সাত ও পাঁচ = সাত-পাঁচ। এরূপ – নয়-ছয়, সাত-সতের, উনিশ-বিশ ইত্যাদি।

ড. মাহবুবুল হকের মতে দুটো বিশেষ্য পদের সমাস হচ্ছে দ্বন্দ্ব। কিন্তু জজসাহেব (যিনি জজ তিনিই সাহেব), গোলাপফুল (যা গোলাপ তাই ফুল) ইত্যাদি সমাসবদ্ধ পদের উভয় পদই বিশেষ্য, কিন্তু এগুলো কর্মধারয় সমাস, দ্বন্দ্ব সমাস নয়। দুটো বিশেষ্য পদের সমন্বয়ে বহুব্রীহি সমাসও হয়; যেমন – পদ্ম নাভিতে যার = পদ্মনাভ, এখানে 'পদ্মনাভ' এই সমাসবদ্ধ পদের উভয় পদই বিশেষ্য। এরূপ – আশীতে বিষ যার = আশীবিষ, উর্ণা নাভিতে যার = উর্ণনাভ ইত্যাদি।

অতএব উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বিশেষ্য পদের সঙ্গে বিশেষ্য পদের সমাস হলেই তা দ্বন্দ্ব সমাস হবে, আর দ্বন্দ্ব হলেই তা বিশেষ্য পদের সঙ্গে বিশেষ্য পদের সমাস, একথা সর্বতোভাবে গ্রাহ্য নয়। মূল কথা হচ্ছে, যে ক্ষেত্রে প্রতিটি সমস্যমান পদের অর্থের প্রাধান্য বর্তমান থাকে সেক্ষেত্রেই সমাস দ্বন্দ্ব নামে স্বীকৃত।

২। **পূর্বপদ বিশেষ্য বা বিশেষণ এবং পরপদ বিশেষ্য বা বিশেষণ:** ড. মাহবুবুল হকের মতে কর্মধারয় ও বহুব্রীহি সমাস এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কর্মধারয় ও বহুব্রীহি সমাসে সমস্যমান পদগুলো সাধারণত বিশেষ্য-বিশেষণ ভাবাপন্ন; যেমন –

(ক) **কর্মধারয়:** পুণ্য যে ভূমি = পুণ্যভূমি, এখানে পূর্বপদ 'পুণ্য' বিশেষণ এবং পরপদ 'ভূমি' বিশেষ্য। যে চালাক সে চতুর = চালাকচতুর, এখানে পূর্বপদ ও পরপদ উভয়ই বিশেষণ। যিনি রাজা তিনি ঋষি = রাজর্ষি, এখানে পূর্বপদ ও পরপদ উভয়ই বিশেষ্য।

কর্মধারয় সমাস সাধারণত (১) বিশেষণ ও বিশেষ্য, (২) বিশেষণ ও বিশেষণ, (৩) বিশেষ্য ও বিশেষ্য এবং (৪) বিশেষ্য ও বিশেষণ পদযোগে গঠিত হয়; যেমন –

(১) বিশেষণ পদের সঙ্গে বিশেষ্য পদের যোগে গঠিত কর্মধারয়: ঝরা যে পাতা = ঝরাপাতা, ভাঙা যে ঘর = ভাঙাঘর ইত্যাদি।

(২) বিশেষণ পদের সঙ্গে বিশেষণ পদের যোগে গঠিত কর্মধারয়: যা কাঁচা তাই পাকা = কাঁচাপাকা, যা লাল তাই সবুজ = লালসবুজ ইত্যাদি।

(৩) বিশেষ্য পদের সঙ্গে বিশেষ্য পদের যোগে গঠিত কর্মধারয়: যিনি লাট তিনিই সাহেব = লাটসাহেব, যিনি জ্ঞাতি তিনিই শত্রু = জ্ঞাতিশত্রু ইত্যাদি।

(৪) বিশেষ্য পদের সঙ্গে বিশেষণ পদের যোগে গঠিত কর্মধারয়: সিদ্ধ যে আলু= আলুসিদ্ধ, ভাজা যে মাছ = মাছভাজা ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে, অব্যয়ের সঙ্গে বিশেষ্য বা বিশেষণ পদের যোগেও কর্মধারয় সমাস হয়। যেমন– সুপুরুষ (অব্যয় ও বিশেষ্য), আরক্ত (অব্যয় ও বিশেষণ)। এখানে উদাহরণদ্বয়ে

যথাক্রমে 'সু' ও 'আ' অব্যয় বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। বিশেষণরূপে ব্যবহৃত সর্বনামের সঙ্গেও বিশেষ্য পদের কর্মধারয় সমাস হয়; যেমন – একাল, সেকাল , এ-রকম, ও-রকম, কেমন-ধারা, এমন-ধারা ইত্যাদি ।

পূর্বে বলা হয়েছে যে অধিকাংশ বৈয়াকরণের মতে কর্মধারয় সমাস কোনো স্বতন্ত্র সমাস নয়। এটা পদার্থের প্রাধান্য-বিচারে তৎপুরুষ সমাসের অন্তর্ভুক্ত। ঋষিদাসের মতে কর্মধারয় সমাস প্রকৃতপক্ষে প্রথমা তৎপুরুষ সমাসেরই নামান্তর। কেননা এই সমাসে উভয় পদই প্রথমা বা শূন্য বিভক্তিযুক্ত অর্থাৎ সমানাধিকরণ বা সমবিভক্তিযুক্ত।[২১] জ্যোতিভূষণ চাকীর মতেও কর্মধারয় সমাস প্রথমা তৎপুরুষ। তিনি বলেছেন, "তৎপুরুষ সমাসের মতো কর্মধারয় সমাসেও পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায়। বস্তুত কর্মধারয় তৎপুরুষের অন্তর্ভুক্ত। অন্য তৎপুরুষে সমস্যমান পদ-দুটি ব্যধিকরণ অর্থাৎ ভিন্নবিভক্তিক। আর কর্মধারয়ে সমবিভক্তিক, অর্থাৎ বিশেষণ-বিশেষ্য ভাবাপন্ন। এই জন্যে একে প্রথমাতৎপুরুষও বলা চলে।"[২২]

(খ) **বহুব্রীহিঃ** নীল কণ্ঠ যার = নীলকণ্ঠ, এখানে পূর্বপদ 'নীল' বিশেষণ এবং পরপদ 'কণ্ঠ' বিশেষ্য। বীণা পাণিতে যার = বীণাপাণি, এখানে পূর্বপদ ও পরপদ উভয়ই বিশেষ্য।

উল্লেখ্য যে, দুটো বিশেষ্য ও দুটো বিশেষণ পদের যোগে দ্বন্দ্ব সমাসও হয় (পূর্বে উল্লিখিত)।

মূল কথা হচ্ছে, যে সমাসে সমস্যমান পদসমূহের অর্থ প্রধানভাবে না বুঝিয়ে সমস্যমান পদসমূহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তৃতীয় কোনো অর্থ বোঝায় সে সমাসই বহুব্রীহি সমাস নামে অভিহিত হয়।

৩। **পূর্বপদ অব্যয়ঃ** ড. মাহবুবুল হকের মতে অব্যয়ীভাব এই শ্রেণীর সমাস। কেননা অব্যয়ীভাব সমাসের পূর্বপদ (সাধারণত) অব্যয়। যেমন– মিলের অভাব = গরমিল, শহরের সদৃশ = উপশহর, বছর বছর = ফি-বছর, ঘর ঘর = প্রতিঘর, গমনের পশ্চাৎ = অনুগমন ইত্যাদি। করুণাসিন্ধু দাস বলেছেন, "প্রতিদান, প্রতিহিংসা, প্রতিফল, প্রতিপক্ষ, উপগ্রহ, উপনদী, উপসাগর, উপনগরী, উপদেবতা, প্রত্যঙ্গ, প্রশাখা, বিমাতা, বেগতিক, গরহাজির, বেইমান যে কারও কারও মতে অব্যয়ীভাব তা নিশ্চয় আদ্য উপাদানটি অব্যয় বলেই।"[২৩]

ড. মাহবুবুল হকের মতানুসারে পূর্বপদ অব্যয় হলেই যদি সমাসটি অব্যয়ীভাব হয় তাহলে প্রাদি-সমাসও অব্যয়ীভাব। কেননা অব্যয়ীভাব সমাসের পূর্বপদ (সাধারণত) অব্যয় এবং প্রাদি-সমাসের পূর্বপদ উপসর্গ (প্র, পরা ইত্যাদি)। আর উপসর্গও এক ধরনের অব্যয়। সুতরাং এদিক থেকে অব্যয়ীভাব সমাস ও প্রাদি-সমাসের বৈশিষ্ট্য এক। তিনি বলেছেন, "যেহেতু উপসর্গও এক ধরনের অব্যয়, তাই উপসর্গযোগে গঠিত সব শব্দই সাধারণত অব্যয়ীভাব।"[২৪] এ কারণেই ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক প্রাদি-সমাস সম্পর্কে বলেছেন, "ইহা অব্যয়ীভাব-সমাসেরই নামান্তর। 'প্র', 'পরা', 'প্রতি' প্রভৃতি বিংশতিটি তৎসম উপসর্গের

সহিত তৎসম কৃদন্ত-পদের অথবা নাম-পদের যোগে যে অব্যয়ীভাব-সমাস হয়, তাহাকে প্রাদি-সমাস বলে।"[২৫] তিনি আরো বলেছেন, " 'প্র', 'পরা' প্রভৃতি উপসর্গ (উপসর্গগুলি অব্যয়-পদ) যে-শব্দের আদিতে, তাহাই প্রাদি-সমাস। অব্যয়ীভাব-সমাসের কতকগুলি শব্দে এই অব্যয়-উপসর্গগুলি থাকে। সুতরাং প্রাদি-সমাস অব্যয়ীভাব-সমাসেরই উপ-বিভাগ।"[২৬]

(ক) উপসর্গের সঙ্গে কৃদন্ত পদের যোগে গঠিত প্রাদি-সমাস: প্র (প্রকৃষ্ট) ভাব ($\sqrt{ভূ}$ + ঘঞ্) = প্রভাব, অনু (পশ্চাৎ) তাপ ($\sqrt{তপ্}$+ঘঞ্) = অনুতাপ ইত্যাদি।

(খ) উপসর্গের সঙ্গে নামপদের যোগে গঠিত প্রাদি-সমাস: অতি (অতিশয় বড়), কায় = অতিকায়, অতি (অতিক্রম করেছে) মানব = অতিমানব ইত্যাদি।

করুণাসিন্ধু দাসের মতে বাংলায় পূর্বপদে প্র, অতি প্রভৃতি উপসর্গ থাকলে তাদেরকে উপসর্গসমাস বলা যেতে পারে। তিনি বলেন, "বাংলায় পূর্বপদে প্র, অতি, অনু, যথা, গর-, বে- থাকলে উপসর্গসমাস বলতে দোষ কি?"[২৭] তিনি আরো বলেছেন, "অনুভাব, প্রতিবাদ, অনুশোচনা, অনুতাপ, অনুগমন, অনুপ্রেরণা, অনুধ্যান, ক্রিয়া-বাচক কৃদন্ত বিশেষ্য ও উপসর্গের সমাস বৈ তো নয়।"[২৮]

উল্লেখ্য যে, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ* গ্রন্থে অব্যয়ীভাব সমাসকে প্রাদি-সমাসের পর্যায়ভুক্ত সমাসরূপে উল্লেখ করেছেন।[২৯] *সংসদ ব্যাকরণ অভিধানেও* অব্যয়ীভাব সমাসকে প্রাদি সমাস বলা হয়েছে।[৩০] কিন্তু পরবর্তীকালে *সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙলা ব্যাকরণ* গ্রন্থে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অব্যয়ীভাব সমাসকে স্বতন্ত্র সমাস এবং প্রাদি-সমাসকে তৎপুরুষ সমাসের উপবিভাগ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ গ্রন্থে প্রাদি-সমাস সম্পর্কে বলা হয়েছে, "যে তৎপুরুষ সমাসে প্র, পরা প্রভৃতি উপসর্গ বা উপসর্গস্থানীয় অব্যয় পূর্বপদরূপে বসে তাকে প্রাদিতৎপুরুষ সমাস বলে।"[৩১] অজিত কুমার গুহ ও আনিসুজ্জামানের মতেও প্রাদি-সমাস তৎপুরুষ সমাসের উপবিভাগ। তাঁরা বলেছেন, "তৎপুরুষ সমাসে যদি প্র, প্রতি, উৎ প্রভৃতি উপসর্গ বিশেষ অর্থে পূর্বপদ হয়ে বসে তবে তাকে প্রাদি সমাস বলে।"[৩২]

❖ নঞ্তৎপুরুষ ও নঞ্বহুব্রীহি বা নঞর্থক বহুব্রীহি সমাসের পূর্বপদ অব্যয়।

(ক) **নঞ্তৎপুরুষ** – নঞর্থক অব্যয়ের সঙ্গে বিশেষ্য বা বিশেষণের যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে নঞ্তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন – নয় ম্লান = অম্লান, নয় আবশ্যক = অনাবশ্যক, নয় লুনি = আলুনি, নয় বলা = নাবলা, নয় হাজির = গরহাজির ইত্যাদি।

(খ) **নঞর্থক বহুব্রীহি বা নঞ্ বহুব্রীহি –** 'নঞ্' অর্থবোধক অব্যয় পদের সঙ্গে বিশেষ্য পদের যে বহুব্রীহি সমাস হয় তাকে নঞর্থক বহুব্রীহি বা নঞ্ বহুব্রীহি বলে। যেমন – নেই

খুঁত যাতে = নিখুঁত, নেই বোধ যার = নির্বোধ, নেই হুঁশ যার = বেহুঁশ, নেই ভয় যার = নির্ভীক, নির্ভয়; নেই লজ্জা যার = নির্লজ্জ, নেই তার যার = বেতার ইত্যাদি।

পূর্বপদটি অব্যয় হলে সমাসটি যদি অব্যয়ীভাব হয় তাহলে নঞ্তৎপুরুষ ও নঞ্বহুব্রীহি সমাসও অব্যয়ীভাব নামে অভিহিত হবে। কিন্তু কোনো বৈয়াকরণ এগুলোকে অব্যয়ীভাব সমাস বলেননি।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বাংলায় সকল ক্ষেত্রে অব্যয়ীভাব সমাসে অব্যয় পূর্বপদ নয়। বীপ্সা অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ অর্থে কখনো কখনো অব্যয় পরপদ হয়। যেমন – লোকে লোকে = লোকপিছু। এরূপ – মাথাপিছু, মণপ্রতি, জনপ্রতি ইত্যাদি। সাদৃশ্য অর্থে বাংলা অব্যয়ীভাব সমাসে 'পানা', 'মতো', 'টে' প্রভৃতি অব্যয়ের পরনিপাত লক্ষণীয়। যেমন – কালোর অনুরূপ = কালোমতো বা কাল্চে, চাঁদের মতন = চাঁদপানা, ঘোলার মতো = ঘোলাটে ইত্যাদি।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, পূর্বপদ অব্যয় হলেই সেই সমাস অব্যয়ীভাব, আর অব্যয়ীভাব হলেই তার পূর্বপদ হবে অব্যয়- একথা সর্বতোভাবে গ্রাহ্য নয়। মূল কথা হচ্ছে, যে সমাসের পূর্বপদ সাধারণত অব্যয় এবং ঐ অব্যয়ের অর্থই প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, সেই সমাসই হচ্ছে অব্যয়ীভাব।

৪। **পূর্বপদ সংখ্যাবাচক বিশেষণ শব্দ:** ড. মাহবুবুল হকের মতে দ্বিগু এই শ্রেণীর সমাস। কেননা দ্বিগু সমাসের পূর্বপদ সংখ্যাবাচক বিশেষণ এবং উত্তরপদ বিশেষ্য। দ্বিগু সমাস সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "পূর্বপদে সংখ্যাবাচক শব্দ (বিশেষণ) ও উত্তরপদে বিশেষ্য যোগে সমাস হয়ে সমস্ত পদটি সমাহার বা সমষ্টি অর্থ প্রকাশ করলে তাকে দ্বিগু সমাস বলে।"[৩৩] যেমন – তিন মাথার সমাহার (মিলন)= তেমাথা, চার রাস্তার সমাহার= চৌরাস্তা, চার মোহনার সমাহার = চৌমুহনী ইত্যাদি।

পূর্বপদে সংখ্যাবাচক বিশেষণ ও উত্তরপদে বিশেষ্য যোগে দ্বিগু সমাস হয় বলে পদ-বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এই সমাসের সঙ্গে কর্মধারয় সমাসের সাদৃশ্য রয়েছে। সংখ্যা যখন বিশেষ্যের পূর্বে ব্যবহৃত হয় তখন তা বিশেষণ। দ্বিগু সমাসেও সংখ্যাবাচক শব্দ পূর্বপদ এবং বিশেষ্য উত্তরপদ হয়ে থাকে। অতএব দ্বিগু সমাস কোনো পৃথক সমাস নয়, এটা মূলত বিশেষণ-বিশেষ্যের কর্মধারয়। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও বলেছেন, "যে কর্মধারয়-জাতীয় সমাসে পূর্বপদটি সংখ্যা-বাচক বিশেষণ এবং উত্তরপদটি বিশেষ্য, তাকে বলে দ্বিগু-সমাস।"[৩৪]

দ্বিগু সমাসের পূর্বপদ সংখ্যাবাচক শব্দ। তবে সংখ্যাবাচক শব্দ পূর্বপদ হলেই সমাসটি দ্বিগু সমাস তা সর্বতোভাবে গ্রাহ্য নয়। অনেক সমাসবদ্ধ পদের পূর্বপদ সংখ্যাবাচক শব্দ, কিন্তু সেগুলো দ্বিগু সমাস নয়। মূল কথা হচ্ছে, পূর্বপদে সংখ্যাবাচক শব্দ থাকলেও সমষ্টি বা সমাহার না বোঝালে দ্বিগু সমাস হয় না। যেমন–

(ক) উভয় পদের অর্থ প্রধান হলে দ্বন্দ্ব সমাস হয়; যেমন– পাঁচ ও সাত = পাঁচ-সাত, নয় ও ছয় = নয়-ছয় ইত্যাদি।

(খ) সমাহার বা সমষ্টি না বুঝিয়ে ব্যাসবাক্যের মধ্যস্থিত কোনো পদ লোপ পেলে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস হয়; যেমন – চারজন বাহিত দোলা = চতুর্দোলা, এক অধিক দশ = একাদশ ইত্যাদি।

(গ) দ্বিগু সমাসে সমস্তপদটি সাধারণত বিশেষ্য হয়। কিন্তু সমস্তপদটি বিশেষণ হলে কিংবা পূর্বপদ ও উত্তরপদের অর্থ প্রধান না হয়ে তৃতীয় কোনো অর্থ প্রধান হলে বহুব্রীহি সমাস হয়। এরূপ বহুব্রীহিকে সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি বা সংখ্যাপূর্বক বহুব্রীহি বলা হয়। যেমন – চৌ (চার) চাল যার = চৌচালা ঘর। এখানে 'চৌচালা' পদটি ঘরের বিশেষণ। এরূপ – দুটি নল যার = দোনলা, তিন পায়া যার = তেপায়া ইত্যাদি।

সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি বা সংখ্যাপূর্বক বহুব্রীহি সমাসের পূর্বপদ যেহেতু দ্বিগু সমাসের ন্যায় সংখ্যাবাচক শব্দ, সেহেতু ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক এরূপ বহুব্রীহি সমাসকে দ্বিগু-বহুব্রীহি বলেছেন। তিনি বলেন, "সংখ্যাবাচক শব্দের সহিত সমাস হওয়ার পর সমস্তপদ সমাহার না বুঝাইয়া, যদি একটি তৃতীয় অর্থ প্রকাশ করে, তবে তাহাকে দ্বিগু-বহুব্রীহি বলে"[৩৫]

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, পূর্বপদ সংখ্যাবাচক বিশেষণ হলেই সমাসটি দ্বিগু সমাস হবে একথা সর্বতোভাবে গ্রহণীয় নয়।

৫। **পূর্বপদে কারক-সম্পর্কজাত বিশেষ্য:** ড. মাহবুবুল হকের মতে তৎপুরুষ এই শ্রেণীর সমাস। তিনি বলেছেন, "যে সমাসে পূর্বপদের কারক বা সম্বন্ধ-সূচক বিভক্তি লোপ পায় এবং পরপদের অর্থ-প্রাধান্য থাকে তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে।"[৩৬] তিনি আরো বলেছেন, "তৎপুরুষ সমাসে ব্যাসবাক্যের পূর্বপদে যে বিভক্তি থাকে তা উত্তরপদের কারক-সম্পর্ক নির্দেশ করে।"[৩৭] যেমন– নবীনকে বরণ = নবীনবরণ। এখানে পরপদ 'বরণ'-এর মধ্যে ক্রিয়ার যে ভাব নিহিত আছে পূর্বপদ 'নবীনকে' তার কর্ম কারকের মতো সমাসবদ্ধ হওয়ার পর পূর্বপদের বিভক্তি 'কে' লোপ পেয়েছে।

তৎপুরুষ সমাসে উত্তরপদের অর্থ প্রধান হলেও পূর্বপদটি কর্তা, কর্ম, করণ প্রভৃতি সম্বন্ধরূপে উত্তরপদের সঙ্গে অন্বিত থাকে। পূর্বপদে যে সম্বন্ধ সূচিত হয়, তৎপুরুষ সমাসের নামকরণ সেই অনুযায়ী হয়ে থাকে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, "প্রথমটীর অন্বয় পরবর্তীটীর

সহিত কর্মরূপে, করণ (বা যোগ অথবা অভাব)-রূপে, সম্প্রদান (বা নিমিত্ত, অথবা জন্য)-রূপে, অপাদান-রূপে, সম্বন্ধ-রূপে, অথবা অধিকরণ-রূপে ঘটে। দ্বিতীয় পদটীর অর্থই প্রধান অর্থ হইয়া থাকে; যথা– সাহায্য-প্রাপ্ত (কর্ম), মন-গড়া (করণ), বুদ্ধি-হীন (অভাব), ব্রাহ্মণোৎসৃষ্ট (সম্প্রদান), জীয়ন-কাঠি (জন্য), অতিথি-শালা (নিমিত্ত), বিলাত-ফেরত, পদচ্যুত (অপাদান), ঠাকুর-ঘর (সম্বন্ধ), ব্রাহ্মণগণ (সমূহ), গাছ-পাকা (অধিকরণ)।"[৩৮] ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বলেছেন, "যে সমাসে সমস্যমান-পদদ্বয়ের পূর্ব-পদটির সহিত উত্তর-পদটির অন্বয় কারক-বিভক্তির দ্বারা প্রকাশ পাইয়া উত্তর-পদের অর্থ-প্রাধান্য ঘটে, সেই সমাসকে তৎপুরুষ-সমাস বলে। সমস্যমান-পদদ্বয় সমাসবদ্ধ হইলে পর পূর্ব-পদটির কারক-বিভক্তি লোপ পায় এবং উত্তর-পদটির অর্থ-প্রাধান্য ঘটে। বিভক্তির লোপ অনুসারে তৎপুরুষ-সমাস ছয় প্রকার; যথা– কর্ম, করণ, নিমিত্তার্থক, অপাদান, সম্বন্ধ ও অধিকরণ তৎপুরুষ।"[৩৯] বামনদেব চক্রবর্তী বলেছেন, "যে সমাসে পূর্বপদের কর্ম করণ অপাদান ইত্যাদি কারকের বিভক্তিচিহ্ন কিংবা বিভক্তিস্থানীয় অনুসর্গের লোপ হয় এবং পরপদের অর্থটি প্রধানভাবে বুঝায়, তাহাকে তৎপুরুষ সমাস বলে।"[৪০] তাঁর মতে পূর্বপদের কারকের বিভক্তিচিহ্ন অথবা বিভক্তিস্থানীয় অনুসর্গ অনুসারে তৎপুরুষ সমাস কর্ম-তৎপুরুষ, করণ-তৎপুরুষ, সম্প্রদান-তৎপুরুষ, অপাদান-তৎপুরুষ, অধিকরণ-তৎপুরুষ এই পাঁচ প্রকার। *সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙলা ব্যাকরণ* গ্রন্থে তৎপুরুষ সমাসকে কর্মতৎপুরুষ, করণ তৎপুরুষ, অপাদান তৎপুরুষ, সম্বন্ধ তৎপুরুষ, অধিকরণ তৎপুরুষ, নিমিত্ত তৎপুরুষ ইত্যাদি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে।[৪১] কিন্তু *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ* গ্রন্থে তৎপুরুষ সমাসকে কর্তৃ-বাচক – প্রথমা-তৎপুরুষ, কর্ম-বাচক – দ্বিতীয়া– তৎপুরুষ, করণ-বাচক – তৃতীয়া-তৎপুরুষ, উদ্দেশ্য-বাচক – চতুর্থী-তৎপুরুষ, অপাদান-বাচক – পঞ্চমী-তৎপুরুষ, সম্বন্ধ-বাচক – ষষ্ঠী-তৎপুরুষ, স্থান-কাল-বাচক – সপ্তমী-তৎপুরুষ ইত্যাদি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে।[৪২] ড. মাহবুবুল হক পূর্বপদের কারক বা সম্বন্ধ-সূচক বিভক্তি অনুসারে তৎপুরুষ সমাসকে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ বা কর্ম তৎপুরুষ, তৃতীয়া তৎপুরুষ বা করণ তৎপুরুষ, চতুর্থী তৎপুরুষ বা সম্প্রদান তৎপুরুষ, পঞ্চমী তৎপুরুষ বা অপাদান তৎপুরুষ, ষষ্ঠী তৎপুরুষ বা সম্বন্ধ তৎপুরুষ, সপ্তমী তৎপুরুষ বা অধিকরণ তৎপুরুষ এই ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন।[৪৩] ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তৎপুরুষ সমাসকে দ্বিতীয়া বা কর্ম তৎপুরুষ, তৃতীয়া বা করণ তৎপুরুষ, চতুর্থী বা সম্প্রদান তৎপুরুষ, পঞ্চমী বা অপাদান তৎপুরুষ, ষষ্ঠী বা সম্বন্ধ তৎপুরুষ, সপ্তমী বা অধিকরণ তৎপুরুষ প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন।[৪৪]

কিন্তু মাহবুবুল আলম, অজিতকুমার গুহ ও আনিসুজ্জামান, মুনীর চৌধুরী, সুকুমার সেন প্রভৃতি বৈয়াকরণ তৎপুরুষ সমাসকে কর্ম তৎপুরুষ, করণ তৎপুরুষ প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত

না করে পূর্বপদের দ্বিতীয়া, তৃতীয়া প্রভৃতি বিভক্তি অনুসারে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ, তৃতীয়া তৎপুরুষ, চতুর্থী তৎপুরুষ, পঞ্চমী তৎপুরুষ, ষষ্ঠী তৎপুরুষ ও সপ্তমী তৎপুরুষ প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। সুকুমার সেন তৎপুরুষ সমাস এবং তার শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে বলেছেন, "তৎপুরুষ সমাসের এইভাবে নাম পূর্বপদের কারক-বিভক্তি লক্ষ্য করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পূর্বপদ উত্তরপদের কর্মস্থানীয় হইলে দ্বিতীয়া-তৎপুরুষ, করণস্থানীয় হইলে তৃতীয়া-তৎপুরুষ, গৌণ কর্ম-আভিমুখ্য অর্থ বুঝাইলে চতুর্থী-তৎপুরুষ, অপাদান বা প্রাতিমুখ্য বুঝাইলে পঞ্চমী-তৎপুরুষ, সম্বন্ধস্থানীয় হইলে ষষ্ঠী-তৎপুরুষ এবং অধিকরণ বুঝাইলে সপ্তমী-তৎপুরুষ বলা হয়।"[৪৫] জ্যোতিভূষণ চাকী তৎপুরুষ সমাস এবং এর শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে বলেছেন, "পূর্বপদে কর্ম প্রভৃতি কারকের বিভক্তি বা বিভক্তিস্থানীয় অনুসর্গযুক্ত পদের সঙ্গে অথবা সম্বন্ধপদের সঙ্গে সমাস হয়ে যদি পরপদের অর্থ-প্রাধান্য থাকে তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে। কর্মাদির নির্দিষ্ট বিভক্তি অনুযায়ী শ্রেণীগুলির নামকরণ করা হত, যেমন – দ্বিতীয়া বিভক্তির সঙ্গে পরপদের সমাসকে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ, তৃতীয়ান্ত পদের সঙ্গে সমাসকে তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস ইত্যাদি। কিন্তু এখন বিভক্তি অনুযায়ী নামকরণের পরিবর্তে কারক অনুযায়ী নামকরণ করা হচ্ছে। যেমন – কর্ম তৎপুরুষ, করণ তৎপুরুষ, সম্প্রদান তৎপুরুষ, অপাদান তৎপুরুষ ও অধিকরণ তৎপুরুষ। সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তি নির্ধারিত বলে ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত শব্দের সঙ্গে পরপদের সমাস হলে ষষ্ঠী তৎপুরুষ বলা হত। এখন সম্বন্ধ তৎপুরুষ বলা হচ্ছে।"[৪৬]

(ক) **কর্ম তৎপুরুষঃ** "যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের কর্মকারকের বিভক্তি চিহ্ন '-কে' লুপ্ত হয় এবং পরপদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে কর্ম তৎপুরুষ বলে।"[৪৭] যেমন – রথকে দেখা = রথদেখা, কাপড়কে কাচা = কাপড়কাচা ইত্যাদি।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোনো কোনো বৈয়াকরণ এরূপ সমাসকে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ বা কর্ম তৎপুরুষ বলেছেন। আবার কোনো কোনো বৈয়াকরণ কেবল দ্বিতীয়া তৎপুরুষ বলেছেন। তবে ড. মাহবুবুল হকের মতে, 'যেহেতু এই সমাসে পূর্বপদটি পরপদের কর্মস্থানীয় হয়ে থাকে, সেহেতু একে কর্ম তৎপুরুষ বলাই শ্রেয়।'[৪৮]

(খ) **করণ তৎপুরুষঃ** "যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের করণকারকের বিভক্তিচিহ্ন '-দ্বারা, -দিয়ে, -কর্তৃক' বা '-এ, য়' প্রভৃতির লোপ হয় এবং পরপদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয় তাকে করণ তৎপুরুষ বলে।"[৪৯] যেমন– অস্ত্রের দ্বারা আহত = অস্ত্রাহত, গুরু-কর্তৃক দত্ত = গুরুদত্ত, দারিদ্র্যে ক্লিষ্ট = দারিদ্র্যক্লিষ্ট, ঢেঁকিতে (ঢেঁকি দিয়ে) ছাঁটা = ঢেঁকিছাঁটা ইত্যাদি।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এরূপ সমাসকে কোনো কোনো বৈয়াকরণ তৃতীয়া তৎপুরুষ বা করণ তৎপুরুষ বলেছেন। আবার কোনো কোনো বৈয়াকরণ কেবল তৃতীয়া তৎপুরুষ

বলেছেন। তবে ড. মাহবুবুল হকের মতে, 'যেহেতু এই সমাসে পরপদের সঙ্গে পূর্বপদের করণ-সম্পর্ক হয়, সেহেতু একে করণ তৎপুরুষ সমাস বলাই শ্রেয়।'[৫০]

(গ) **সম্প্রদান তৎপুরুষঃ** "পূর্বপদের সম্প্রদান কারকের 'কে' বিভক্তিচিহ্নটি লোপ পাইলে সম্প্রদান-তৎপুরুষ হয়।"[৫১] যেমন – দেবকে দত্ত = দেবদত্ত, কৃষ্ণকে সমর্পিত = কৃষ্ণসমর্পিত ইত্যাদি (নিমিত্ত তৎপুরুষ সমাসের আলোচনা প্রসঙ্গে সম্প্রদান তৎপুরুষ সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে)।

(ঘ) **অপাদান তৎপুরুষঃ** "যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদে অপাদান কারকের বিভক্তিচিহ্ন '-এ', '-তে' বা হইতে, চেয়ে, থেকে প্রভৃতি অনুসর্গের লোপ হয়, এবং পরপদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে অপাদান তৎপুরুষ বলে।"[৫২] যেমন – রোগ থেকে মুক্ত = রোগমুক্ত, জেল থেকে পালানো = জেলপালানো ইত্যাদি।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোনো কোনো বৈয়াকরণ এরূপ সমাসকে পঞ্চমী তৎপুরুষ বা অপাদান তৎপুরুষ বলেছেন। আবার কোনো কোনো বৈয়াকরণ কেবল পঞ্চমী তৎপুরুষ বলেছেন। তবে ড. মাহবুবুল হকের মতে 'যেহেতু এই সমাসে পূর্বপদের সঙ্গে পরপদের অপাদান-সম্পর্ক হয়ে থাকে এবং পূর্বপদ পরপদের অপাদান কারকস্থানীয় হয়, সেহেতু এই সমাসকে অপাদান তৎপুরুষ সমাস বলাই শ্রেয়।'[৫৩]

(ঙ) **অধিকরণ তৎপুরুষঃ** "যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের অধিকরণ কারকের বিভক্তিচিহ্ন '-এ, -তে, -য়' লুপ্ত হয় এবং পরপদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে অধিকরণ তৎপুরুষ বলে।"[৫৪] যেমন – শিল্পে পটু = শিল্পপটু, বিশ্বে বিখ্যাত = বিশ্ববিখ্যাত ইত্যাদি।

অনেকের মধ্যে একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বোঝালেও অধিকরণ-তৎপুরুষ হয়; যেমন – কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ = কবিশ্রেষ্ঠ, পুরুষের মধ্যে উত্তম = পুরুষোত্তম। এরূপ – কবিসম্রাট, পুরুষশ্রেষ্ঠ, নরাধম, নরোত্তম ইত্যাদি।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোনো কোনো বৈয়াকরণ এরূপ সমাসকে সপ্তমী তৎপুরুষ বা অধিকরণ তৎপুরুষ বলেছেন। আবার কোনো কোনো বৈয়াকরণ কেবল সপ্তমী তৎপুরুষ বলেছেন। তবে ড. মাহবুবুল হকের মতে 'যেহেতু এই সমাসে পরপদের সঙ্গে পূর্বপদের অধিকরণ সম্বন্ধ হয়ে থাকে, সেহেতু একে অধিকরণ তৎপুরুষ বলাই শ্রেয়।'[৫৫]

সংস্কৃতের অনুসরণে বাংলায় তথা তৎসম শব্দেও কোনো কোনো পদের ব্যবহারে এবং বিশেষ বিশেষ অর্থে বিভিন্ন বিভক্তির প্রয়োগ হয়, কিন্তু তাদের সঙ্গে কারকের বা ক্রিয়াপদের কোনো সম্পর্ক থাকে না। বাংলায় এরূপ ক্ষেত্রে তৎপুরুষ সমাস হলে তাদেরকে কর্ম তৎপুরুষ, করণ তৎপুরুষ প্রভৃতি না বলে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ, তৃতীয়া তৎপুরুষ ইত্যাদি বলাই

যুক্তিসঙ্গত। করুণাসিন্ধু দাস বলেছেন, "বাংলা ভাষার বাক্যে পদে বিভক্তিযোগ কোন আবশ্যক শর্ত নয়, বিভক্তির সংখ্যাও বাংলায় প্রথমা থেকে সপ্তমী পর্যন্ত সাতটি নয়, এবং যে কটি বিভক্তি বা তৎস্থানীয় অনুসর্গ আছে তাদের প্রথমা দ্বিতীয়া ইত্যাদি নামে চিহ্নিত করবার অসুবিধাও আছে। ফলত দ্বিতীয়াতৎপুরুষ, তৃতীয়াতৎপুরুষ নামগুলি বাংলায় প্রায় অর্থহীন (হয়ে) দাঁড়ায়। মুশকিলের কথা, এই সমস্যা এড়াতে কর্মতৎপুরুষ, করণতৎপুরুষ ইত্যাদি নামকরণ নতুন এক প্রস্থ সমস্যার সৃষ্টি করেছে। যেমন, সংস্কৃতে মুহূর্তং সুখম্ = মুহূর্তসুখম্ স্থলে যে দ্বিতীয়াতৎপুরুষ বলা হয়েছে (ব্যাপ্তি অর্থে দ্বিতীয়া থাকায়), সেখানে দ্বিতীয়াটি কর্মে দ্বিতীয়া নয়, ব্যাপ্তি অর্থে দ্বিতীয়া। বাংলায় একে কর্মতৎপুরুষ বললে অমূলক কথাই বলা হবে।"[৫৬] ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বলেছেন, "তৎসম শব্দে 'কর্ম-তৎপুরুষ' বলা উচিত নহে। কারণ, সংস্কৃতে কর্মকারক ব্যতীত অন্য স্থলেও দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় এবং সমাসে তাহা লোপ হইয়া থাকে।"[৫৭] বিশ্বরূপ সাহা বলেছেন, "পূর্বপদে যে দ্বিতীয়া প্রভৃতি বিভক্তি যুক্ত হয়ে উত্তরপদের সঙ্গে সমাস হয়, সমাসের নাম সেই তৎপুরুষ হয়ে থাকে। যথা– দ্বিতীয়া তৎপুরুষ, তৃতীয়া তৎপুরুষ ইত্যাদি। কোন কোন পাশ্চাত্য ভাষাবিদ্ ও তাঁদের অনুগামী ভারতীয় বিদ্বান্ এদেরকে যথাক্রমে কর্মতৎপুরুষ, করণতৎপুরুষ ইত্যাদি নামানুসারে তৎপুরুষবিশেষের নাম দিয়েছেন। অথচ এরূপ নামকরণ অপাণিনীয় ও অসঙ্গত।"[৫৮] *উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ* গ্রন্থে যেসকল তৎপুরুষ সমাসের পূর্বপদে কর্ম, করণ প্রভৃতি কারক ব্যতীত অন্য অর্থে অর্থাৎ কোনো কোনো শব্দের যোগে বা বিশেষ বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ইত্যাদি বিভক্তি কিংবা বিভক্তিস্থানীয় অনুসর্গ লোপ পায়, সে-সকল তৎপুরুষ সমাসকে অ-কারক বা উপকারক-তৎপুরুষ সমাস বলা হয়েছে।[৫৯]

(ক) গত, আগত, প্রাপ্ত, পন্ন, আপন্ন, শ্রিত, আশ্রিত, আরূঢ়, অতীত, প্রবিষ্ট, সংক্রান্ত প্রভৃতি শব্দযোগে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয় এবং পূর্বপদের 'কে' বিভক্তিচিহ্নের লোপ হয়। যেমন– ব্যক্তিকে গত = ব্যক্তিগত, শরণকে আগত = শরণাগত, যৌবনকে প্রাপ্ত = যৌবনপ্রাপ্ত। এরূপ – সঙ্গতিপন্ন, বিপদাপন্ন, কষ্টাশ্রিত, চরণাশ্রিত, অশ্বারূঢ়, সংখ্যাতীত, গৃহপ্রবিষ্ট, শিক্ষাসংক্রান্ত ইত্যাদি।

সংস্কৃতে গত, আগত প্রভৃতি শব্দযোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। বাংলায়ও সংস্কৃতের অনুসরণে গত, আগত প্রভৃতি শব্দযোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। এরূপ দ্বিতীয়ার সঙ্গে কারকের কোনো সম্পর্ক নেই। অতএব এরূপ দ্বিতীয়া তৎপুরুষকে কর্ম তৎপুরুষ সমাস বলা সঙ্গত নয়।

(খ) ব্যাপ্তি অর্থে কালবাচক পদের সঙ্গে বিশেষ্য বা বিশেষণ পদের দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়; যেমন – চিরকালব্যাপী সুখী = চিরসুখী। এরূপ – ক্ষণস্থায়ী, চিরশত্রু, চিরবসন্ত, মাসশৌচ, নিত্যধারা ইত্যাদি।

সংস্কৃতে ব্যাপ্ত্যর্থে দ্বিতীয়া বিভক্তি নির্দিষ্ট বলে অনায়াসেই দ্বিতীয়া তৎপুরুষ বলা চলে। বাংলায়ও এরূপ সমাসকে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ বলাই সঙ্গত, কর্ম তৎপুরুষ নয়। করুণাসিন্ধু দাসও বলেছেন, "বাংলায় একে কর্মতৎপুরুষ বললে অমূলক কথাই বলা হবে।"[৬০] কিন্তু জ্যোতিভূষণ চাকী বলেছেন, "ব্যাপ্তি বা ক্রিয়াবিশেষণকে সরাসরি কারক বলা যায় না বলে ব্যাপ্তিকর্ম বা ক্রিয়াবিশেষাত্মক কর্ম স্বীকার করে নিয়ে এদের কর্মতৎপুরুষের মধ্যে ফেলা চলে।"[৬১] তবে করুণাসিন্ধু দাস এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি বলেছেন, "দ্বিতীয়া তৎপুরুষই বা বলব কোন্ মুখে? বরং মুহূর্তব্যাপী সুখ = মুহূর্তসুখ এইভাবে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় বললে বুঝি ঠিক হয়। ব্যাপ্তিতৎপুরুষও চলতে পারে।"[৬২]

(গ) ক্রিয়া-বিশেষণের সঙ্গে কৃদন্ত পদের দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। এরূপ তৎপুরুষ সমাসের ব্যাসবাক্যে ক্রিয়াবিশেষণবাচক পূর্বপদের সঙ্গে 'মাত্র', 'ভাবে', 'রূপে', 'যথা', 'তথা' প্রভৃতি ব্যবহৃত হয় এবং সমাসে তা লোপ পায়। যেমন – মৃদুভাবে ভাষী = মৃদুভাষী, ঘনভাবে সন্নিবিষ্ট = ঘনসন্নিবিষ্ট, অর্ধরূপে/ অর্ধমাত্র স্ফুট = অর্ধস্ফুট, যথা দ্রুত তথা গামী = দ্রুতগামী। এরূপ – অর্ধমৃত, নিমরাজি ইত্যাদি।

সংস্কৃতে ক্রিয়াবিশেষণে দ্বিতীয়া বিভক্তি যুক্ত হয় বিধায় মৃদুভাষী, নিমরাজি, ধীরগামী প্রভৃতি সমাসকে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলা হয়েছে। করুণাসিন্ধু দাসও বলেছেন, "নিমরাজি, আধবোজা, আধমরা, আধপাকা ইত্যাদিকে দ্বিতীয়াতৎপুরুষ বা কর্মতৎপুরুষ ধরা হয়ে থাকে আদ্যপদটি ক্রিয়াবিশেষণ বা বিশেষণের বিশেষণ হিসেবে সংস্কৃতে দ্বিতীয়া বিভক্তিযুক্ত হওয়ার সুবাদে।"[৬৩] অতএব এরূপ সমাসকে কর্ম তৎপুরুষ না বলে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ বলাই শ্রেয়। তবে জ্যোতিভূষণ চাকীর মতে ক্রিয়াবিশেষণকে ক্রিয়াবিশেষাত্মক কর্ম স্বীকার করে নিয়ে এরূপ সমাসকে কর্মতৎপুরুষ বলা চলে (উপরে উল্লিখিত)।

(৪) ঊন, হীন, শূন্য, রহিত প্রভৃতি ঊনার্থক ও যুক্ত, অন্বিত, বিশিষ্ট প্রভৃতি যুক্তার্থক শব্দযোগে পূর্বপদের বিভক্তিচিহ্ন ও দ্বারা অনুসর্গের লোপে তৎসম শব্দে তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন– জ্ঞানের দ্বারা হীন = জ্ঞানহীন। এরূপ – জ্ঞানশূন্য, বিবেকরহিত, একোন, নজিরবিহীন, শোভান্বিত, ছটাককম, যুক্তিযুক্ত, লেজবিশিষ্ট ইত্যাদি।

সংস্কৃতে ঊন, হীন, শূন্য, রহিত প্রভৃতি ঊনার্থক শব্দযোগে তৃতীয়া বিভক্তি হয় এবং এরূপ তৃতীয়ান্ত পদের সঙ্গে ঊন, হীন, শূন্য, রহিত প্রভৃতি ঊনার্থক শব্দের তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। অতএব বাংলায় এরূপ সমাসকে তৃতীয়া তৎপুরুষ বলাই যুক্তিসঙ্গত। তবে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেছেন। তিনি বলেছেন, "ঊনার্থে সংখ্যা ও পরিমাণবাচক শব্দের সহিত করণ-তৎপুরুষ সমাস হয়; যথা– এক সংখ্যায় (= এক দ্বারা) কম = এক-কম(কুড়ি); পোয়া পরিমাণে (= পরিমাণ দ্বারা) ঊন = পৌন+এ = পৌনে।

এইরূপ – পাঁচ-কম (এক শ); ছটাক-কম (এক সের)।"[৬৪] জ্যোতিভূষণ চাকীর মতে, যে সকল তৎপুরুষ সমাসের পূর্বপদে করণত্ব নেই, হেত্বর্থ বা ঊনার্থ রয়েছে তাদেরকে করণ তৎপুরুষ সমাসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হলে হেত্বাত্মক করণ, ঊনার্থক করণ ইত্যাদি স্বীকার করে নিতে হয়। যেমন – ছায়া দ্বারা শীতল = ছায়াশীতল (ছায়া যে শীতলতার হেতু তা এখানে স্পষ্ট), অতএব 'ছায়াশীতল' হেত্বাত্মক করণ তৎপুরুষের দৃষ্টান্ত এবং 'তৃণশূন্য', 'তৃণহীন' প্রভৃতি ঊনার্থক করণ তৎপুরুষের দৃষ্টান্ত।[৬৫] *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ* গ্রন্থে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'পোয়া-কম' সমাসবদ্ধ পদটিকে করণ-বাচক – তৃতীয়া-তৎপুরুষ সমাসের দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করেছেন।[৬৬] কিন্তু জ্যোতিভূষণ চাকীর মতে এটা ঊনার্থক করণ তৎপুরুষের দৃষ্টান্ত। তিনি বলেছেন, " 'কম' শব্দটিতে কোনও ধাতু নেই, তাই পোয়ার করণত্ব আসবে কী করে? ঊনার্থক করণ ধরলে অবশ্য তা সম্ভব।"[৬৭]

(৫) অনেক তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের সঙ্গে উত্তরপদের অন্বয় নিমিত্ত, জন্য, উদ্দেশ্য প্রভৃতি অর্থজ্ঞাপক বিভক্তি বা অনুসর্গ যোগে নির্ণীত হয় এবং নিমিত্ত, জন্য প্রভৃতি নিমিত্তবাচক অংশগুলো বা অনুসর্গ লোপ পায়। যেমন – ডাকের জন্য মাশুল = ডাকমাশুল, তীর্থের উদ্দেশে যাত্রা = তীর্থযাত্রা ইত্যাদি। এরূপ সমাসকে নিমিত্তার্থক-তৎপুরুষ/ নিমিত্ত-তৎপুরুষ বলে। তবে কোনো কোনো বৈয়াকরণ এরূপ তৎপুরুষকে চতুর্থী তৎপুরুষ সমাসও বলেছেন। আমাদের মতে এরূপ তৎপুরুষকে চতুর্থী তৎপুরুষ বলাই ভালো।

দানার্থেও বাংলায় তৎপুরুষ সমাস হয়; যেমন – দেবকে দত্ত = দেবদত্ত। সম্প্রদান কারকে চতুর্থী বিভক্তি হয় বিধায় সংস্কৃতের অনুসরণে কোনো কোনো বৈয়াকরণ দানার্থে গঠিত তৎপুরুষ সমাসকে চতুর্থী তৎপুরুষ বলেছেন। আবার কারকের নামানুসারে একে সম্প্রদান তৎপুরুষও বলা হয়েছে। ড. মাহবুবুল হক বলেছেন, "যে সমাসে পূর্বপদের চতুর্থী বিভক্তি (কে, রে) কিংবা নিমিত্তবাচক অনুসর্গ (নিমিত্ত, উদ্দেশ্যে, জন্যে) লোপ পায় এবং পূর্বপদের সঙ্গে পরপদের সম্পর্ক সম্প্রদান কারকস্থানীয় হয় তাকে চতুর্থী তৎপুরুষ বা সম্প্রদান তৎপুরুষ সমাস বলে। একে নিমিত্ত তৎপুরুষও বলা হয়ে থাকে। তবে সম্প্রদান তৎপুরুষ নামটিই শ্রেয়।"[৬৮] জ্যোতিভূষণ চাকী বলেছেন, "সম্প্রদান কারক স্বীকার না করলে এ সমাসকে কর্ম তৎপুরুষ বলতে হবে।"[৬৯] *সংসদ ব্যাকরণ অভিধানে* উক্ত হয়েছে, "বাংলায় সম্প্রদান কারকের ব্যবহার আর নেই। এই সমাস প্রকৃতপক্ষে কর্ম তৎপুরুষ।"[৭০] সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় চতুর্থী তৎপুরুষকে উদ্দেশ্য-বাচক চতুর্থী-তৎপুরুষ বলেছেন।[৭১] জ্যোতিভূষণ চাকীও বলেছেন, "সম্প্রদান তৎপুরুষ না বলে এই ধরনের সমাসকে উদ্দেশ্য তৎপুরুষ বলা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে ব্যাসবাক্য হবে, দেবের উদ্দেশ্যে দত্ত।"[৭২]

(৬) **সম্বন্ধ তৎপুরুষ:** "যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের সম্বন্ধের বিভক্তিচিহ্ন 'র, -এর, -দের' লুপ্ত হয় এবং পরপদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে সম্বন্ধ তৎপুরুষ বলে।"[৭৩] যেমন– দেশের সেবা = দেশসেবা, নদীর তট = নদীতট, ধানের ক্ষেত = ধানক্ষেত, পণ্ডিতদের মহল = পণ্ডিতমহল ইত্যাদি।

সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তি হয় বিধায় সংস্কৃতে এরূপ সমাস ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস নামে স্বীকৃত। এ কারণে সংস্কৃতের অনুসরণে কোনো কোনো বৈয়াকরণ এরূপ সমাসকে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস বলেছেন। আবার কোনো কোনো বৈয়াকরণ ষষ্ঠী তৎপুরুষ বা সম্বন্ধ তৎপুরুষ বলেছেন। ড. মাহবুবুল আলমের মতে এই সমাসের পূর্বপদ যেহেতু পরপদের সম্বন্ধ পদের মতো হয়, সেহেতু এ সমাসকে সম্বন্ধ তৎপুরুষ বলাই শ্রেয়।[৭৪]

অনট্ (ল্যুট্), ঘঞ্, অল্, ক্তিন্ প্রভৃতি প্রত্যয়ান্ত শব্দের প্রয়োগে কর্তায় ও কর্মে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। সংস্কৃতে এরূপ ষষ্ঠ্যন্ত পদের সঙ্গে কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পদের ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয়। সংস্কৃতের অনুসরণে বাংলায়ও এরূপ তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন– সূর্যের উদয় = সূর্যোদয়, চন্দ্রের গ্রহণ = চন্দ্রগ্রহণ, পিতার আদেশ = পিত্রাদেশ, অর্থের লোভ = অর্থলোভ ইত্যাদি। এরূপ তৎপুরুষকে ষষ্ঠী তৎপুরুষ বলাই যুক্তিসঙ্গত। কেননা এরূপ ষষ্ঠীর সঙ্গে সম্বন্ধ পদের কোনো সম্পর্ক নেই।

সংস্কৃতে ষষ্ঠ্যন্ত ও একবচনান্ত একদেশীর (অব্যয়বাচক পদের) সঙ্গে পূর্ব, অপর, অধর, উত্তর প্রভৃতি একদেশবাচক পদের (অব্যয়বাচক পদের) যে সমাস হয়, তাকে একদেশী তৎপুরুষ বলে। সংস্কৃতের অনুসরণে বাংলায়ও এরূপ সমাস হয়। বাংলায় এরূপ তৎপুরুষ সমাসকে ষষ্ঠী তৎপুরুষ (মতান্তরে সম্বন্ধ তৎপুরুষ) বলে। তবে কোনো কোনো বৈয়াকরণ সংস্কৃতের ন্যায় একে একদেশী তৎপুরুষ বলেন। ঋষিদাস বলেছেন, "ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসের দুইটি সমস্যমান পদের মধ্যে একটিকে অপরটির একদেশ অর্থাৎ অঙ্গ বুঝাইলে ঐ ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসকে একদেশী তৎপুরুষ সমাস বলে।"[৭৫] জ্যোতিভূষণ চাকী বলেছেন, "একদেশবাচক পদের সঙ্গে যে সমাস হয় তাকে একদেশী সম্বন্ধ তৎপুরুষ অথবা একদেশী সমাস বলে।"[৭৬] এরূপ সমাসে ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত পদ পরপদ হয়। যেমন– কায়ের পূর্ব (পূর্বভাগ) = পূর্বকায়, অহনের মধ্য = মধ্যাহ্ন, রাত্রির পূর্ব = পূর্বরাত্র, নদীর মাঝ = মাঝনদী, দরিয়ার মাঝ = মাঝদরিয়া, পথের মাঝ = মাঝপথ ইত্যাদি।

উপর্যুক্ত শ্রেণীবিভাগ ছাড়াও তৎপুরুষ সমাসের আরো কয়েকটি শ্রেণী রয়েছে; যেমন – (ক) উপপদ তৎপুরুষ, (খ) প্রাদিতৎপুরুষ, (গ) নঞ্তৎপুরুষ এবং (ঘ) অলুক তৎপুরুষ।

(ক) **উপপদ তৎপুরুষ:** "কৃদন্ত পদে ধাতুর পূর্বে উপসর্গ বসে, অন্য পদও বসে, উপসর্গ ভিন্ন অন্য পদকে উপপদ বলে। উপপদের সঙ্গে কৃদন্ত পদের যে সমাস তাকে উপপদ

তৎপুরুষ সমাস বলে।"[৭৭] উপপদ তৎপুরুষ সমাসে উপপদের বিভক্তি (সাধারণত) লোপ পায় এবং কৃদন্ত পদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়। ব্যাসবাক্য করার সময় কৃদন্ত পদটিকে ক্রিয়ায় রূপান্তরিত করতে হয় এবং পূর্বপদের সঙ্গে কর্ম, করণ, অপাদান, অধিকরণ কারক-সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়। যেমন– পা চাটে যে = পাচাটা, পকেট মারে যে = পকেটমার, অণ্ড থেকে জন্মে যে = অণ্ডজ ইত্যাদি।

উপপদ তৎপুরুষ সমাসের কৃদন্ত-পরপদ সমস্তপদের বাইরে স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয় না। জ্যোতিভূষণ চাকী বলেছেন, "যে কৃদন্ত পদ একাকী ব্যবহৃত হতে পারে না তার পূর্ববর্তী পদকে 'উপপদ' বলে। এই উপপদের সঙ্গে ওই ধরনের কৃদন্ত পদের যে সমাস তাকে উপপদ তৎপুরুষ সমাস বলে।"[৭৮] যেমন– গৃহে থাকে যে = গৃহস্থ, এখানে 'গৃহস্থ' এই উপপদ তৎপুরুষ সমাসনিষ্পন্ন পদে উত্তরপদরূপে প্রযুক্ত কৃদন্ত 'স্থ'র স্বতন্ত্র প্রয়োগ সম্ভব নয়। এ কারণে 'গৃহে স্থ' এরূপ ব্যাসবাক্য করা চলবে না বা এরূপ ব্যাসবাক্য হয় না। অতএব উপপদ তৎপুরুষ সমাস হচ্ছে অস্বপদবিগ্রহ নিত্যসমাস (নিত্যসমাস সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হয়েছে)।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এরূপ সমাসকে উপপদ তৎপুরুষ না বলে উপপদ সমাস বলেছেন। তাঁর মতে, "ধাতুর সহিত উপপদের যে নিত্য সমাস হয়, তাহাকে উপপদ সমাস বলে।"[৭৯]

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের বিবেচনায় বাংলায় উপপদ তৎপুরুষ সমাসের কোনো আবশ্যকতা স্বীকার করা যায় না। অর্থাৎ উপপদ তৎপুরুষ বা উপপদ সমাস এরূপ শ্রেণীবিভাগ স্বীকার না করেও পারা যায়। কেননা ছেলেধরা, যাদুকর, পকেটমার, ঘরপোড়া, ধামাধরা প্রভৃতি উপপদ তৎপুরুষ সমাসের দৃষ্টান্তসমূহের প্রত্যেকটিকে অন্য কোনো সমাসের অন্তর্গত করা যায়। যেমন– "ছেলেকে ধরা (কর্ম-তৎপুরুষ); যাদু করে যে = যাদুকর (বহুব্রীহি); হরেক রকম বুলি বলে যে = হরবোলা (বহুব্রীহি); ঘরে পোড়া = ঘরপোড়া (অধিকরণ-তৎপুরুষ)।"[৮০] তিনি আরো বলেছেন, "বলা বাহুল্য, উক্ত শব্দগুলির প্রত্যেকটিকেই 'বহুব্রীহি' সমাস বলিয়া গণ্য করা যায়।"[৮১]

প্রাদিতৎপুরুষ ও নঞ্তৎপুরুষ সমাসের সঙ্গে কারকের কোনো প্রকার সম্পর্ক নেই। অব্যয়ীভাব সমাস সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রাদিতৎপুরুষ ও নঞ্তৎপুরুষ সমাস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আর অলুক সমাস কোনো পৃথক সমাস নয়, যে-কোনো সমাসে পূর্বপদের বিভক্তি লোপ না পেলে তা অলুক সমাস নামে অভিহিত হয় (অলুক সমাসের আলোচনা প্রসঙ্গে অলুক তৎপুরুষ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে)।

তৎপুরুষ সমাসের আরো একটি শ্রেণী সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। সেটি হচ্ছে প্রথমা তৎপুরুষ। অধিকাংশ বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থে তৎপুরুষ সমাসের এরূপ শ্রেণীবিভাগ পরিলক্ষিত

হয় না। তবে *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ* গ্রন্থে দাগ-লাগা, হাতি-কাঁদা, বাজ-পড়া, ঘর-চাপা প্রভৃতি সমাসবদ্ধ পদগুলোকে কর্তৃ-বাচক – প্রথমা-তৎপুরুষ সমাসের দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করা হয়েছে।[৮২] উদাহরণগুলোর প্রথম অব্যয়টি (পূর্বপদটি) কর্তৃবাচক এবং দ্বিতীয় অব্যয়টি (পরপদটি) সংশ্লিষ্ট ক্রিয়াবাচক কৃদন্ত শব্দ। *সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙলা ব্যাকরণ* গ্রন্থে কিন্তু এরূপ শ্রেণীবিভাগ দৃষ্ট হয় না। তবে পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের *ভাষাবিদ্যা পরিচয়* গ্রন্থে কর্তৃবাচক (১মা) তৎপুরুষ সমাসের দৃষ্টান্ত হিসেবে 'দাগ-লাগা' এবং 'ঘর-চাপা' পদদুটি উল্লেখ করা হয়েছে।[৮৩] পূর্বেও বলা হয়েছে যে, কোনো কোনো বৈয়াকরণের মতে কর্মধারয় সমাস মূলত প্রথমা তৎপুরুষ।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে, সমাসের পূর্বপদ কারক-সম্পর্কজাত বিশেষ্য হলেই সেই সমাস তৎপুরুষ অথবা তৎপুরুষ হলেই তার পূর্বপদ হবে কারক-সম্পর্কজাত বিশেষ্য এ কথা সর্বতোভাবে গ্রাহ্য নয়। মূল কথা হচ্ছে, যে সমাসে পরপদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, সেই সমাসই হচ্ছে তৎপুরুষ।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এটাও বলা যায় যে, ড. মাহবুবুল হক সমস্যমান পদদুটির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য অনুসারে সমাসকে যে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন তা সর্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যতিক্রম বা ভিন্নতা রয়েছে। উল্লেখ্য যে, অন্য কোনো বৈয়াকরণ সমাসের এরূপ শ্রেণীবিভাগ করেননি। সমাসের এরূপ শ্রেণীবিভাগ মূলত সমাসের বহিরঙ্গ বিশ্লেষণ, আকৃতিগত স্বরূপ নির্ণয়মাত্র। সমাসের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য তথা অর্থগত পার্থক্য এরূপ শ্রেণীবিভাগে ধরা পড়ে না। পূর্বেও বলা হয়েছে যে, পদার্থের প্রাধান্যের ভিত্তিতে অব্যয়ীভাবাদি যে শ্রেণীবিভাগ তাতেই সমাসের অন্তঃস্বরূপ ধরা পড়ে। যেমন– যিনি রাম তিনিই কৃষ্ণ = রামকৃষ্ণ এবং রাম ও কৃষ্ণ = রামকৃষ্ণ। এই দুটো ক্ষেত্রেই সমস্তপদের আকৃতি বা গঠন এক এবং দুটো ক্ষেত্রেই পূর্বপদ ও পরপদ উভয়ই বিশেষ্য। আকৃতিগত বা গঠনগত দিক থেকে পদদ্বয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আকৃতিগত বা গঠনগত দিক থেকে ক্ষেত্রদ্বয়ে একই শ্রেণীর সমাস ('বিশেষ্যের সঙ্গে বিশেষ্যের সমাস') হয়েছে । কিন্তু ক্ষেত্রদ্বয়ের মধ্যে অর্থগত যে পার্থক্য রয়েছে সে অনুসারে দুটো ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন দুটো সমাস হয়েছে। প্রথম ক্ষেত্রে 'রামকৃষ্ণ' পদে একই ব্যক্তিকে বোঝাচ্ছে বিধায় কর্মধারয় (তৎপুরুষের অন্তর্ভুক্ত) এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে 'রামকৃষ্ণ' পদে দুজন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে বোঝাচ্ছে বিধায়, অর্থাৎ উভয়পদের অর্থের প্রাধান্যহেতু দ্বন্দ্ব সমাস হয়েছে। যিনি পণ্ডিত তিনিই মূর্খ/পণ্ডিত (জ্ঞানে) অথচ মূর্খ (ব্যবহারে) = পণ্ডিতমূর্খ এবং পণ্ডিত ও মূর্খ = পণ্ডিতমূর্খ। এই দুটো ক্ষেত্রেই সমস্তপদের আকৃতি এক। দুটো ক্ষেত্রেই পূর্বপদ ও পরপদ উভয়ই বিশেষণ। এই দিক থেকে দুটো ক্ষেত্রে একই শ্রেণীর সমাস ('বিশেষণের সঙ্গে

বিশেষণের সমাস') হয়েছে। কিন্তু অর্থগত পার্থক্যের কারণে দুটো ক্ষেত্রে দুটো ভিন্ন ভিন্ন সমাস হয়েছে। প্রথম ক্ষেত্রে পূর্বপদ ও পরপদে একই ব্যক্তিকে বোঝানোর কারণে কর্মধারয় সমাস হয়েছে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দু'জন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে বোঝাচ্ছে বিধায়, অর্থাৎ উভয়পদের অর্থের প্রাধান্যহেতু দ্বন্দ্ব সমাস হয়েছে। এরূপ দ্বন্দ্ব ও কর্মধারয় সমাসের অনেক দৃষ্টান্তের আকৃতি এক।

বহুব্রীহি (সমানাধিকরণ বহুব্রীহি) এবং কর্মধারয় (সাধারণ কর্মধারয়) সমাসনিষ্পন্ন অনেক পদের আকৃতি এক। যেমন – 'তোমার এমন দুর্বুদ্ধি হল কেন?' – এখানে 'দুর্বুদ্ধি' এই সমাসবদ্ধ পদে উত্তরপদ বুদ্ধিরই অর্থপ্রাধান্য বর্তমান এবং এর ব্যাসবাক্য হচ্ছে 'দুঃ (দুষ্টা) যে বুদ্ধি'। 'দুর্বুদ্ধি' এই সমাসবদ্ধ পদের পূর্বপদ 'দুঃ' বিশেষণ এবং উত্তরপদ 'বুদ্ধি' বিশেষ্য। অতএব এক্ষেত্রে উত্তরপদের অর্থের প্রাধান্যহেতু 'দুর্বুদ্ধি' পদে কর্মধারয় সমাস হয়েছে। পক্ষান্তরে 'তুমিই ওই দুর্বুদ্ধিকে বোঝাবার চেষ্টা কর' – এখানে 'দুর্বুদ্ধি' এই সমাসবদ্ধ পদে পূর্বপদ 'দুঃ' কিংবা পরপদ 'বুদ্ধি' কোনোটির অর্থ প্রধানভাবে না বুঝিয়ে দুষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিকে বোঝাচ্ছে এবং এর ব্যাসবাক্য হচ্ছে 'দুঃ (দুষ্টা) বুদ্ধি যার সে'। অতএব এক্ষেত্রে অন্যপদার্থের প্রাধান্যহেতু 'দুর্বুদ্ধি' পদে বহুব্রীহি সমাস হয়েছে। পীত যে অম্বর = পীতাম্বর, এখানে পরপদ 'অম্বর'-এর অর্থের প্রাধান্য বর্তমান, কেননা 'পীতাম্বর' পদের অর্থ এখানে পীত বর্ণের বস্ত্র। অতএব উত্তরপদের অর্থের প্রাধান্যহেতু এখানে কর্মধারয় সমাস হয়েছে। পক্ষান্তরে পীত অম্বর যার = পীতাম্বর, এখানে পূর্বপদ 'পীত' এবং উত্তরপদ 'অম্বর' কোনোটির অর্থের প্রাধান্য প্রকাশিত হয় নি। এখানে পীত বর্ণের বস্ত্র পরিহিত ব্যক্তিকে বোঝাচ্ছে। অতএব অন্যপদার্থের প্রাধান্যহেতু এখানে বহুব্রীহি সমাস হয়েছে।

আবার সমানাধিকরণ বহুব্রীহি ও উপপদ তৎপুরুষ সমাসের অনেক দৃষ্টান্তের আকৃতি এক। এরূপ ক্ষেত্রে উত্তরপদে যদি ক্রিয়ার অর্থপ্রাধান্য বর্তমান থাকে, তখন ব্যাসবাক্যের শেষ পদটি হয় কর্তৃকারক যে, যিনি, যারা, যাঁরা এবং সমাস হয় উপপদ তৎপুরুষ। পক্ষান্তরে, যদি বিশেষণের অর্থ পরিস্ফুট হয় এবং ব্যাসবাক্যে যার, যাঁর, যার দ্বারা, যাতে থাকে তবে সমাস হয় বহুব্রীহি। যেমন – কান কাটা যার = কানকাটা, এখানে 'কাটা' কৃদন্ত বিশেষণের অর্থের প্রাধান্য পরিস্ফুট। অতএব এখানে 'কানকাটা' পদে বহুব্রীহি সমাস হয়েছে। কিন্তু কান কাটে যে = কানকাটা, এখানে কৃদন্ত পদে ক্রিয়ারই অর্থপ্রাধান্য বর্তমান রয়েছে। অতএব এখানে 'কানকাটা' পদে উপপদ তৎপুরুষ সমাস হয়েছে।

নঞ্তৎপুরুষ ও নঞ্বহুব্রীহি সমাসের সমস্তপদের আকৃতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে একই। এ কারণে অর্থ বুঝে ব্যাসবাক্য ও সমাস নির্ণয় করতে হয়। নঞ্তৎপুরুষে পূর্বপদ অ, অন্ বা নিঃ-এর অর্থ 'না', 'নয়'। কিন্তু নঞর্থক বহুব্রীহিতে পূর্বপদ অ, অন্ বা নিঃ এর অর্থ 'নাই'

('নেই')। **'অজ্ঞানে** করেছি কত পাপ', এই বাক্যে 'অজ্ঞান'-এর অর্থ (ব্যাসবাক্য) 'নয় জ্ঞান'। অতএব 'অজ্ঞান' পদে এখানে নঞ্তৎপুরুষ সমাস হয়েছে। কিন্তু **'অজ্ঞানের** অপরাধ ক্ষমা কর প্রভু', এই বাক্যে 'অজ্ঞান' পদের অর্থ (ব্যাসবাক্য) 'জ্ঞান নেই যার'। অতএব 'অজ্ঞান' পদে এখানে নঞ্বহুব্রীহি সমাস হয়েছে। এরূপ – নয় পয়া = অপয়া (নঞ্তৎপুরুষ); কিন্তু নেই পয়া যার = অপয়া (নঞ্বহুব্রীহি)।

কিছু কিছু সমাসবদ্ধ পদ অর্থভেদে কর্মধারয় ও তৎপুরুষ দুটোই হয়। যেমন – ভাজা যে পটোল = পটোলভাজা, বাটা যে লঙ্কা = লঙ্কাবাটা, এগুলো কর্মধারয় সমাসনিষ্পন্ন। কিন্তু 'লঙ্কাবাটা বন্ধ করে পটোলভাজায় হাত দাও' এই বাক্যে 'লঙ্কাকে বাটা', 'পটোলকে ভাজা' অর্থে 'লঙ্কাবাটা' ও 'পটোলভাজা' পদদ্বয় দ্বিতীয়া তৎপুরুষ (কর্ম তৎপুরুষ) সমাসনিষ্পন্ন, কেননা ক্রিয়ার অর্থই এখানে প্রাধান্য পাচ্ছে।

দ্বিগু ও সংখ্যাপূর্বক (বা সংখ্যাবাচক) বহুব্রীহি সমাসের সমাসবদ্ধ পদের আকৃতি অনেক দৃষ্টান্তে এক। যেখানে সমষ্টি বা সমাহার বোঝায় সেখানে দ্বিগু, আর যেখানে সমস্যমান পদদ্বয়ের কোনোটিরই অর্থ না বুঝিয়ে অতিরিক্ত একটি পদের অর্থ বোঝায় সেখানে সংখ্যাপূর্বক (সংখ্যাবাচক) বহুব্রীহি হয়। যেমন – 'তোমার মহিমা মাতা, পঞ্চানন পঞ্চাননে বর্ণিতে না পারে' এই বাক্যের প্রথম 'পঞ্চানন' পদে 'পঞ্চ আনন যার' অর্থে শিবকে বোঝাচ্ছে। অতএব অন্যপদার্থের প্রাধান্যহেতু এখানে বহুব্রীহি সমাস হয়েছে। দ্বিতীয় 'পঞ্চানন' পদে 'পঞ্চ আননের সমাহার (সমষ্টি)' অর্থে এখানে দ্বিগু সমাস হয়েছে। এরূপ – দশ আনন যার = দশানন (বহুব্রীহি), কিন্তু দশ আননের সমাহার = দশানন (দ্বিগু)।

উপমিত কর্মধারয় ও রূপক কর্মধারয় উভয়ই উপমেয়ের সঙ্গে উপমানের সমাস এবং উভয় সমাসের সমস্যমান পদদ্বয় বিশেষ্য এবং সমস্তপদটিও বিশেষ্য। উভয় ক্ষেত্রেই উপমান-উপমেয়ের তুলনা বোঝায় এবং কোনোটিতেই সাধারণ-ধর্মবাচক পদের উল্লেখ থাকে না। এ কারণে একই দৃষ্টান্ত অর্থগত পার্থক্যের কারণে বা প্রয়োগ অনুসারে উপমিত কর্মধারয় ও রূপক কর্মধারয় হয়ে থাকে। 'উপমিত কর্মধারয়ে উপমেয়ের প্রাধান্য, কিন্তু রূপক কর্মধারয়ে উপমানের প্রাধান্য (বর্তমান থাকে)। যেমন– (১)'তনয়ের **মুখচন্দ্র** উজলিল জননীহৃদয়।' (২) 'তনয়ের **মুখচন্দ্র** চুম্বিল জননী।' এখানে দেখা যাচ্ছে, উভয় ক্ষেত্রে একই 'মুখচন্দ্র' রয়েছে। আর সমাসবদ্ধ পদদ্বয়ের প্রথমাঙ্গ (পূর্বপদ) উপমেয় এবং উত্তরাঙ্গ (উত্তরপদ) উপমান। সুতরাং বহিরঙ্গের বিচারে উভয় ক্ষেত্রের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু অন্তরঙ্গের বিচারে তথা অর্থবিচারে এদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। প্রথম বাক্যে কার প্রাধান্য রয়েছে? – মুখের, না চন্দ্রের? ক্রিয়া উজলিল-কে প্রশ্ন করলেই তা বোঝা সম্ভব। কে উজ্জ্বল করল? মুখ, না চন্দ্র? মুখের পক্ষে উজ্জ্বল করা সম্ভব নয়, চন্দ্রের পক্ষেই সম্ভব। আর চন্দ্র

হচ্ছে উপমান। অতএব এখানে উপমানের প্রাধান্য বর্তমান। এ কারণে এখানে 'মুখচন্দ্র' পদে সমাস হল রূপক কর্মধারয় এবং ব্যাসবাক্য হচ্ছে 'মুখরূপ চন্দ্র'। এবার দ্বিতীয় বাক্যে কার প্রাধান্য বর্তমান? ক্রিয়া চুম্বিল-কে প্রশ্ন করলেই তা বোঝা সম্ভব। কী চুম্বন করল? মুখ, না চন্দ্র? চন্দ্র অসম্ভব, মায়ের পক্ষে সন্তানের মুখচুম্বনই সম্ভব। অতএব বাক্যে উপমেয় 'মুখ'-এরই প্রাধান্য বর্তমান। এ কারণে এখানে 'মুখচন্দ্র' পদে সমাস হল উপমিত কর্মধারয় এবং ব্যাসবাক্য হচ্ছে 'মুখ চন্দ্রের ন্যায়'।

'সেই **পুরুষসিংহকে** নমস্কার'– এখানে উপমেয় 'পুরুষ' পদের অর্থের প্রাধান্য বোঝাচ্ছে। তাছাড়া সিংহ এমনিতে প্রণম্য নয়। সুতরাং এখানে 'পুরুষসিংহ' পদে উপমিত কর্মধারয় সমাস হয়েছে এবং এর ব্যাসবাক্য হচ্ছে 'পুরুষ সিংহের ন্যায়'। কিন্তু '**পুরুষসিংহ** গর্জন করে উঠল' – এখানে উপমান 'সিংহ' পদের অর্থের প্রাধান্য বোঝাচ্ছে। কারণ সিংহ গর্জন করে থাকে। পুরুষ এখানে সিংহের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গেছে। সুতরাং এখানে 'পুরুষসিংহ' পদে রূপক কর্মধারয় সমাস হয়েছে এবং এর ব্যাসবাক্য হচ্ছে 'পুরুষরূপ সিংহ'। এরূপ – 'ঠাকুরের মুখে ভক্তগণ **কথামৃত** শ্রবণ করছেন' – এখানে কথামৃত = কথা অমৃতের তুল্য – উপমিত কর্মধারয়। 'ভক্তগণ আচার্যের **কথামৃত** পান করে ধন্য হলেন' – এখানে কথামৃত = কথারূপ অমৃত – রূপক কর্মধারয়।

কিন্তু 'আনন্দে হেরিলা (দেখলেন) মাতা সন্তানের **বদনকমল**'। এখানে 'বদনকমল' এই সমাসবদ্ধ পদে পূর্বপদ ও পরপদ উভয়ই বিশেষ্য এবং এখানে দুটো পদেরই প্রাধান্য রয়েছে। কেননা 'বদন' দেখাও সম্ভব, আবার 'কমল' দেখাও সম্ভব। নিশ্চিতরূপে একক উপমেয় (বদন) বা উপমান (কমল) কোনোটিরই প্রাধান্য প্রকাশ পাচ্ছে না, অথচ দুটোরই তুল্য মূল্য রয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে উপমিত কর্মধারয় ও রূপক কর্মধারয় দুই প্রকার সমাসই হয়। যেমন– (১) বদন কমলের মতো= বদনকমল – উপমিত কর্মধারয় এবং (২) বদনরূপ কমল = বদনকমল – রূপক কর্মধারয়। অনুরূপ – 'যাত্রীরা এখন ভক্তিভরে মায়ের **পাদপদ্ম** দেখতে ব্যস্ত'। এই বাক্যস্থিত 'পাদপদ্ম' পদেও উপমিত ও রূপক কর্মধারয় সমাস হয়। যেমন– (১) পাদ পদ্মের ন্যায় = পাদপদ্ম – উপমিত কর্মধারয় এবং (২) পাদরূপ পদ্ম = পাদপদ্ম – রূপক কর্মধারয়।

বাংলায় এরূপ বহু পদের অর্থভেদে ভিন্ন ভিন্ন সমাস হয়। অতএব কোনো সমস্তপদের সমাস নির্ণয় করতে হলে, পদটি বাক্যে কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা বুঝতে হবে। সমস্ত পদের অর্থ অনুসারেই পদটিতে কী সমাস হয়েছে তা নির্ধারিত হয়। মূল কথা হচ্ছে, আকৃতি অনুসারে নয়, সমস্তপদের অর্থ অনুসারে ব্যাসবাক্য এবং ব্যাসবাক্য অনুসারেই সমাসের নাম নির্ধারিত হয়। অতএব সমাস-সাধনে সমস্তপদের অর্থের দিকে লক্ষ রাখা কর্তব্য।

দ্বন্দ্ব, তৎপুরুষ, কর্মধারয় ও বহুব্রীহি সমাসের উপবিভাগ রয়েছে (তৎপুরুষ সমাসের উপবিভাগ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে)।

দ্বন্দ্ব সমাস – বাংলায় ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বৈয়াকরণগণ দ্বন্দ্ব সমাসের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। মাহবুবুল আলমের মতে, দ্বন্দ্ব সমাস নানারকম হতে পারে; যেমন – (১) সাধারণ দ্বন্দ্ব, (২) মিলনার্থক দ্বন্দ্ব, (৩) সম্বন্ধবাচক দ্বন্দ্ব, (৪) সমার্থক দ্বন্দ্ব, (৫) বিরোধার্থক দ্বন্দ্ব, (৬) একশেষ দ্বন্দ্ব, (৭) অলুক দ্বন্দ্ব এবং (৮) বহুপদী দ্বন্দ্ব।[৮৪] অজিতকুমার গুহ ও আনিসুজ্জামানের মতে, দ্বন্দ্ব সমাস নানা শ্রেণীর হতে পারে; যেমন – (১) সাধারণ দ্বন্দ্ব, (২) মিলনার্থক দ্বন্দ্ব, (৩) বিরোধার্থক দ্বন্দ্ব, (৪) সমার্থক দ্বন্দ্ব, (৫) অলুক দ্বন্দ্ব এবং (৬) একশেষ দ্বন্দ্ব।[৮৫] ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের মতে, দ্বন্দ্ব-সমাস অনেক প্রকারে গঠিত হয়ে থাকে। তার মধ্যে (১) মিলনার্থক দ্বন্দ্ব, (২) বিরোধার্থক দ্বন্দ্ব, (৩) সমার্থক দ্বন্দ্ব, (৪) অলুক দ্বন্দ্ব, (৫) বহুপদী দ্বন্দ্ব এবং (৬) একশেষ দ্বন্দ্ব এই কয়টি প্রধান।[৮৬] উদাহরণসহ উপর্যুক্ত প্রত্যেক প্রকার দ্বন্দ্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হলো –

(১) **সাধারণ দ্বন্দ্বঃ** একাধিক পদের একত্র অবস্থানে দ্বন্দ্ব সমাস হলে তাকে সাধারণ দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন – কালি ও কলম = কালিকলম, লতা ও পাতা = লতাপাতা ইত্যাদি।

(২) **মিলনার্থক দ্বন্দ্বঃ** যে দ্বন্দ্ব সমাসে একাধিক পদের মিলন বোঝায় তাকে মিলনার্থক দ্বন্দ্ব বলে। যেমন – চা ও বিস্কুট = চাবিস্কুট, ছেলে ও মেয়ে = ছেলেমেয়ে, জিন ও পরী = জিনপরী ইত্যাদি।

(৩) **বিরোধার্থক দ্বন্দ্বঃ** যে দ্বন্দ্ব সমাসে পূর্বপদ ও পরপদের মধ্যে পরস্পর বিরোধ বোঝায় তাকে বিরোধার্থক দ্বন্দ্ব বলে। যেমন– দা ও কুমড়া = দাকুমড়া, সুর ও অসুর = সুরাসুর ইত্যাদি।

(৪) **বিপরীতার্থক দ্বন্দ্বঃ** বিপরীতার্থক বা বিপরীতধর্মী শব্দযোগে গঠিত দ্বন্দ্ব সমাসকে বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব বলে। অর্থাৎ যে দ্বন্দ্ব সমাসে পূর্বপদ ও পরপদ বিপরীত অর্থ বহন করে তাই বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব। যেমন– ধনী ও দরিদ্র = ধনীদরিদ্র, বেচা ও কেনা = বেচাকেনা, ছোট ও বড় = ছোটবড় ইত্যাদি।

(৫) **সমার্থক দ্বন্দ্বঃ** একই ধরনের বিষয় বুঝিয়ে দ্বন্দ্ব সমাস হলে অর্থাৎ পূর্বপদ ও পরপদ একই অর্থজ্ঞাপক (সমার্থক) হলে তাকে সমার্থক দ্বন্দ্ব বলে। যেমন – ভয় ও ডর = ভয়ডর, লজ্জা ও শরম = লজ্জাশরম ইত্যাদি। প্রায় সমার্থক শব্দদ্বয়েও দ্বন্দ্ব সমাস হয়; যেমন – হাট ও বাজার = হাটবাজার, হাসি ও ঠাট্টা = হাসিঠাট্টা ইত্যাদি।

(৬) **সম্বন্ধবাচক দ্বন্দ্বঃ** যে-দ্বন্দ্ব সমাসে সম্বন্ধ বোঝায় তাকে সম্বন্ধবাচক দ্বন্দ্ব বলে। এরূপ দ্বন্দ্বকে মিলনার্থক বা মিলনাত্মক দ্বন্দ্বও বলা চলে। যেমন – ভাই ও বোন = ভাইবোন, পিতা ও পুত্র = পিতাপুত্র ইত্যাদি।

(৭) **অলুক দ্বন্দ্বঃ** যে দ্বন্দ্ব সমাসে সমস্যমান পদগুলোর বিভক্তি লোপ পায় না তাকে অলুক দ্বন্দ্ব বলে। যেমন– হাতে ও কলমে = হাতেকলমে। এরূপ – ঘরেবাইরে, দুধেভাতে, কোলেপিঠে, পথেঘাটে ইত্যাদি।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ অলুক দ্বন্দ্ব সম্পর্কে বলেছেন, "বাঙ্গালা দ্বন্দ্ব সমাসে কখনও কখনও স্বাধীন সংযোজক অব্যয়ের লোপ হয় না। ইহাকে অলুক দ্বন্দ্ব সমাস বলা যাইতে পারে। যথা– 'তপ্ত **ধুলি ও বালুকাতে** দুই পা পুড়িয়া যাইতেছে' (বিদ্যাসাগর), 'যে আপন মঙ্গলের নিমিত্ত **স্বজাতীয় ও আত্মীয়দিগের** সর্বনাশ করিতে পারে' (বিদ্যাসাগর)।"[৮৭]

(৮) একশেষ দ্বন্দ্বঃ যে দ্বন্দ্ব সমাসে সমস্যমান পদগুলোর মধ্যে একটিমাত্র পদ অবশিষ্ট থাকে এবং অন্যগুলো লোপ পায়, তাকে একশেষ দ্বন্দ্ব বলে। মাহবুবুল আলম বলেছেন, "যে দ্বন্দ্ব সমাসে প্রধান পদটি অবশিষ্ট থেকে অন্য পদের লোপ হয় এবং শেষ পদ অনুসারে যখন শব্দের রূপ নির্ধারিত হয় তখন তাকে একশেষ দ্বন্দ্ব বলে।"[৮৮] যেমন – তুমি ও আমি = আমরা, সে ও তুমি = তোমরা, সে, তুমি ও আমি = আমরা।

উল্লেখ্য যে, বাংলায় 'একশেষ' দ্বন্দ্ব সমাস হিসেবে স্বীকৃত হলেও সংস্কৃতে কিন্তু সমাস বলে স্বীকৃত নয়। বিশ্বরূপ সাহা বলেছেন, "দ্বন্দ্বের 'চ' যোগে ব্যাসবাক্য হয় বলে মনে হয় যেন একশেষ এক প্রকার দ্বন্দ্ব সমাস। আসলে একশেষ সমাস নয়, এ হচ্ছে সমাসের মত একটি স্বতন্ত্র বৃত্তি। উক্ত ভুল বশে বাংলা বৈয়াকরণেরা সাধারণতঃ একশেষকে পৃথগ্‌বৃত্তি স্বীকার না করে একশেষ দ্বন্দ্ব স্বীকার করেন।"[৮৯]

(৯) **বহুপদী দ্বন্দ্বঃ** বাংলায় বহুপদময় সমাসের ব্যবহার খুব কম হয়ে থাকে। তবে সংস্কৃতের অনুসরণে বাংলায় অনেক সময় দুয়ের অধিক পদ মিলিত হয়ে সমাসবদ্ধ অবস্থায় ব্যবহৃত হয় এবং সমাসবদ্ধ অবস্থায় প্রত্যেকটি পদের অর্থপ্রাধান্য বর্তমান থাকে। এরূপ দুয়ের অধিক পদের সমন্বয়ে গঠিত সমাসকে বহুপদী দ্বন্দ্ব বলে। যেমন – তেল, নুন ও লাকড়ি = তেল-নুন-লাকড়ি। এরূপ – পশু-পাখি-কীট-পতঙ্গ, নাচ-গান-বাজনা, টক-ঝাল-মিষ্টি ইত্যাদি।

বাংলায় তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে বহুপদী দ্বন্দ্বের ব্যবহার বেশি হয়ে থাকে। যেমন – চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র, চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বক, সত্য-শিব-সুন্দর, নদী-গিরি-বন ইত্যাদি।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস সাধারণত সমাসবদ্ধ না করে পৃথক শব্দরূপে লিখিত হয়।[৯০] মাহবুবুল আলমও বলেন, "সাধারণত সমাসবদ্ধ না করে হাইফেন

ছাড়াই এসব পদ ব্যবহৃত হয়। যেমন: নাক কান গলা; পাইক পেয়াদা সিপাই শান্ত্রী; ইট কাঠ চুন সুরকি।"[৯১]

(১০) **ইত্যাদি অর্থে দ্বন্দ্ব:** একই জাতীয় বা একই ধরনের কোনো কিছু বোঝাতে বাংলায় এক ধরনের দ্বন্দ্ব সমাস হয়ে থাকে। এরূপ দ্বন্দ্ব সমাসকে ইত্যাদি-অর্থসূচক দ্বন্দ্ব বলে। ইত্যাদি-অর্থসূচক দ্বন্দ্ব সমাসে সাধারণত পূর্বপদের প্রাধান্য থাকে এবং উত্তরপদটি 'ইত্যাদি, প্রভৃতি, আরও সমগোত্রীয় বা এক জাতীয় বস্তু'– এই অর্থ প্রকাশ করে। এ সমাসে পূর্বপদে নির্দিষ্ট ও উত্তরপদে অনির্দিষ্ট অনুরূপ বস্তু বোঝায়। মূল কথা হচ্ছে, 'অনুরূপ বস্তু' বোঝানোর জন্য বাংলায় সহচর, অনুচর, প্রতিচর, বিকার, অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক শব্দযোগে ইত্যাদি-অর্থসূচক দ্বন্দ্ব সমাস গঠিত হয়।

(ক) সহচর শব্দযোগে গঠিত দ্বন্দ্ব: এরূপ দ্বন্দ্ব সমাসে পূর্বপদের সমার্থক বা প্রায় সমার্থক অর্থাৎ একার্থক, তুল্যার্থক বা অনুরূপার্থক শব্দ পরপদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন– গাছ-গাছালি, ছেলে-ছোকরা, কাজ-কর্ম, জীব-জন্তু, ধর-পাকড়, জাঁক-জমক, ছাই-ভস্ম, মাথা-মুণ্ডু, পয়সা-কড়ি, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি।

এরূপ দ্বন্দ্ব সমাস মূলত পূর্বোক্ত সমার্থক দ্বন্দ্ব সমাসের বিশেষ প্রয়োগরূপ। এ কারণে জ্যোতিভূষণ চাকী বলেছেন, "রাজাবাদশা, ডাক্তারবৈদ্য, ঠাট্টামস্করা ইত্যাদি সমাসবদ্ধ পদে দেখা যায় সমস্যমান পদগুলি সমার্থক। এগুলির কোনওটিতেই সমস্যমান পদের কোনওটির অর্থই না বুঝিয়ে ব্যঞ্জনায় 'তজ্জাতীয়' বা 'সেই ধরনের কিছু' এমন অর্থ বোঝায়। যেমন রাজাবাদশার অর্থ রাজার ন্যায় ব্যক্তিরা, ডাক্তারবৈদ্য বলতে বোঝায় বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসক। তেমন ঠাট্টামস্করা মানে রসিকতার কথা।"[৯২] সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, "কতকগুলি দ্বন্দ্ব-সমাসে সমার্থক এক বা বিভিন্ন ভাষার পদ পাওয়া যায় – বহুস্থলে এইরূপ দ্বন্দ্ব-সমাস-দ্বারা বিভিন্ন বস্তুর সংযোগ না বুঝাইয়া, অনুরূপ বস্তুর সমষ্টি বুঝায়;"[৯৩] যেমন – কাগজপত্র, এখানে পূর্বপদ 'কাগজ' ফারসি শব্দ এবং পরপদ 'পত্র' সংস্কৃত (তৎসম) শব্দ, আর 'কাগজপত্র' পদের অর্থ কোনো বিশেষ বিষয়-সম্পৃক্ত দলিল প্রভৃতি।

(খ) অনুচর শব্দযোগে গঠিত দ্বন্দ্ব: এরূপ দ্বন্দ্ব সমাসে পরপদটি সাধারণত অল্পপরিচিত, অপ্রচলিত অথবা অর্থহীন হয়ে থাকে। যেমন– আলাপ-সালাপ, চুরি-চামারি, হাঁড়ি-কুড়ি ইত্যাদি।

(গ) প্রতিচর শব্দযোগে গঠিত দ্বন্দ্ব: রাজা-উজীর, বামুন-চাঁড়াল, বামুন-বাগ্‌দী, রদ-বদল, পীর-মুরীদ, বেচা-কেনা, বিকি-কিনি, জজ-ব্যারিস্টার ইত্যাদি।

(ঘ) বিকার শব্দযোগে গঠিত দ্বন্দ্ব: ঠাকুর-ঠুকুর, ফাঁকি-ফুঁকি, জারি-জুরি, ঠিক-ঠাক, মিট-মাট, টান-টোন, গোল-গাল, দোকান-টোকান ইত্যাদি। কখনো কখনো বিকার শব্দটি পূর্বে

বসে এবং এরূপ ক্ষেত্রে পূর্বপদ অনির্দিষ্টতা প্রকাশ করে। যেমন– আঁকা-বাঁকা, আনাচ-কানাচ, অদল-বদল, হাবু-ডুবু ইত্যাদি।

(ঙ) অনুকার শব্দযোগে গঠিত দ্বন্দ্ব: বাসন-কোসন, চাকর-বাকর, তেল-টেল, কাজ-টাজ ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে, উপর্যুক্ত জোড়া শব্দগুলোর দ্বন্দ্বসমাসত্ব স্বীকার করলেও কোনো কোনো বৈয়াকরণের মতে এগুলো মূলত শব্দদ্বৈত। জ্যোতিভূষণ চাকী বলেছেন, "সহচর ও অনুচর বা অনুকার শব্দের সঙ্গে একধরনের দ্বন্দ্বসমাস বাংলায় প্রচলিত। যেমন চড়চাপড়, অলিগলি, ঘুষঘাষ, তুকতাক ইত্যাদি। এগুলোকে অবশ্য শব্দদ্বৈতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা চলে।"[৯৪] ঋষিদাস বলেছেন, "এই ধরনের দ্বন্দ্বসমাসে অনেক সময় একটা পদ অর্থহীন হওয়ায় ঠিকমতো ব্যাসবাক্য করা যায় না। যেমন– জলটল, জড়সড়, রকমসকম, আশপাশ। এগুলিকে দ্বন্দ্বসমাস না বলিয়া শব্দদ্বৈত বলাই উচিত।"[৯৫]

উপর্যুক্ত শ্রেণীগুলো ব্যতীত অন্য দৃষ্টিকোণ থেকেও দ্বন্দ্ব সমাসের শ্রেণীবিভাগ হতে পারে। পূর্বে বলা হয়েছে যে, বিশেষ্য পদের সঙ্গে বিশেষ্য পদের যোগে, বিশেষণ পদের সঙ্গে বিশেষণ পদের যোগে, সর্বনাম পদের সঙ্গে সর্বনাম পদের যোগে, ক্রিয়াপদের সঙ্গে ক্রিয়াপদের যোগে, ক্রিয়াবিশেষ্য পদের সঙ্গে ক্রিয়াবিশেষ্য পদের যোগে, ক্রিয়াবিশেষণ পদের সঙ্গে ক্রিয়াবিশেষণ পদের যোগে এবং সংখ্যাবাচক পদের সঙ্গে সংখ্যাবাচক পদের যোগে দ্বন্দ্ব সমাস গঠিত হয়। এ দিক থেকেও দ্বন্দ্ব সমাসের শ্রেণীবিভাগ হতে পারে; যেমন–

(ক) বিশেষ্য পদের সঙ্গে বিশেষ্য পদের যোগে গঠিত দ্বন্দ্ব: কাগজপত্র, গ্রহনক্ষত্র, চন্দ্রসূর্য ইত্যাদি।

(খ) বিশেষণ পদের সঙ্গে বিশেষণ পদের যোগে গঠিত দ্বন্দ্ব: চালাকচতুর, সহজসরল, গণ্যমান্য ইত্যাদি।

(গ) সর্বনাম পদের সঙ্গে সর্বনাম পদের যোগে গঠিত দ্বন্দ্ব: যে-সে, এখানে-ওখানে, যা-তা ইত্যাদি।

(ঘ) ক্রিয়াপদের সঙ্গে ক্রিয়াপদের যোগে গঠিত দ্বন্দ্ব: হেসে-খেলে, বলে-কয়ে, মেরে-ধরে, হারি-জিতি ইত্যাদি।

(ঙ) ক্রিয়াবিশেষ্য পদের সঙ্গে ক্রিয়াবিশেষ্য পদের যোগে গঠিত দ্বন্দ্ব: দেখা-শোনা, লেখা-পড়া ইত্যাদি।

(চ) ক্রিয়াবিশেষণ পদের সঙ্গে ক্রিয়াবিশেষণ পদের যোগে গঠিত দ্বন্দ্ব: ধীরে-সুস্থে, কলে-কৌশলে ইত্যাদি।

(ছ) সংখ্যাবাচক পদের সঙ্গে সংখ্যাবাচক পদের যোগে গঠিত দ্বন্দ্ব: সাত-পাঁচ, নয়- ছয়, সাত-সতের ইত্যাদি।

কর্মধারয় সমাসঃ বৈয়াকরণগণ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কর্মধারয় সমাসের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। বামনদেব চক্রবর্তীর মতে কর্মধারয় সমাস পাঁচ প্রকার; যেমন– (১) সাধারণ কর্মধারয়, (২) মধ্যপদলোপী কর্মধারয়, (৩) উপমান কর্মধারয়, (৪) উপমিত কর্মধারয় ও (৫) রূপক কর্মধারয়।[৯৬] অলিভা দাক্ষী, ড. শাহজাহান মনির, ড. মাহবুবুল হক এবং অশোক মুখোপাধ্যায় কর্মধারয় সমাসের অনুরূপ পাঁচটি শ্রেণী উল্লেখ করেছেন।[৯৭] ঋষিদাসের মতে কর্মধারয় সমাস প্রধানত তিন প্রকার; যেমন – (১) সাধারণ কর্মধারয়, (২) মধ্যপদলোপী কর্মধারয় ও (৩) উপমা-মূলক কর্মধারয়। উপমা-মূলক কর্মধারয় আবার তিনটি ভাগে বিভক্ত; যেমন – (ক) উপমান কর্মধারয়, (খ) উপমিত কর্মধারয় ও (গ) রূপক কর্মধারয়।[৯৮] ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের মতে কর্মধারয় সমাস কয়েক প্রকারের হয়ে থাকে। এগুলোকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়; যেমন – (১) সাধারণ কর্মধারয় ও (২) বিশিষ্ট কর্মধারয়। সাধারণ কর্মধারয় সমাস তিন শ্রেণীর হয়ে থাকে; যেমন – (ক) বিশেষণ-বিশেষ্যে, (খ) বিশেষণ-বিশেষণে, (গ) বিশেষ্য-বিশেষ্যে গঠিত সমস্ত-পদ। এর মধ্যে বিশেষণ-বিশেষ্যে গঠিত সমস্ত-পদগুলো আবার তিন শ্রেণীর হয়ে থাকে; (অ) বিশেষণের পরনিপাত (অর্থাৎ বিশেষ্য-বিশেষণে গঠিত সমস্তপদ), (আ) বিশেষণরূপে ব্যবহৃত সর্বনাম ও অব্যয় এবং (ই) দ্বিগু সমাস। বিশিষ্ট কর্মধারয় সমাস দুই শ্রেণীর হয়ে থাকে; যেমন – (ক) মধ্যপদলোপী কর্মধারয় ও (খ) উপমা-প্রধান কর্মধারয়। উপমা-প্রধান কর্মধারয় আবার তিন প্রকার; যেমন– (অ) উপমান, (আ) উপমিত ও (ই) রূপক।[৯৯]

উল্লেখ্য যে, অধিকাংশ বৈয়াকরণ কর্মধারয় সমাসের (১) উপমান, (২) উপমিত, (৩) রূপক ও (৪) মধ্যপদলোপী এই চারটি শ্রেণী উল্লেখ করেছেন। আমরা মনে করি, যাঁরা কর্মধারয় সমাসকে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন তাঁদের মতে সাধারণ কর্মধারয় পৃথক কোনো শ্রেণী নয়, কর্মধারয় সমাসই হচ্ছে সাধারণ কর্মধারয়। *সংসদ ব্যাকরণ অভিধান* গ্রন্থেও উক্ত হয়েছে, "কর্মধারয় সমাসকেই সাধারণ কর্মধারয় সমাস বলা হয়।"[১০০] কর্মধারয় সমাসের উপর্যুক্ত শ্রেণীগুলো উদাহরণসহ আলোচনা করা হলো –

(১) **সাধারণ কর্মধারয়ঃ** বিশেষণ-বিশেষ্যে, বিশেষণ-বিশেষণে, বিশেষ্য-বিশেষণে, বিশেষ্য-বিশেষ্যে যে কর্মধারয় সমাস হয় তাকে সাধারণ কর্মধারয় বলে। এই শ্রেণীর কর্মধারয় সমাসে কর্মধারয়ের সাধারণ লক্ষণগুলো বর্তমান থাকে। বামনদেব চক্রবর্তী, জ্যোতিভূষণ চাকী এবং অলিভা দাক্ষী সাধারণ কর্মধারয় সমাসকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন; যেমন– (ক) বিশেষণ-বিশেষ্যে, (খ) বিশেষ্য-বিশেষ্যে এবং (গ) বিশেষণ-বিশেষণে গঠিত কর্মধারয়।[১০১]

(ক) **বিশেষণ-বিশেষ্যে গঠিত কর্মধারয়ঃ** নব যে যৌবন = নবযৌবন। এরূপ – নীলশাড়ি, রাঙাবউ, ভাঙাহাট। কখনো কখনো বিশেষণপদটি উত্তরপদ হয়; যেমন – ভাজা যে চাল = চালভাজা, ভাজা যে বেগুন = বেগুনভাজা ইত্যাদি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পূর্বপদটি বিশেষ্য হওয়া সত্ত্বেও বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হয়; যেমন – মূল যে সুর = মূলসুর, সত্য যে বার্তা = সত্যবার্তা, আঁধার যে ঘর = আঁধারঘর ইত্যাদি।

বিশেষণরূপে ব্যবহৃত সর্বনাম ও অব্যয়ের সঙ্গে বিশেষ্য উত্তরপদের এই শ্রেণীর কর্মধারয় সমাস হয়; যেমন–

(অ) বিশেষণরূপে ব্যবহৃত সর্বনাম পূর্বপদঃ একাল, সেকাল ইত্যাদি।

(আ) বিশেষণরূপে ব্যবহৃত অব্যয় পূর্বপদঃ সুপুরুষ, কুনজর, শাঁশাঁ-আওয়াজ, ফিস্‌ফিস্‌-কথা ইত্যাদি।

পূর্বে বলা হয়েছে যে, দ্বিগু সমাস কর্মধারয় সমাসের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিগু সমাস মূলত বিশেষণ-বিশেষ্য শ্রেণীর কর্মধারয়। কেননা দ্বিগু সমাসের পূর্বপদ হচ্ছে সংখ্যাবাচক বিশেষণ এবং পরপদ হচ্ছে বিশেষ্য; যেমন – ত্রিফলা, সেতার, পঞ্চবটী, ত্রিভুবন ইত্যাদি।

(খ) **বিশেষ্য-বিশেষ্যে গঠিত কর্মধারয়ঃ** 'অভেদ' অর্থে অর্থাৎ একই ব্যক্তি বা বস্তু বোঝাতে দুটো বিশেষ্যপদের যোগে কর্মধারয় সমাস হয়; যেমন – যিনি দেব তিনিই ঋষি = দেবর্ষি। এরূপ– মৌলবীসাহেব, শিবশঙ্কর ইত্যাদি।

দুটো পদের মধ্যে একটি পদ বিশেষণ ভাবাপন্ন হলে উভয় পদই বিশেষ্য হতে পারে, অর্থাৎ এই শ্রেণীর কর্মধারয় সমাসে কখনো কখনো বিশেষ্য পূর্বপদটি বিশেষণ ভাবাপন্ন হয়; যেমন– বৌ যে দিদি = বৌদিদি, এখানে পূর্বপদ 'বৌ' আপাতদৃষ্টিতে বিশেষ্য হলেও 'বৌরূপী' এই অর্থে পরপদ 'দিদি'র বিশেষণের মতো ব্যবহৃত হয়েছে। ছেলে যে মানুষ = ছেলেমানুষ, এখানেও পূর্বপদ 'ছেলে' 'অপ্রাপ্তবয়স্ক' অর্থে পরপদ 'মানুষে'র বিশেষণের মতো ব্যবহৃত হয়েছে।

(গ) **বিশেষণ-বিশেষণে গঠিত কর্মধারয়ঃ** এই শ্রেণীর কর্মধারয় সমাস কয়েকটি অর্থে হয়ে থাকে; যেমন –

(অ) অভিন্ন অর্থে অর্থাৎ দুটি গুণ একসঙ্গে একই ব্যক্তি বা বস্তুতে বিদ্যমান অর্থে দুটো বিশেষণ পদের যোগে কর্মধারয় সমাস হয়; যেমন– যা সাদা তাই কালো = সাদাকালো। এরূপ – হৃষ্টপুষ্ট, অম্লমধুর, মোটাতাজা ইত্যাদি।

(আ) পৌর্বাপর্য অর্থে অর্থাৎ দুটো কাজের মধ্যে একটি আগে এবং অপরটি পরে করা বোঝালে দুটো কৃদন্ত বিশেষণ পদের যোগে কর্মধারয় সমাস হয়; যেমন– আগে ধোয়া পরে মোছা = ধোয়ামোছা, আগে ঘষা পরে মাজা = ঘষামাজা ইত্যাদি।

ধোয়ামোছা, ঘষামাজা প্রভৃতি পৌর্বাপর্য অর্থে গঠিত কর্মধারয় সমাসবদ্ধ পদে অর্থভেদে দ্বন্দ্ব সমাসও হয়; যেমন – ধোয়া ও মোছা = ধোয়ামোছা, ঘষা ও মাজা = ঘষামাজা ইত্যাদি। এখানে পৌর্বাপর্য না বুঝিয়ে দুটো ক্রিয়ার মিলন বোঝাচ্ছে অর্থাৎ উভয় পদের অর্থ-প্রাধান্য প্রতীয়মান হচ্ছে।

(ই) বিশেষণের বিশেষণরূপে ব্যবহার হওয়া অর্থেও এই শ্রেণীর কর্মধারয় সমাস হয়; যেমন– আধ খানাই ফুটা = আধ-ফুটা > আধফোটা, টাট্‌কা যে ভাজা = টাট্‌কা-ভাজা ইত্যাদি।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় উপর্যুক্ত ত্রিবিধ সাধারণ কর্মধারয় সমাসকে নিম্নোক্তরূপে সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন;[১০২] যেমন –

(ক) বিশেষণ-পূর্বপদ: এই শ্রেণীর কর্মধারয় সমাস পূর্বোক্ত বিশেষণ-বিশেষ্যে গঠিত কর্মধারয়।

(খ) বিশেষণোত্তরপদ: এই শ্রেণীর কর্মধারয় সমাস পূর্বোক্ত বিশেষ্য-বিশেষণে গঠিত কর্মধারয়।

(গ) বিশেষণোভয়পদ: এই শ্রেণীর কর্মধারয় সমাস পূর্বোক্ত বিশেষণ-বিশেষণে গঠিত কর্মধারয়।

(ঘ) বিশেষ্যোভয়পদ: এই শ্রেণীর কর্মধারয় সমাস পূর্বোক্ত বিশেষ্য-বিশেষ্যে গঠিত কর্মধারয়।

(ঙ) অবধারণ-পূর্বপদ: "যে কর্মধারয়-সমাসে প্রথম পদটীর অর্থের সম্বন্ধে অবধারণা অর্থাৎ অর্থের প্রতি বিশেষ ঝোঁক দেওয়া হয়, তাহাকে 'অবধারণ-পূর্বপদ-কর্মধারয়' বলা হয়।" যেমন – কালসাপ, বিদ্যাসর্বস্ব, কালকূট ইত্যাদি।

(চ) সর্বনাম-, অব্যয়-, উপসর্গ- ও গতি-দ্বারা, এবং সংখ্যা-বাচক শব্দ-দ্বারা বিশেষিত সমস্ত-পদ, কর্মধারয়-শ্রেণীতে পড়ে; "এখন, তখন, সেজন, বিভুঁই, কুনজর, সুনজর; বেয়ারাম (= বে+আরাম), গর-হাজির; বে-সুর, বে-নাম; দু-জন, দু-শ, দু-তোলা, তে-তালা, চৌ-তালা" ইত্যাদি। (তৎসম শব্দ) – "অনিন্দ্য, অসহ্য, অকর্ম, অদৃষ্ট, সুজাত, দুশ্চরিত, স্বয়ংকৃত, অলংকৃত, বিদেশ, সপ্তর্ষি, একোনবিংশতি, কদাচার, কাপুরুষ, জাগ্রৎস্বপ্ন, জীবন্মৃত" ইত্যাদি।

(ছ) কতকগুলি কর্মধারয়-সমাসে পূর্বনিপাত হয়, অর্থাৎ যে পদের পরে বসা উচিত, সে পদ আগে বসে; যেমন – সিদ্ধ যে আলু = আলুসিদ্ধ। এরূপ – নরাধম, তেল-পড়া, চা-গরম, কচুপোড়া, মাছভাজা ইত্যাদি।

(২) **উপমামূলক কর্মধারয়ঃ** দুই বস্তুর পারস্পরিক তুলনায় বা উপমায়ও কর্মধারয় সমাস হয়; এরূপ কর্মধারয় সমাসকে উপমামূলক কর্মধারয় সমাস বলে। ঋষিদাস বলেছেন, "যে কর্মধারয় সমাসে, দুইটি অসম জাতীয় বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে উপমা বা তুলনার মাধ্যমে সাদৃশ্য কল্পনা করা হয়, তাহাকে উপমামূলক কর্মধারয় বলে।"[১০৩] ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক উপমামূলক কর্মধারয় সমাসকে উপমা-প্রধান কর্মধারয় বলেছেন (পূর্বে উল্লিখিত)। উপমার চারটি অঙ্গঃ (ক) উপমান, (খ) উপমেয় (বা উপমিত), (গ) সাধারণ ধর্ম অথবা সাধর্ম্য কিংবা সামন্য ধর্ম ও (ঘ) তুলনাবচক বা সাদৃশ্যবাচক শব্দ। যার সঙ্গে বা যা দিয়ে তুলনা করা হয় তা উপমান, যার তুলনা করা হয় তা উপমেয় (বা উপমিত), উপমান বা উপমেয়ের মধ্যে যে সাধারণ ধর্ম (গুণ বা প্রকৃতি) বর্তমান থাকে তা সাধারণ ধর্ম এবং উপমান বা উপমেয়ের মধ্যে তুলনা বোঝাতে ন্যায়, মতো প্রভৃতি যেসব শব্দ ব্যবহৃত হয় সেগুলো তুলনাবাচক শব্দ।

পূর্বে বলা হয়েছে যে, উপমামূলক কর্মধারয় সমাস তিন প্রকার; যেমন – (অ) উপমান কর্মধারয়, (আ) উপমিত কর্মধারয়, (ই) রূপক কর্মধারয়।

(অ) উপমান কর্মধারয়ঃ উপমানবাচক বিশেষ্য পদের সঙ্গে সাধারণ ধর্মবাচক বিশেষণ পদের কর্মধারয় সমাসকে উপমান কর্মধারয় সমাস বলে। উপমান কর্মধারয় সমাসে উপমানবাচক বিশেষ্য পদটি পূর্বপদ, সাধর্ম্যবাচক বিশেষণ পদটি উত্তরপদ হয় এবং সাধর্ম্যবাচক পরপদের অর্থের প্রাধান্য বোঝায়। আর সমস্তপদটি বিশেষণ হয়। উপমান কর্মধারয় সমাসের ব্যাসবাক্যেও উপমানবাচক বিশেষ্য পদটি প্রথমে, তার পরে তুলনাবাচক শব্দ এবং শেষে থাকে সাধারণ ধর্মবাচক পদ। যেমন – কাজলের মতো কালো = কাজলকালো, এখানে পূর্বপদ 'কাজল' উপমানবাচক বিশেষ্য, পরপদ 'কালো' সাধারণ ধর্মবাচক বিশেষণ এবং পরপদ 'কালো'র অর্থই প্রধান। অতএব 'কাজলকালো' পদে উপমান কর্মধারয় সমাস হয়েছে। এরূপ – ইস্পাতের মতো কঠিন = ইস্পাতকঠিন, সিঁদুরের মতো রাঙা = সিঁদুররাঙা ইত্যাদি।

(আ) উপমিত কর্মধারয়ঃ উপমেয় পদের সঙ্গে উপমান পদের যে সমাস হয় তাকে উপমিত কর্মধারয় সমাস বলে। উপমিত কর্মধারয় সমাসে পূর্বপদ ও পরপদ উভয়ই বিশেষ্য এবং সমস্তপদটিও বিশেষ্য। এ সমাসে উপমেয় পদের অর্থের প্রাধান্য বোঝায় এবং উপমেয় পদটি সাধারণত পূর্বে বসে। ব্যাসবাক্যেও সাধারণত উপমেয় পদটি প্রথমে, তৎপরে উপমান এবং সর্বশেষে তুলনাবাচক শব্দটি বসে। আর সাধারণ ধর্মের উল্লেখ করা হয় না, অর্থাৎ উপমিত কর্মধারয় সমাসে সাধারণ ধর্মটি সর্বত্রই কল্পনা সাপেক্ষ। যেমন – কথা অমৃতের তুল্য = কথামৃত, কর পল্লবের ন্যায় = করপল্লব ইত্যাদি।

উপমেয় কর্মধারয় সমাসে উপমেয় পদটি অনেক সময় পরে বসে। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বলেছেন, "খাঁটি বাংলায় উপমান-বাচক পদ উপমেয় পদের আগে বসে এবং উপমেয় পদ উপমানের সাদৃশ্য বুঝায়।"[১০৪] যেমন – আলু শাঁখের ন্যায় = শাঁখ-আলু, সন্দেশ আমের মতো = আমসন্দেশ। এরূপ – চাঁদবদন, খড়মপা, ফুলবাতাসা ইত্যাদি।

তৎসম শব্দের ক্ষেত্রেও কখনো কখনো উপমেয় পদটি পরে বসে; যেমন – অন্ন সুধার মতো = সুধান্ন, বেদী পদ্মের ন্যায় = পদ্মবেদী ইত্যাদি।

উপমিত কর্মধারয় সমাসে ক্রিয়াপদটি উপমেয়ের অনুগামী হয়; যেমন– কোন্ **পুরুষসিংহ** দুর্বল জাতির বুকে সাহস সঞ্চার করবেন? এখানে ক্রিয়াপদ 'সঞ্চার করবেন' উপমেয় 'পুরুষ'-এর অনুগামী। কেননা সিংহের ন্যায় সাহসী বা শক্তিশালী পুরুষই জাতিকে আশান্বিত করে থাকেন।

(ই) রূপক কর্মধারয়: উপমেয় ও উপমানের অভেদ বোঝাতে উপমেয়বাচক পদের সঙ্গে উপমানবাচক পদের যে সমাস হয় তাকে রূপক কর্মধারয় সমাস বলে। রূপক কর্মধারয় সমাসে উপমেয় পদ পূর্বে বসে এবং উপমান পদ পরে বসে। আর সাধারণ ধর্মবাচক পদের উল্লেখ থাকে না। উপমেয় ও উপমানের মধ্যে অভেদ কল্পনা পরিস্ফুট করতে ব্যাসবাক্যে উপমেয় পদের সঙ্গে 'রূপ' শব্দটি যোগ করতে হয়। এই সমাসে পূর্বপদ ও পরপদ উভয়ই বিশেষ্য এবং সমস্তপদও বিশেষ্য। যেমন– জ্ঞানরূপ আলোক = জ্ঞানালোক। এখানে 'জ্ঞানই আলো হয়ে মনের অন্ধকার দূর করছে বা করে' এমন অর্থ প্রকাশিত হচ্ছে। পূর্বপদ 'জ্ঞান' এবং পরপদ 'আলোক' উভয়ই বিশেষ্য এবং 'জ্ঞানালোক' সমস্তপদটিও বিশেষ্য। সুতরাং এখানে রূপক কর্মধারয় সমাস হয়েছে। এরূপ – মনরূপ মাঝি = মনমাঝি, প্রেমরূপ ডোর = প্রেমডোর ইত্যাদি।

রূপক কর্মধারয়ে উপমানের প্রাধান্য বোঝায় এবং ক্রিয়াপদ উপমানের অনুগামী হয়। যেমন– জীবনতরী ঢেউয়ে নাচে। এখানে উপমান 'তরী' ক্রিয়াপদ 'নাচে'র অনুগামী, কেননা ঢেউয়ে তরীর পক্ষেই নাচা সম্ভব।

(২) মধ্যপদলোপী কর্মধারয়: কর্মধারয় সমাসে অনেক ক্ষেত্রে ব্যাসবাক্যের মধ্যস্থিত পদ লোপ পায়। এরূপ কর্মধারয় সমাসকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস বলে। জ্যোতিভূষণ চাকী বলেছেন, "যে কর্মধারয় সমাসে ব্যাসবাক্যের ব্যাখ্যামূলক পদ বা পদগুচ্ছ লুপ্ত হয় তাকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় বলে।"[১০৫] যেমন– দুধ মেশানো সাগু = দুধসাগু, হাতে চালানো পাখা = হাতপাখা ইত্যাদি।

মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাসে পূর্বপদ ও পরপদ উভয়ই সাধারণত বিশেষ্য। তবে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে উভয় পদ সাধারণত বিশেষ্য হলেও পূর্বপদ অর্থের দিক

থেকে উত্তরপদের বিশেষণ-স্থানীয় হয়।[১০৬] মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস কর্মধারয় সমাসের উপবিভাগ এবং মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস বহুব্রীহি সমাসের উপবিভাগ, কিন্তু ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মধ্যপদলোপী কর্মধারয় বা মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি না বলে কেবল মধ্যপদলোপী সমাস বলেছেন। তিনি বলেন, "সমাস বাক্যের মধ্যপদ লোপ হইয়া সমাস হইলে তাহাকে মধ্যপদলোপী সমাস বলে।"[১০৭] আমাদের মতে, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্কর্তৃক উক্ত 'মধ্যপদলোপী সমাস' পৃথক কোনো সমাস নয়। কর্মধারয় ও বহুব্রীহি সমাসের ব্যাসবাক্যের মধ্যস্থিত পদ লোপ পেয়ে সমাস হলে তা মধ্যপদলোপী সমাস নামে অভিহিত হতে পারে। তবে অধিকাংশ বৈয়াকরণ কেবল মধ্যপদলোপী সমাস না বলে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় বা মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি বলেছেন। ব্যাসবাক্যের মধ্যস্থিত পদের লোপে কর্মধারয় সমাস হলে তা মধ্যপদলোপী কর্মধারয়, আর বহুব্রীহি সমাস হলে তা মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি নামে অভিহিত হয়। তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের বিভক্তি যেমন লোপ পায়, বিভক্তিস্থানীয় অনুসর্গগুলোও সেভাবে লোপ পায়। কিন্তু মধ্যপদলোপী কর্মধারয় ও মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাসে ব্যাসবাক্যের মধ্যস্থিত এক বা একাধিক পদ লোপ পায়। সুতরাং ব্যাসবাক্যের কোনো একটি অংশ লোপ পেলেই সমাসবদ্ধ পদটিকে মধ্যপদলোপী সমাস বলা সঙ্গত নয়। লুপ্ত অংশটি বিভক্তিস্থানীয় অনুসর্গ, না ব্যাসবাক্যের অন্তর্গত কোনো পদ, তা ভালো করে লক্ষ করা উচিত।

বহুব্রীহি সমাসঃ বহুব্রীহি সমাসের শ্রেণীবিভাগ বিষয়ে বৈয়াকরণদের মধ্যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য বহুব্রীহি সমাসের ৫টি শ্রেণী উল্লেখ করেছেন; যেমন– (১) ব্যধিকরণ-বহুব্রীহি, (২) সমানাধিকরণ-বহুব্রীহি, (৩) ব্যতিহার-বহুব্রীহি, (৪) মধ্যপদলোপী-বহুব্রীহি এবং (৫) অলুক্-বহুব্রীহি।[১০৮] সংসদ ব্যাকরণ অভিধান গ্রন্থে বহুব্রীহি সমাসের আটটি শ্রেণী উল্লেখ করা হয়েছে; যেমন – (১) ব্যধিকরণ বহুব্রীহি, (২) সমানাধিকরণ বহুব্রীহি, (৩) ব্যতিহার বহুব্রীহি, (৪) মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি, (৫) নঞর্থক বহুব্রীহি, (৬) সহার্থক বহুব্রীহি, (৭) সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি এবং (৮) অলুক বহুব্রীহি ।[১০৯] কিন্তু *বাংলা ভাষাবিজ্ঞান অভিধান* গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, বহুব্রীহি সমাস ছয় প্রকার; যেমন– (১) সমানাধিকরণ বহুব্রীহি, (২) ব্যধিকরণ বহুব্রীহি, (৩) মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি, (৪) নঞর্থক বহুব্রীহি, (৫) ব্যতিহার বহুব্রীহি, এবং (৬) সহার্থক বহুব্রীহি।[১১০] জ্যোতিভূষণ চাকী নয় প্রকার বহুব্রীহি সমাস উল্লেখ করেছেন; যেমন – (১) সমানাধিকরণ বহুব্রীহি, (২) ব্যধিকরণ বহুব্রীহি, (৩) মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি, (৪) উপমাত্মক বহুব্রীহি, (৫) শেষপদলোপী বহুব্রীহি, (৬) নঞ্ বহুব্রীহি বা নঞর্থক বহুব্রীহি, (৭) সহার্থক বহুব্রীহি, (৮) ব্যতিহার বহুব্রীহি এবং (৯) অলুক বহুব্রীহি।[১১১] ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের মতে বহুব্রীহি সমাস বহু প্রকারের হয়ে থাকে তবে, (১) সমানাধিকরণ-বহুব্রীহি, (২) ব্যধিকরণ-বহুব্রীহি,

(৩) ব্যতিহার-বহুব্রীহি, (৪) মধ্যপদলোপী-বহুব্রীহি, (৫) উপমা-প্রধান-বহুব্রীহি, (৬) প্রত্যয়ান্ত-বহুব্রীহি, (৭) দ্বিগু-বহুব্রীহি এই কয়টি বিভাগ প্রধান ।[১১২] মাহবুবুল আলমের মতে বহুব্রীহি সমাস নানারকম হতে পারে; যেমন– (১) সমানাধিকরণ বহুব্রীহি, (২) ব্যধিকরণ বহুব্রীহি, (৩) মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি, (৪) অন্ত্যপদলোপী বহুব্রীহি, (৫) ব্যতিহার বহুব্রীহি, (৬) নঞর্থক বহুব্রীহি, (৭) সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি, (৮) অলুক বহুব্রীহি, (৯) সহার্থক বহুব্রীহি।[১১৩] ড. মাহবুবুল হকের মতে বহুব্রীহি সমাসের কয়েকটি শ্রেণী রয়েছে; যেমন – (১) সাধারণ বহুব্রীহি, (২) ব্যধিকরণ বহুব্রীহি, (৩) ব্যতিহার বহুব্রীহি, (৪) মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি, (৫) নঞর্থক বহুব্রীহি, (৬) সহার্থক বহুব্রীহি, (৭) সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি, (৮) অলুক বহুব্রীহি ।[১১৪] অজিতকুমার গুহ ও আনিসুজ্জামানের মতে বহুব্রীহি সমাস বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে; যেমন– (১) সমানাধিকরণ বহুব্রীহি, (২) ব্যধিকরণ বহুব্রীহি, (৩) ব্যতিহার বহুব্রীহি, (৪) মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি, (৫) নঞ বহুব্রীহি, (৬) উপমান বহুব্রীহি, (৭) সহার্থক বহুব্রীহি, (৮) সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি, (৯) অলুক বহুব্রীহি।[১১৫] সুকুমার সেনের মতে বাংলা তদ্ভব বহুব্রীহি সমাস দুই প্রকার; যেমন – (১) সমানাধিকরণ বহুব্রীহি ও (২) ব্যধিকরণ বহুব্রীহি।[১১৬] নিম্নে বহুব্রীহি সমাসের উপর্যুক্ত প্রত্যেকটি শ্রেণী উদাহরণসহ আলোচিত হলো–

(১) **সমানাধিকরণ বহুব্রীহি:** যে বহুব্রীহি সমাসে সমস্যমান পদদ্বয় সম-বিভক্তিক (একই বিভক্তিযুক্ত) অর্থাৎ বিশেষ্য-বিশেষণ ভাবাপন্ন তাকে সমানাধিকরণ বহুব্রীহি বলে। এ সমাসে বিশেষণ পদটি সাধারণত পূর্বপদ হয়; যেমন – নীল অম্বর যার = নীলাম্বর। এখানে পূর্বপদ 'নীল' বিশেষণ এবং উত্তরপদ 'অম্বর' বিশেষ্য, আর উভয় পদই শূন্য বিভক্তিযুক্ত। সুতরাং 'নীলাম্বর' পদটি সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাসনিষ্পন্ন। এরূপ – বদ রাগ যার = বদরাগী, বহু মুখ যার = বহুমুখী, নীল কণ্ঠ যার = নীলকণ্ঠ ইত্যাদি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষণ পদটি পরপদ হয়; যেমন – মুখ পোড়া যার = মুখপোড়া। এরূপ – পেটমোটা, মনমরা, বুকফাটা, গালভরা ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে, দুটো বিশেষ্য পদের যোগেও সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস হয়; যেমন– নদী মাতা যার = নদীমাতৃক, শশী ভূষণ যার = শশিভূষণ ইত্যাদি ।

ড. মাহবুবুল হকের মতে এরূপ বহুব্রীহি হচ্ছে সাধারণ বহুব্রীহি। তিনি বলেছেন, "বহুব্রীহি সমাসে পূর্বপদ ও পরপদ বিশেষণ-বিশেষ্য কিংবা বিশেষ্য-বিশেষণ ভাবাপন্ন হলে তাকে **সাধারণ বহুব্রীহি** বলা চলে। এই সমাস **সমানাধিকরণ সমাস** নামেও পরিচিত।"[১১৭]

(২) **ব্যধিকরণ বহুব্রীহি:** ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তিযুক্ত দুটো বিশেষ্য পদের যোগে যে বহুব্রীহি সমাস হয় তাকে ব্যধিকরণ বহুব্রীহি বলে। এই সমাসের পূর্বপদটি শূন্যবিভক্তিযুক্ত এবং উত্তরপদটি অধিকরণের এ বা তে বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন– বীণা পাণিতে যার = বীণাপাণি। এখানে ব্যাসবাক্যস্থিত 'বীণা' এই পদে শূন্য বিভক্তি যুক্ত এবং 'পাণিতে' এই পদে সপ্তমী বিভক্তি

যুক্ত এবং উভয় পদই বিশেষ্য। অতএব 'বীণাপাণি' পদটি ব্যধিকরণ বহুব্রীহি সমাসনিষ্পন্ন। এরূপ – পাপে মতি যার = পাপমতি, মধু কণ্ঠে যার = মধুকণ্ঠ ইত্যাদি।

(৩) **মধ্যপদলোপী বহুব্রীহিঃ** ব্যাসবাক্যের মধ্যস্থিত এক বা একাধিক পদ লোপ পেয়ে যে বহুব্রীহি সমাস হয় তাকে মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি বলে। যেমন – গরুড় অঙ্কিত ধ্বজা যার = গরুড়ধ্বজ, রণের দিকে মুখ যার = রণমুখো ইত্যাদি (পূর্বেও উল্লিখিত)।

(৪) **উপমাত্মক বহুব্রীহি বা উপমা-প্রধান বহুব্রীহিঃ** মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাসে অধিকাংশ স্থলে উপমানের সঙ্গে উপমেয়ের সমাস হয় বলে তথা ব্যাখ্যামূলক উপমা পদ লোপ পায় বলে একে উপমাত্মক বহুব্রীহিও বলে। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের মতে এরূপ বহুব্রীহি হচ্ছে উপমা-প্রধান-বহুব্রীহি।[১১৮] কিন্তু অজিতকুমার গুহ ও আনিসুজ্জামনের মতে এরূপ বহুব্রীহি হচ্ছে উপমান বহুব্রীহি।[১১৯] বামনদেব চক্রবর্তীর মতে এরূপ সমাসের ব্যাসবাক্যটি মাঝে মাঝে ব্যাখ্যামূলক হয় বলে একে ব্যাখ্যামূলক বহুব্রীহিও বলে।[১২০] যেমন– গজের মতো আনন (মুখ) যার = গজানন, হাঁড়ির মতো মুখ যার = হাঁড়িমুখো, মৃগের মতো নয়ন যার = মৃগনয়না ইত্যাদি।

(৫) **অন্ত্যপদলোপী (বা শেষপদলোপী) বহুব্রীহিঃ** ব্যাসবাক্যের শেষপদ লোপ পেয়ে যে বহুব্রীহি সমাস হয় তাকে অন্ত্যপদলোপী (বা শেষপদলোপী) বহুব্রীহি বলে। যেমন– বিশ গজ দৈর্ঘ্য যার = বিশগজি, দশ মণ ওজন যার = দশমণি, গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = গায়েহলুদ ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্যঃ অন্ত্যপদলোপী বা শেষপদলোপী বহুব্রীহিকেও অনেক বৈয়াকরণ মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি হিসেবে গণ্য করেন। জ্যোতিভূষণ চাকী বলেছেন, "শেষপদলোপী বহুব্রীহিও মধ্যপদলোপী নামে চলে।"[১২১]

(৬) **ব্যতিহার বহুব্রীহিঃ** 'ব্যতিহার' অর্থে অর্থাৎ পরস্পর এক জাতীয় ক্রিয়াকরণ বোঝাতে একই বিশেষ্যের দ্বিরুক্তিতে যে বহুব্রীহি সমাস হয় তাকে ব্যতিহার বহুব্রীহি বলে। সাধারণত যুদ্ধবিগ্রহ অর্থে ব্যতিহার বহুব্রীহি হয়। এ সমাসের পূর্বপদের অন্ত্যস্বর সাধারণত 'আ' এবং উত্তরপদের অন্ত্যস্বর সর্বদা 'ই' হয়। যেমন – কেশে কেশে আকর্ষণ করে যে যুদ্ধ = কেশাকেশি, হাতে হাতে যে যুদ্ধ = হাতাহাতি, পরস্পর গালিবর্ষণ করে যে বিবাদ = গালাগালি ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে, শুধু যুদ্ধ নয় অন্যান্য অর্থেও অর্থাৎ পরস্পর প্রীতিবিনিময়, আলাপ-পরিচয়, মিলন প্রভৃতি অর্থেও ব্যতিহার বহুব্রীহি হয়। যেমন – কানে কানে যে কথা = কানাকানি, কোলে কোলে যে মিলন = কোলাকুলি, হেসে হেসে যে আলাপ = হাসাহাসি, চোখে চোখে যে দেখা = চোখাচোখি ইত্যাদি।

এটাও উল্লেখ্য যে, বাংলায় কখনো কখনো পূর্বপদের পরে যুক্ত 'অ' স্বরটি 'ও' স্বরে রূপান্তরিত হয়; যেমন– চুলোচুলি, ঘুষোঘুষি, খুনোখুনি, গুঁতোগুঁতি, মুখোমুখি ইত্যাদি।

সুকুমার সেন ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাসবদ্ধ পদগুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন; যেমন–

"(ক) কর্মব্যতিহার: লাঠালাঠি, চুলোচুলি, গলাগলি, হাতাহাতি ইত্যাদি।

(খ) ক্রিয়াব্যতিহার: মারামারি, টানাটানি, হাসাহাসি, রেষারেষি ইত্যাদি।

(গ) কর্মসাতত্য: কানাকানি, মুখোমুখি, হাতাহাতি ইত্যাদি।

(ঘ) ক্রিয়াসাতত্য: ধরাধরি।

(ঙ) স্থানব্যাপ্তি: পাশাপাশি, পিঠাপিঠি, সোজাসুজি, সরাসরি ইত্যাদি।

(চ) কালব্যাপ্তি: বেলাবেলি, রাতারাতি ইত্যাদি।

(ছ) সাদৃশ্য জাত: কড়াকড়ি, বাড়াবাড়ি, মোটামুটি ইত্যাদি।"[১২২]

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, তাড়াতাড়ি, মোটামুটি, সরাসরি, সোজাসুজি, বেলাবেলি প্রভৃতি শব্দে পারস্পরিক ক্রিয়া বিনিময় বোঝায় না বলে এগুলো বহুব্রীহি সমাসজাত নয়, শুধু শব্দদ্বৈত। জ্যোতিভূষণ চাকী বলেছেন, "রাতারাতি, ঠেলাঠেলি, দৌড়োদৌড়ি, গড়াগড়ি, ইত্যাদিকে ব্যতিহার বহুব্রীহি না বলে, শব্দদ্বৈতের উদাহরণ হিসেবেই দেখা উচিত।"[১২৩] কিন্তু সুকুমার সেন এগুলোর সমাসত্ব স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, "আসলে বাঙ্গালা ব্যতিহার পদগুলির অধিকাংশকে আম্রেড়িত সমাস বলা চলে। ব্যতিহারের সরলতম রূপ দ্বিরুক্ত সমাস।"[১২৪] করুণাসিন্ধু দাসের মতেও ভাষাতাত্ত্বিক পরিভাষায় এগুলো আম্রেড়িতসমাস নামে চিহ্নিত।[১২৫]

(৭) **নঞর্থক বহুব্রীহি বা নঞ্ বহুব্রীহি:** এরূপ সমাস সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

(৮) **সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি বা সংখ্যাপূর্বক বহুব্রীহি (মতান্তরে সংখ্যা-বহুব্রীহি বা দ্বিগু-বহুব্রীহি):** দ্বিগু সমাসের আলোচনা প্রসঙ্গে সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি বা সংখ্যাপূর্বক বহুব্রীহি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

(৯) **সহার্থক বহুব্রীহি:** 'সহ' অর্থবাচক পদের সঙ্গে বিশেষ্য পদের যে বহুব্রীহি সমাস হয় তাকে সহার্থক বহুব্রীহি বলে। যেমন– বান্ধবের সঙ্গে বর্তমান = সবান্ধব, বিনয়ের সঙ্গে বর্তমান = সবিনয়, আদরের সঙ্গে বর্তমান = সাদর ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে, সহার্থক পদের সঙ্গে বিশেষণ পদের সাধারণত সহার্থক বহুব্রীহি হয় না। তবে এ নিয়মের অনেক ব্যতিক্রমও রয়েছে, যা ব্যাকরণ-সম্মত নয়। অর্থাৎ সশঙ্কিত, সলজ্জিত, সঠিক, সানন্দিত, সকৃতজ্ঞ, সকাতর, সচকিত, সকম্পিত প্রভৃতি শব্দ ব্যাকরণসিদ্ধ নয়, অথচ

সাহিত্যে শব্দগুলোর বহু প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। এমন কি দৈনন্দিন ব্যবহারেও শব্দগুলোর প্রয়োগ হয়। যেমন– "রজনী **সকাতরে** বলিল" (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়); "এত **সকাতর** ব্যর্থ চেষ্টা যার" (প্রেমেন্দ্র মিত্র); "তখন অন্নপূর্ণা সশব্দপদক্ষেপে দম্পতিকে **সচকিত** সচেতন করিয়া মহেন্দ্রের শয়নগৃহে উপস্থিত হইলেন" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর); "তাঁর বিক্রমে দেবগণও **সশঙ্কিত"** (মাইকেল মধুসূদন দত্ত); "মজুমদার **সচকিত** হইয়া একটা বিলাতি দিব্য গালিয়া ভাড়াটে গাড়িতে উঠিয়া পড়িল", "স্মিতহাস্যে নাহি চল **সলজ্জিত** বাসরশয্যাতে স্তব্ধ অর্ধরাতে" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর); "দ্বিজদাস **সকৃতজ্ঞ** কণ্ঠে বলিল" (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) ইত্যাদি।

তবে, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে এসমস্ত ক্ষেত্রে পূর্বপদ 'স' বিশেষ, অতিশয় ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বলে বুঝতে হবে, 'সহ' অর্থাৎ সঙ্গে অর্থে নয়। যেমন – অতিশয় কাতর = সকাতর।[১২৬] সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে 'সকাতর' প্রভৃতি পদে কর্মধারয় সমাস হয়েছে বলে ধরতে হবে।

স্মরণীয়: সযত্ন, সানন্দ প্রভৃতি সহার্থক বহুব্রীহি সমাসবদ্ধ পদগুলো সাধারণত কোনো প্রকার পরিবর্তন ছাড়াই বাক্যে ব্যবহৃত হয়; যেমন– "**সযত্ন** ছিল তাঁর পরিচ্ছদ" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দুই বোন); সকলে **সাষ্টাঙ্গ** প্রণাম করতে লাগল। অসময়ে দুর্বাসা **সশিষ্য** এসে উপস্থিত। আকাশবাণীর '**সবিনয়** নিবেদন' অনুষ্ঠানটি বেশ উপভোগ্য ইত্যাদি। তবে কখনো কখনো এগুলো 'এ' বিভক্তিযোগে ব্যবহৃত হয়; যেমন– "সযত্নে সাজিল রানী" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সোনার তরী, বিম্ববতী); "শশাঙ্ক চক্ষু বিস্ফারিত করে **সসম্ভ্রমে** অন্যত্র যাবার উপক্রম করছে" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দুই বোন); "আরামের খুঁটিনাটি নিয়ে ব্যস্ততা ইত্যাদি শ্রেণীর দাম্পত্যিক উৎকণ্ঠা **সবেগে** উপেক্ষা করে শশাঙ্ক সক্কালবেলায় সেকেন্ড্হ্যান্ড্ ফোর্ডগাড়ি নিজে হাঁকিয়ে শিঙে বাজিয়ে বেরিয়ে পড়ে" (দুই বোন); শিশুটি **সানন্দে** খেলছে, তিনি **সবিনয়ে/ সক্রোধে** কথাটি বললেন ইত্যাদি।

(১০) প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি: সমস্তপদের অন্তে প্রত্যয়যুক্ত হয়ে যে বহুব্রীহি সমাস গঠিত হয় তাকে প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি বলে। খাঁটি বাংলা বহুব্রীহি সমাসে আ, ই, ঈ, ইয়া (এ), উয়া (ও) প্রভৃতি প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়। যেমন– এক দিকে চোখ যার= একচোখা (একচোখ + আ), দশগজ দৈর্ঘ্য যার= দশগজি (দশগজ + ই), বদ মেজাজ যার= বদমেজাজী (বদমেজাজ + ঈ), লাল পাড় যার = লালপেড়ে (লালপাড় + ইয়া = লালপাড়িয়া > লালপেড়ে), ঘরের দিকে মুখ যার = ঘরমুখো (ঘরমুখ + উয়া = ঘরমুখুয়া > ঘরমুখো) ইত্যাদি।

(১১) অলুক বহুব্রীহি: বহুব্রীহি সমাসে কখনো কখনো পূর্বপদ বা পরপদের বিভক্তি লোপ পায় না। এরূপ বহুব্রীহিকে অলুক বহুব্রীহি বলে। যেমন–

(ক) পূর্বপদের বিভক্তির অলোপ: হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = হাতেখড়ি, মাথায় পাগড়ি যার = মাথায়পাগড়ি ইত্যাদি।

(খ) উত্তরপদের বিভক্তির অলোপ: কাঁখে কলসি যার = কলসিকাঁখে, হাতে ছাতা যার = ছাতাহাতে ইত্যাদি।

বামনদেব চক্রবর্তীর মতে গায়েহলুদ, হাতেখড়ি প্রভৃতি অলুক বহুব্রীহি সমাসবদ্ধপদকে অনুষ্ঠানবাচক বহুব্রীহিও বলা হয়।[১২৭]

বাংলায় অব্যয়ীভাব সমাসের কোনো উপবিভাগ দেখা যায় না এবং দ্বিগু সমাসের ক্ষেত্রে কেবল সমাহার দ্বিগু এই উপবিভাগটি দেখা যায়। কিন্তু সংস্কৃতে অব্যয়ীভাব ও দ্বিগু সমাসের উপবিভাগ দৃষ্ট হয়।

অব্যয়ীভাবাদি চতুর্বিধ (মতান্তরে ষড়ুবিধ) শ্রেণীবিভাগ ছাড়াও অন্য অন্য দৃষ্টিকোণ থেকেও সমাসের শ্রেণীবিভাগ পরিলক্ষিত হয়। লুক্ ও অলুক্ ভেদে সমাস দুই প্রকার; যেমন – (১) লুক্ সমাস ও (২) অলুক্ সমাস। সমাসে সমস্যমান পদের বিভক্তিলোপ একটি সাধারণ নিয়ম। সমস্তপদ গঠনকালে সাধারণত পূর্বপদের বিভক্তি লোপ পায়; যেমন– দেবকে দত্ত = দেবদত্ত, গঙ্গার জল = গঙ্গাজল, গাছে পাকা = গাছপাকা ইত্যাদি। এখানে প্রথম সমাসে পূর্বপদের 'কে' বিভক্তি, দ্বিতীয় সমাসে পূর্বপদের 'র' বিভক্তি এবং তৃতীয় সমাসে পূর্বপদের 'এ' বিভক্তি লোপ পেয়েছে। পূর্বপদের পরে বিভক্তিস্থানীয় অনুসর্গ থাকলে সমাসে তাও লোপ পায়; যেমন – বিলাত থেকে ফেরত = বিলাতফেরত, আগা থেকে গোড়া = আগাগোড়া ইত্যাদি। এরূপ সমাসের গঠনগত নাম লুক্ সমাস। পক্ষান্তরে, কোনো কোনো সমাসে পূর্বপদের বিভক্তিচিহ্ন লোপ পায় না, বিভক্তিযুক্ত অবস্থায়ই পরপদের সঙ্গে সমাসবদ্ধ হয়; যেমন– কলের গান = কলেরগান, তেলে ভাজা = তেলেভাজা, দুধে ও ভাতে = দুধেভাতে, মুখে মধু যার = মুখেমধু ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে পূর্বপদের বিভক্তিচিহ্ন লোপ পায় নি। এরূপ সমাসের গঠনগত নাম অলুক্ সমাস।

অব্যয়ীভাবাদি সমাসের ন্যায় লুক্ ও অলুক্ কোনো পৃথক সমাস নয়। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও বলেছেন, " 'অলুক্-সমাস' কোনও স্বতন্ত্র সমাস নয়; এটি দ্বন্দ্ব তৎপুরুষ ইদ্যাদি শ্রেণীর অন্তর্গত।"[১২৮] ঋষিদাস বলেছেন, "যে সমাসে সমস্যমান পদের বিভক্তি লুপ্ত হয় না তাহাকে অলুক্ সমাস বলে। ইহা কোন স্বতন্ত্র সমাস নহে – দ্বন্দ্ব, তৎপুরুষ এবং বহুব্রীহি তিন শ্রেণীর সমাসই অলুক্ সমাস হইতে পারে।"[১২৯] যেমন–

১। অলুক্ দ্বন্দ্ব: জলে ও স্থলে = জলেস্থলে, কাগজে ও কলমে = কাগজেকলমে ইত্যাদি।

২। অলুক্ তৎপুরুষ: কলে ছাটা = কলেছাটা, চিনির কল= চিনিরকল, দিনে ডাকাতি = দিনেডাকাতি ইত্যাদি।

৩। অলুক্ বহুব্রীহি: গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = গায়েহলুদ, মুখে মধু যার = মুখেমধু ইত্যাদি।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে অলুক্ সমাসের ক্ষেত্রে অনেক সময়ে সমস্তপদ (অর্থাৎ সমাস) না বললেও চলে, যদিও শব্দদুটি মিলিতপদের ভাব প্রকাশ করে।[১৩০]

বাংলায় অলুক্ অব্যয়ীভাব সমাসের কোনো দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয় না। বাংলায় অলুক্ দ্বন্দ্ব, অলুক্ তৎপুরুষ এবং অলুক্ বহুব্রীহি সমাসের প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে সংস্কৃতে অলুক্ দ্বন্দ্ব সমাসের কোনো দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয় না। সংস্কৃতে অলুক্ তৎপুরুষ ও অলুক্ বহুব্রীহি সমাসের দৃষ্টান্ত সচরাচর পাওয়া যায়। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, পূর্বপদের বিভক্তিচিহ্নের বর্তমানতা, অর্থাৎ অলুক্ সমাসের ব্যবহার বাংলায় সংস্কৃতের চেয়ে অনেক বেশি।

সমাসের বিশ্লেষণমূলক বাক্য হচ্ছে বিগ্রহবাক্য। অধিকাংশ সমাসের সমাসঘটক পদে বিগ্রহ সম্ভব। কিন্তু অনেক সমাসের বিগ্রহবাক্য করা সম্ভব হয় না, অথবা বিগ্রহবাক্য করতে হলে অন্যপদের সাহায্য নিতে হয়। অতএব বিগ্রহবাক্যের দিক থেকেও সমাস দুই প্রকার; যেমন – (১) নিত্যসমাস ও (২) অনিত্যসমাস। নিত্যসমাস আবার দুই প্রকার; যেমন – (ক) অবিগ্রহ নিত্যসমাস ও (খ) অস্বপদবিগ্রহ নিত্যসমাস।

১। (ক) **অবিগ্রহ নিত্যসমাস:** যে সমাসে সমস্যমানপদগুলো নিত্য (সর্বদা) সমাসবদ্ধ থাকে, সমস্তপদকে ভেঙে (বিশ্লেষণ করে) ব্যাসবাক্যে পরিণত করা যায় না তা নিত্যসমাস। যেমন – 'কাঁচকলা' এই সমাসবদ্ধ পদের বিগ্রহবাক্য করা সম্ভব নয়। কেননা 'কাঁচকলা' পদের বিগ্রহবাক্য করা হলে বিবক্ষিত অর্থের ভেদ হয়ে যাবে, অর্থাৎ প্রকৃত অর্থের উপলব্ধি হবে না। যদি 'কাঁচা যে কলা' এরূপ বিগ্রহবাক্য করা হয় তাহলে যে-কোনো কলারই কাঁচা অবস্থা বোঝাতে পারে। কিন্তু 'কাঁচকলা' পদের অর্থ কাঁচা কলা নয়। কাঁচকলা এমন এক ধরনের কলা যা কাঁচা অবস্থায় খাওয়া যায়। এ কলা পাকলেও কাঁচকলা নামেই অভিহিত হয়, পাকাকলা নামে অভিহিত হয় না। অতএব 'কাঁচকলা' পদটি অবিগ্রহ নিত্যসমাস। এরূপ – দাঁড়কাক, ইচ্ছাবসন্ত, কালসাপ, শিয়ালকাঁটা ইত্যাদি।

(খ) **অস্বপদবিগ্রহ নিত্যসমাস:** ন স্বপদ = অস্বপদ, অর্থাৎ যে সমাসের সমাসঘটক পদের দ্বারা বিগ্রহবাক্য করা যায় না, পদান্তরের সাহায্যে বিগ্রহবাক্য করতে হয় তা অস্বপদবিগ্রহ নিত্যসমাস। যেমন– অন্য গ্রাম = গ্রামান্তর। এখানে গ্রাম শব্দের সঙ্গে অন্যার্থক 'অন্তর' শব্দের সমাস হয়েছে। কিন্তু অন্যার্থ যেহেতু 'অন্তর' শব্দের বাচ্যার্থ নয় সেহেতু 'অন্তর' শব্দ দ্বারা বিগ্রহবাক্য সম্ভব নয়, অর্থাৎ 'অন্তর গ্রাম' বা 'গ্রামের অন্তর' এরূপ স্বপদবিগ্রহ সম্ভব নয়, অন্যার্থক 'অন্য' শব্দের সাহায্যে বিগ্রহবাক্য করতে হয়। অতএব 'গ্রামান্তর' পদটি

অস্বপদবিগ্রহ নিত্যসমাস। এরূপ – ভিক্ষার অভাব = দুর্ভিক্ষ, দুগ্ধফেনের তুল্য = দুগ্ধফেননিভ, কেবল দর্শন = দর্শনমাত্র ইত্যাদি।

অব্যয়ীভাবাদিবৎ নিত্যসমাস কোনো স্বতন্ত্র সমাস নয়। অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ প্রভৃতি যে-কোনো সমাসের ব্যাসবাক্য না হলে, অথবা সমাসঘটক পদে ব্যাসবাক্য না হলে তা নিত্যসমাস আখ্যা প্রাপ্ত হয়। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বলেছেন, "নিত্য-সমাস কোন পৃথক সমাস নহে। যে-সমাসে সমস্যমান-পদগুলি নিত্য (সর্বদা) সমাসবদ্ধ থাকে অর্থাৎ সমস্ত-পদকে ভাঙ্গিয়া রীতিমত ব্যাসবাক্যে পরিণত করা যায় না, – অন্যভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে হয়, তাহাই নিত্য-সমাস।"[১৩১] ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেছেন, "নিত্যসমাস কোনও নির্দিষ্ট সমাস নহে। যে কোনও সমাস, যাহার রীতিমত ব্যাসবাক্য নাই, নিত্য সমাস হইতে পারে।"[১৩২] যেমন –

(অ) **অব্যয়ীভাব সমাসঃ** কূলের সমীপে= উপকূল, মিলের অভাব = গরমিল, মূর্তির সদৃশ = প্রতিমূর্তি ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে, বাংলায় অব্যয়ীভাব সমাসনিষ্পন্ন কোনো পদেরই স্বপদে বিগ্রহবাক্য সম্ভব নয়। অব্যয়ীভাব সমাসের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এর সমস্তপদকে ভেঙে ব্যাসবাক্যরূপে দেখানো যায় না, অন্য পদের সাহায্যেই সমস্তপদের অর্থ বোঝানো হয়। অতএব বাংলায় অব্যয়ীভাব সমাসনিষ্পন্ন সকল পদই নিত্যসমাস। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বলেছেন, "যে-সমাসে কোন রীতিমত ব্যাস-বাক্য নাই, অর্থাৎ যে-সমাসে সমস্যমান পদগুলি নিত্য সমাসবদ্ধ থাকে, তাহাই নিত্য-সমাস। অব্যয়ীভাব-সমাসও নিত্য সমাসবদ্ধ থাকে; কেন না, ইহার ব্যাস-বাক্য কখনও নিজের পদ দ্বারা রচিত হইতে পারে না। সুতরাং, অব্যয়ীভাব-সমাস মাত্রই নিত্য-সমাস।"[১৩৩] সংস্কৃতে কিন্তু সকল অব্যয়ীভাব সমাসনিষ্পন্ন পদ নিত্যসমাস নয়।

(আ) **তৎপুরুষ সমাসঃ** নয় কাতর = অকাতর, নয় অভিজ্ঞ = অনভিজ্ঞ, নয় লুনি = আলুনি; ঘর ছেড়েছে যে = ঘরছাড়া; প্রকৃষ্ট ভাব = প্রভাব, শোভন পুরুষ = সুপুরুষ প্রভৃতি তৎপুরুষ সমাসনিষ্পন্ন পদ বিগ্রহবাক্যের দিক থেকে অস্বপদবিগ্রহ নিত্যসমাস।

(ই) **কর্মধারয় সমাসঃ** কাঁচকলা, দাঁড়কাক, কালসাপ প্রভৃতি কর্মধারয় সমাসনিষ্পন্নপদ বিগ্রহবাক্যের দিক থেকে অবিগ্রহ নিত্যসমাস এবং ধোয়ামোছা (আগে ধোয়া পরে মোছা) প্রভৃতি কর্মধারয় সমাসনিষ্পন্ন পদ অস্বপদবিগ্রহ নিত্যসমাস।

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের মতে নিত্যসমাস অব্যয়ীভাব সমাসের একটি শাখা।[১৩৪] কিন্তু বাংলায় সকল অব্যয়ীভাব সমাসনিষ্পন্ন পদই নিত্যসমাস। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক

নিজেও এমত পোষণ করেছেন (পূর্বে উল্লিখিত)। অতএব অব্যয়ীভাব সমাস নিত্যসমাসের শাখা তথা বৃহত্তম অংশ। *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ* গ্রন্থে আবার নিত্যসমাসকে তৎপুরুষ সমাসের একটি শ্রেণী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৩৫] কিন্তু পরবর্তীকালে প্রকাশিত *সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙলা ব্যাকরণ* গ্রন্থে নিত্যসমাসকে কোনো নির্দিষ্ট সমাসের অন্তর্গত সমাস হিসেবে উল্লেখ না করে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৩৬]

২। **অনিত্যসমাস:** নয় নিত্য = অনিত্য, অর্থাৎ যে সমাসের সমাসঘটক পদে বিগ্রহ সম্ভব এবং বিগ্রহবাক্যের দ্বারা সমাসবদ্ধ পদের অর্থ বোঝা যায় তা অনিত্যসমাস। যেমন – নদীর তট = নদীতট, আয় ও ব্যয় = আয়-ব্যয় ইত্যাদি।

অন্য আর একটি দিক থেকেও বাংলা সমাসের শ্রেণীবিভাগ হতে পারে, আর তা হলো দুই পদের সমাস এবং দুয়ের অধিক পদের সমাস। তবে বাংলায় সাধারণত দুয়ের অধিক পদের সমন্বয়ে সমাস হয় না। কখনো কখনো দুই বা ততোধিক সমাসবদ্ধ শব্দ মিলিত হয়ে বহুপদময় সমাস গঠিত হয়। যেমন – নয় জ্ঞাত = অজ্ঞাত (নঞ্তৎপুরুষ), কুল ও শীল = কুলশীল (দ্বন্দ্ব)। এবার 'অজ্ঞাত' ও 'কুলশীল' এই সমাসবদ্ধ পদদুটির মিলনে গঠিত বহুপদময় সমাস: অজ্ঞাত কুলশীল যার = অজ্ঞাতকুলশীল (বহুব্রীহি)। আবার কখনো কখনো প্রথমে একটি সমাস হয় এবং পরে ঐ সমাসবদ্ধ পদের সঙ্গে অন্য পদের সমন্বয়ে অন্য আর একটি সমাস হয়। এভাবে দুই বা ততোধিক ধাপে বহুপদময় সমাস হয়ে থাকে। যেমন–

প্রথম ধাপ: নব যে পল্লব = নবপল্লব (কর্মধারয়);

দ্বিতীয় ধাপ: নবপল্লবের শোভা = নবপল্লবশোভা (ষষ্ঠী তৎপুরুষ, মতান্তরে সম্বন্ধ তৎপুরুষ)।

প্রথম ধাপ: নব যে দূর্বা = নবদূর্বা (কর্মধারয়);

দ্বিতীয় ধাপ: নবদূর্বার দল = নবদূর্বাদল (ষষ্ঠী তৎপুরুষ, মতান্তরে সম্বন্ধ তৎপুরুষ);

তৃতীয় ধাপ: নবদূর্বাদলের মতো শ্যাম = নবদূর্বাদলশ্যাম (উপমান কর্মধারয়)।

দুয়ের অধিক পদের সমাসে একাধিক সমাসের নিয়ম কাজ করে। এ কারণে দুই বা ততোধিক সমাসের মিশ্রণে গঠিত বহুপদময় সমাসকে মিশ্র সমাস বলে। উক্ত হয়েছে– "অনেক ক্ষেত্রে বড় বড় পদে একাধিক সমাস নিষ্পন্ন পদ যুক্ত থাকে, তখন সেই পদগুলির দ্বারা নিষ্পন্ন সমাসকে মিশ্র সমাস বলে।"[১৩৭] মিশ্র সমাসকে পদগর্ভ সমাসও বলা হয়। ঋষিদাস বলেছেন, "কখনো কখনো বিভিন্ন জাতীয় সমাসবদ্ধ পদের দ্বারা একটি সুদীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ গঠন করা হয় – ইহাকে মিশ্রসমাস বা পদগর্ভ সমাস বলে।"[১৩৮] কিন্তু অজিত কুমার গুহ ও আনিসুজ্জামান পদগর্ভ সমাসকে পৃথক সমাস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাঁরা

পদগর্ভ সমাস সম্পর্কে বলেছেন, "আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ব্যবহৃত কতিপয় দীর্ঘ সমাসকে অন্য কোন সমাসের অন্তর্ভুক্ত করতে না পারায় কেউ কেউ সেগুলোকে পদগর্ভ সমাস বলে। যেমন – কানে কানে ডাকা। ছায়া ঢাকা পাখি ডাকা।"[১৩৯]

উলেখ্য যে, পূর্বোক্ত বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস কিন্তু মিশ্রসমাস নয়। জ্যোতিভূষণ চাকী বলেছেন, "জীবন যৌবন ধন মান পদবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সমাস না করে পৃথক পৃথক ভাবে পদগুলি লিখেছেন। সমাস করলে তা দ্বন্দ্ব সমাসের মধ্যে পড়ত, মিশ্রসমাস নয়; হীরামুক্তামাণিক্যও মিশ্রসমাস নয়, – এখানেও শুধু দ্বন্দ্ব।"[১৪০]

স্মরণীয় যে, অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ প্রভৃতি সমাসের ন্যায় মিশ্রসমাস কোনো স্বতন্ত্র সমাস নয়, এটা বিভিন্ন সমাসের মিশ্রণ। বর্তমানে বাংলা ভাষায় মিশ্রসমাস তথা বহুপদময় সমাসের প্রচলন বা ব্যবহার নেই বললেই চলে। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় মিশ্রসমাস বা বহুপদময় সমাসের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

সমাসের উপর্যুক্ত শ্রেণীগুলো ছাড়াও বাংলায় আরো কিছু শ্রেণী পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

(১) **অসংলগ্ন সমাস:** দুই বা ততোধিক পদকে একপদে পরিণত করতে হলে সমস্যমান পদগুলোকে সংলগ্ন বা যুক্ত করে লেখা উচিত, অর্থাৎ সমাসবদ্ধ পদটিকে একমাত্রায় লেখাই শিষ্টরীতি। আর সমাসে সমস্যমান পদগুলোকে সংলগ্ন বা যুক্ত করে একপদরূপে লেখাও হয়। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বোঝার সুবিধার্থে হাইফেন ব্যবহার করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও পরিলক্ষিত হয়।

বহুপদময় সমাস একপদরূপে লিখলে সমস্তপদটি দীর্ঘ হয়। কখনো কখনো সমাসবদ্ধ পদটির অর্থ বুঝতেও অসুবিধা হয়। এ কারণে সুদীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার বাংলা ভাষায় সর্বদা চলে না। বহুপদময় সমাস বাংলা ভাষার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ এবং বহুপদময় সমাসকে একপদরূপে দেখতে বাঙালি পাঠক অভ্যস্ত নন। তাই অনেক সময় বহুপদময় সমাসের ক্ষেত্রে সমস্যমান পদগুলোকে বা সমস্তপদগুলোকে সংলগ্ন বা যুক্ত করে না লিখে বিচ্ছিন্নভাবে লেখা হয়। অর্থাৎ বহুপদময় সমাসে ব্যবহৃত পদগুলোকে পৃথক পৃথক পদ বা শব্দরূপে লেখা হয়ে থাকে। সংযোগ-চিহ্ন দ্বারা এদের সংযুক্ত করা প্রয়োজনীয় হলেও সম্ভবত দৃষ্টিকটুত্বের জন্যই অধিক সংযোগ-চিহ্ন (হাইফেন) ব্যবহার করা হয় না। আবার কোনো সংস্থা বা সম্মেলনাদির নাম মূলত সমাসবদ্ধ হলেও সমস্যমান পদগুলো বিযুক্তভাবে লেখা হয়। আবার কখনো কখনো অলুক সমাসেও সমস্যমান পদুগলো বিচ্ছিন্ন থাকে। এরূপ বিচ্ছিন্ন পদসমষ্টিকে সমাস বলে মনে হয় না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা সমাসবদ্ধ। এরূপ বিচ্ছিন্নভাবে লিখিত সমাসকে অসংলগ্ন সমাস (বা অযুক্ত সমাস) বলে। উক্ত হয়েছে– "যে সমাসে সমাস নিষ্পন্ন পদগুলি একত্রবদ্ধ না হয়ে বিচ্ছিন্নভাবে লিখিত হয়, তাকে

অসংলগ্ন সমাস বলে।"[১৪১] যেমন – ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, অনুভব বহুমুখী সমবায় সমিতি, প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, ঘোড়ার ডিম ইত্যাদি।

জ্যোতিভূষণ চাকীর মতে আর এক ধরনের অসংলগ্নতাও দেখা যায়। যেমন– যখন বলা হয় 'বাংলা ও হিন্দিভাষী' তখন 'বাংলা' পদটি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, অথচ 'ভাষী' শব্দের পুনরুক্তি এড়ানোই হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য। এসব ক্ষেত্রে প্রথম শব্দের পরে একটি হাইফেন ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন – বাংলা- ও হিন্দিভাষী।[১৪২] এরূপ – "সর্বত্র শব্দ-বিশ্লেষ- বা সংযোগ-চিহ্নের ব্যবহারও কষ্টকর হইয়া উঠে।"[১৪৩] এ ধরনের অসংলগ্নতায় অনেক সময় ব্যাকরণগত সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেমন – 'কল্লোলিনী নদীতট' এরূপ বললে নদীর তট কল্লোলিনী এরূপ বোঝাবে। কেননা এ ক্ষেত্রে কল্লোলিনী শব্দটি বিচ্ছিন্ন হওয়াতে আর নদীতট সমাসবদ্ধ হওয়াতে কল্লোলিনী শব্দটি তটের বিশেষণ হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু তা তো এক্ষেত্রে ঈপ্সিত নয়। এখানে ঈপ্সিত অর্থ হচ্ছে কল্লোলিনী নদীর তট এবং প্রকৃত সমাস হচ্ছে 'কল্লোলিনীনদীতট' ।

(২) **বাক্যাংশ সমাস (বা বাক্যমূলক সমাস):** বাংলায় কখনো কখনো বাক্যের অংশবিশেষও একপদরূপে গৃহীত হয়। এরূপ একপদরূপে গৃহীত সমাসকে বাক্যাংশ সমাস বলে। মুহাঃ মনসূর উর রহমান বলেছেন, "কোন বাক্যের অংশ বিশেষকে একপদরূপে গ্রহণ করে সমাস তৈরি হলে তাকে বাক্যাংশ সমাস বলে।"[১৪৪] পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য বলেছেন, "সম্বোধনপদ ও ক্রিয়াপদের একীকরণে এবং বাক্যের অংশকে একপদরূপে গ্রহণ করে বাঙলায় একধরনের সমাস নিষ্পন্ন হয়ে থাকে, যাদের প্রচলিত কোন সমাসের আওতায় আনা যায় না – এদের 'বাক্যাংশ সমাস' নামে অভিহিত করা চলে।"[১৪৫] উল্লেখ্য যে, সম্বোধনপদ ও ক্রিয়াপদের সমন্বয়ে অথবা শুধু একাধিক সম্বোধনপদে গঠিত সমস্তপদ সাধারণত বাংলায় ব্যক্তিনামরূপেই ব্যবহৃত হয়। বাক্যাংশ সমাস নিম্নোক্তরূপে গঠিত হয় –

(ক) প্রথম পদ অনুজ্ঞা এবং দ্বিতীয় পদ সম্বোধন: রাখহরি, ভজহরি, জয়গোপাল ইত্যাদি।

(খ) প্রথম পদ নিষেধসূচক অব্যয় এবং দ্বিতীয় পদ সম্বোধন: আন্নাকালী (আর-না-কালী)।

(গ) উভয় পদই সম্বোধন: হরেকৃষ্ণ, হরেরাম, রাধেশ্যাম ইত্যাদি।

(ঘ) বিবিধ: যাচ্ছেতাই (যা ইচ্ছা তাই), নাস্তানাবুদ (ন অস্ত ন বুদ), পেছনে-ফেলে-আসা-দিনগুলো, যেমন-তেমন-করে-করা-কাজ, না বলা বাণীর ঘনযামিনীর মাঝে, না-দেখা-ফুলে, জননীর-মুখ-তাকানো হাসিতে ইত্যাদি।

(৩) **ছদ্মবেশী সমাস:** ধ্বনিগত রূপান্তরের ফলে অনেক সমাসবদ্ধ পদকে সমাসবদ্ধ পদ বলে মনে হয় না। যেমন– কর্ম করে যে = কর্মকার > কামার, কুম্ভ করে যে = কুম্ভকার> কুমার/

কুমোর, চর্মের কাজ করে যে= চর্মকার> চামার, আট মাসে জন্মেছে যে= আটমেসে > আটাসে (বা আটাশে)। এরূপ– ভ্রাতৃশ্বশুর > ভাশুর, অগ্রহায়ণ > অঘ্রান, অক্ষবাট > আখড়া, বাসগৃহ > বাসর ইত্যাদি। এসব শব্দ মূলত সমাসবদ্ধ, কিন্তু স্বাভাবিক দৃষ্টিতে তা ধরা যায় না। জ্যোতিভূষণ চাকীর মতে এগুলো ছদ্মবেশী সমাস।[১৪৬] ছদ্মবেশী সমাস সম্পর্কে মুহাঃ মনসূর উর রহমান বলেছেন, "ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তনের ফলে মূল সমাসবদ্ধ পদের পরিবর্তন ঘটলে তাকে ছদ্মবেশী সমাস বলা হয়।" [১৪৭]

(৪) **সুপ্‌সুপা সমাসঃ** সুবন্ত পদের সঙ্গে সুবন্ত পদের এক ধরনের সমাস হয় যেগুলো অব্যয়ীভাবাদি সমাসের মধ্যে পড়ে না, অর্থাৎ অব্যয়ীভাবাদি সমাসের নিয়ম-বহির্ভূত এক ধরনের সমাস প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের রচনায় পরিলক্ষিত হয়। এরূপ সমাস সুপ্‌সুপা (বা সহসুপা) সমাস নামে অভিহিত। জ্যোতিভূষণ চাকী বলেছেন, "যে-সব সমাসকে কোনও শ্রেণীতে ফেলা যায় না সেগুলোকে ওই সহসুপা শব্দের মধ্যে ফেলা হত।"[১৪৮] *সংসদ ব্যাকরণ অভিধান* গ্রন্থে উক্ত হয়েছে, "একটি সুবন্ত পদের সঙ্গে অন্য সুবন্ত পদের সমাসকে বলে সুপ্‌সুপা বা সহসুপা। এরা ঠিক কোনো সমাসের মধ্যেই পড়ে না।"[১৪৯] ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের মতে এই সুপ্‌সুপা সমাস সংস্কৃত। বাংলায় এর কোনো অস্তিত্ব নেই।[১৫০] *সংসদ ব্যাকরণ অভিধান* গ্রন্থেও উক্ত হয়েছে, "সুপ্‌সুপা সংস্কৃত ব্যাকরণের বিষয়।"[১৫১] সংস্কৃতের অনুসরণে বাংলায় তৎসম শব্দের সমাসে সুপ্‌সুপা সমাসবদ্ধ পদ পরিলক্ষিত হয়। তবে বাংলা ব্যাকরণে তা তৎপুরুষ সমাস বলে অভিহিত। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বলেছেন, "সপ্তমী তৎপুরুষের তৎসম শব্দে কখনও কখনও 'পূর্ব' শব্দের পরনিপাত হয়। সংস্কৃতে এইগুলিকে সুপ্‌সুপা-সমাসের অন্তর্গত করা হয়। বাংলায় এইগুলিকে 'অধিকরণ-তৎপুরুষ', বলিলে কোন ক্ষতি হয় না।"[১৫২] যেমন – পূর্বে ভূত = ভূতপূর্ব, পূর্বে শ্রুত = শ্রুতপূর্ব। এরূপ – দৃষ্টপূর্ব, অভূতপূর্ব, অশ্রুতপূর্ব, অদৃষ্টপূর্ব, অভাবিতপূর্ব ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, অন্যান্য বৈয়াকরণের মতেও এগুলো অধিকরণ-তৎপুরুষ (বা সপ্তমী তৎপুরুষ)। অর্ধমৃত, ঘনসন্নিবিষ্ট প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃতে সুপ্‌সুপা বা সহসুপা সমাস বলে চিহ্নিত। বাংলায় অর্ধমৃত (অর্ধরূপে মৃত), ঘনসন্নিবিষ্ট (ঘনভাবে সন্নিবিষ্ট) প্রভৃতি শব্দ দ্বিতীয়া তৎপুরুষ (মতান্তরে কর্ম-তৎপুরুষ) সমাস হিসেবে চিহ্নিত। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সুপ্‌সুপা সমাসকে তৎপুরুষ শ্রেণীর সমাস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, "তৎপুরুষ শ্রেণীর মধ্যে পড়ে এইরূপ আর এক প্রকার সমাস, পাণিনি-প্রমুখ সংস্কৃত বৈয়াকরণগণ-কর্তৃক নির্দিষ্ট হইয়াছে; ইহার নাম সহসুপা বা সুপ্‌সুপা।"[১৫৩]

উপর্যুক্ত শ্রেণীবিভাগসমূহ ছাড়াও অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে সমাসের শ্রেণীবিভাগ পরিলক্ষিত হয়। সুকুমার সেনের মতে 'শব্দার্থ ও ব্যাকরণের দিক দিয়ে তদ্ভব বাংলা সমাস আট প্রকার; যেমন– (১) তৎপুরুষ, (২) কর্মধারয়, (৩) বহুব্রীহি, (৪) ব্যতিহার, (৫) দ্বিগু, (৬) দ্বন্দ্ব,

(৭) অব্যয়ীভাব এবং (৮) ক্রিয়াসমভিব্যাহার (যৌগপদ্য)।'[১৫৪] প্রথম সাতটি শ্রেণী সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। ক্রিয়াসমভিব্যাহার (যৌগপদ্য) হচ্ছে একই সঙ্গে দুটো ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হওয়া অর্থে দুটো ক্রিয়াপদের সমাস; যেমন– ওঠবস, মারধর ইত্যাদি। এগুলো মূলত পূর্বোক্ত দুটো ক্রিয়াপদে গঠিত দ্বন্দ্ব সমাস। সুকুমার সেনও বলেছেন, "এগুলো যদি দেখা-মারা, ওঠা-বসা, মারা-ধরা' হইতে আসিয়া থাকে তবে দ্বন্দ্বসমাস হইবে।"[১৫৫]

বাংলা ভাষায় প্রথম বাংলা ব্যাকরণ *গৌড়ীয় ব্যাকরণে* রাজা রামমোহন রায় সমাসকে চার প্রকারে বিভক্ত করেছেন। তবে তিনি সমাসের অব্যয়ীভাবাদি শ্রেণীবিভাগ না করে সমাসবদ্ধ পদগুলোকে চার প্রকারে সঙ্কলিত করেছেন। তিনি বলেছেন, "অনেক পদের এক পদের ন্যায় রূপ হওয়াকে সমাস কহি, এরূপ পদ গৌড়ীয় ভাষাতে বাহুল্যমতে ব্যবহারে আইসে না। যে সকলের ব্যবহার আছে তাহাকে চারি প্রকারে সঙ্কলন করা যায়।"[১৫৬] যেমন–

(১) **প্রথম প্রকার –** এই প্রকারের সমাসবদ্ধ পদ সম্পর্কে রামমোহন বলেছেন, "প্রথম দুই শব্দের প্রথম শব্দ অভিহিত পদের ন্যায়, আর দ্বিতীয় শব্দ কর্ম্মের ন্যায় হয়",[১৫৭] যেমন– **হাতভাঙা** ব্যক্তি। এখানে 'হাত' অভিহিত পদ এবং 'ভাঙা' কর্ম পদ। এরূপ ক্ষেত্রে কখনো কখনো দ্বিতীয় পদ কর্তাকে এবং প্রথম পদ অধিকরণকে বোঝায়। যেমন– **হাড়কাটা** ছুরি। এখানে 'কাটা' শব্দ কর্মপদের ন্যায় হয়েও ক্রিয়ার কর্তাকে বোঝাচ্ছে এবং 'হাড়' শব্দ অভিহিত পদের ন্যায় হয়েও কর্মকে জানাচ্ছে, অর্থাৎ 'হাড়কে কাটে যে ছুরি' বোঝাচ্ছে। **গাছপাকা** এ স্থলে দ্বিতীয় পদ পাকাক্রিয়ার কর্তাকে নির্দেশ করে এবং প্রথম পদ অভিহিত পদের ন্যায় হয়েও অধিকরণকে জানায়, অর্থাৎ 'গাছে পাকে যে ফল' বোঝায়।[১৫৮]

(২) **দ্বিতীয় প্রকার –** এই প্রকারের সমাসবদ্ধ পদ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "দুইয়ের প্রথম শব্দ অভিহিত পদের ন্যায় হইয়াও সম্বন্ধ কিম্বা অধিকরণের অর্থকে বোঝায়, আর দ্বিতীয় পদ অভিহিত পদের অর্থবোধক হইয়াও একারে ওকারে কিম্বা আকারে পর্য্যবসান হয়",[১৫৯] যেমন– তালপুকুরে (তালগাছ বেষ্টিত পুকুর), কাণতুলসে (কাণে তুলসী যার, অর্থাৎ আপনাকে ধার্মিক জানাবার নিমিত্তে যে কাণে তুলসী দেয়), বানরমুখো (বানরের ন্যায় মুখ), মুখচোরা (মুখেতে চোর, অর্থাৎ সভায় আলাপে অপটু)। কোনো কোনো স্থলে সমাস হয়ে দুই পদের মধ্যে কোনো শব্দ লুপ্ত হয়, যেমন– ঘরপাগলা (ঘরের নিমিত্তে পাগল)। এখানে নিমিত্ত শব্দ লুপ্ত হয়েছে। এরূপ – সোনামোড়া (সোনা দিয়ে মোড়া), বিয়েপাগলা (বিয়ের জন্য পাগল) ইত্যাদি। এরূপ সমাসবদ্ধ পদে স্ত্রীলিঙ্গে ঈকার যুক্ত হয়। যেমন– বানরমুখী, ঘরপাগলী ইত্যাদি।[১৬০]

(৩) **তৃতীয় প্রকার –** এই প্রকারের সমাসবদ্ধ পদ সম্পর্কে রামমোহনের বক্তব্য, "দুইয়ের প্রথম শব্দ বিশেষণ পদ হয়, দ্বিতীয় শব্দ অভিহিত পদ হইয়াও একারে কিম্বা ওকারে

পর্য্যবসান হয়",[১৬১] যেমন – মিষ্টমুখো (মিষ্ট হয়েছে মুখ যার), কাটাচুলে (কাটা চুল যে ব্যক্তির) ইত্যাদি।

(৪) **চতুর্থ প্রকার –** এই প্রকারের সমাসবদ্ধ পদ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "দুই এক জাতীয় শব্দের মিলনের দ্বারা হয়, যাহা পরস্পর ক্রিয়াকে কিম্বা উৎকৃষ্ট ক্রিয়াকে বুঝায়, শেষের পদ ঈকারান্ত হইয়া থাকে",[১৬২] যেমন– মারামারী (পরস্পরকে মারা বোঝায়), দৌড়াদৌড়ী (অতিশয় দ্রুত গমনকে বোঝায়) ইত্যাদি। এরূপ সমাসবদ্ধ পদ দ্বারা পরস্পর ক্রিয়ার নিষ্পত্তি বোঝায়; যেমন– হাতাহাতী, লাঠালাঠী ইত্যাদি।[১৬৩]

রাজা রামমোহন রায়ের মতে এই চার প্রকারের বাইরেও যদি কোনো প্রকার পদ থাকে, যা এই চার প্রকারের মধ্যে গণ্য না হয়, তার অর্থ ও একপদ করার রীতিজ্ঞান এই চার প্রকার নিয়মের জ্ঞান দ্বারা হতে পারে। এই চার প্রকার রীতিজ্ঞান হলে সংস্কৃতে এবং অন্য ভাষায়ও সমাসবদ্ধ পদের তাৎপর্যবোধ হতে পারে। যেমন– চন্দ্রমুখ (চন্দ্রের ন্যায় মুখ যে ব্যক্তির), দুরাত্মা (দুষ্ট আত্মা বা স্বভাব যার), ভূপতি (ভূ অর্থাৎ পৃথিবীর পতি যে), হস্তকৃত (হস্ত দ্বারা করা হয়েছে যা), পিতৃধর্ম (পিতার অনুষ্ঠেয় ধর্ম), জলচর (জলে চরে যে জন্তু) ইত্যাদি।[১৬৪] এগুলো সংস্কৃত সমাস।

উপসংহার

কোনো বিষয় সম্পর্কে যথার্থ ধারণা লাভ করতে হলে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। সমাসের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধির জন্যেও এ বক্তব্য সমভাবে প্রযোজ্য। বৈয়াকরণগণও ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণপূর্বক সমাসের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। তবে পদের প্রাধান্যের ভিত্তিতে বিভক্ত অব্যয়ীভাবাদি চতুর্বিধ (মতান্তরে ষড়্‌বিধ) শ্রেণীবিভাগই অধিকাংশ বৈয়াকরণ গ্রহণ করেছেন। কেননা অর্থ অনুসারেই সমস্তপদের সমাস নির্ধারিত হয়। বক্তার ইচ্ছা অনুসারে একই পদ নানা ব্যঞ্জনায় রূপ পরিগ্রহ করে। এ কারণে একই শব্দে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশিত হয়। এই অর্থগত ভিন্নতার কারণে একই শব্দে ভিন্ন ভিন্ন সমাস হয় এবং তদনুসারেই ব্যাসবাক্য হয়। ব্যাসবাক্য অনুসারেই সমাসের নাম নির্ধারিত হয়। 'রামেশ্বর' একটি সমস্তপদ, এর একাধিক অর্থ হতে পারে এবং সমাসও একাধিক শ্রেণীর সাব্যস্ত করা যেতে পারে; যেমন– রামের ঈশ্বর = রামেশ্বর, রাম ঈশ্বর যার = রামেশ্বর, যিনি রাম তিনিই ঈশ্বর = রামেশ্বর। এই তিনটি ক্ষেত্রেই সমস্তপদের আকৃতি বা গঠন এক এবং তিনটি ক্ষেত্রেই পূর্বপদ ও পরপদ বিশেষ্য। গঠনগত দিক থেকে ক্ষেত্র তিনটির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনটি ক্ষেত্রেই একই শ্রেণীর সমাস ('বিশেষ্যের সঙ্গে বিশেষ্যের সমাস') হয়েছে। কিন্তু অর্থগত পার্থক্যে তিনটি ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন তিনটি সমাস হয়েছে। প্রথম ক্ষেত্রে উত্তরপদের

প্রাধান্যহেতু তৎপুরুষ সমাস, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পূর্বপদ ও পরপদে একই ব্যক্তিকে বোঝানোর কারণে কর্মধারয় সমাস (তৎপুরুষের অন্তর্গত) এবং তৃতীয় ক্ষেত্রে অন্যপদের প্রাধান্যহেতু বহুব্রীহি সমাস হয়েছে।

নীল যে অম্বর = নীলাম্বর এবং নীল অম্বর যার = নীলাম্বর। এই দুটো ক্ষেত্রেই সমস্তপদের আকৃতি এক। দুটো ক্ষেত্রেই পূর্বপদ বিশেষণ এবং পরপদ বিশেষ্য। আকৃতিগত বা গঠনগত দিক থেকে সমস্তপদ দুটোর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এই দিক থেকে ক্ষেত্রদ্বয়ে একই শ্রেণীর সমাস ('বিশেষণের সঙ্গে বিশেষ্যের সমাস') হয়েছে। কিন্তু অর্থগত পার্থক্যে ক্ষেত্রদ্বয়ে দুটো ভিন্ন ভিন্ন সমাস হয়েছে। প্রথম ক্ষেত্রে উত্তরপদের প্রাধান্যহেতু তৎপুরুষ (কর্মধারয়) সমাস হয়েছে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অন্যপদের প্রাধান্যহেতু বহুব্রীহি সমাস হয়েছে। এরূপ অনেক পদের অর্থভেদে ভিন্ন ভিন্ন সমাস হয়। এ কারণে সমাসসাধনে পদের অর্থের দিকে লক্ষ রাখা একান্ত প্রয়োজন। বৈয়াকরণগণও পদের প্রাধান্য বিচার করে সমাসের শ্রেণীবিভাগ নির্ধারণ করেছেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, 'বিশেষ্যের সঙ্গে বিশেষ্যের সমাস' ইত্যাদি শ্রেণীবিভাগ সমাসের বহিরঙ্গ বিশ্লেষণ, আকৃতিগত বা গঠনগত দিক মাত্র। এরূপ শ্রেণীবিভাগে সমাসের অর্থগত তথা প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে না। পদের প্রাধান্যের ভিত্তিতে বিভক্ত অব্যয়ীভাবাদি শ্রেণীবিভাগ সমাসের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। এরূপ শ্রেণীবিভাগেই সমাসের অন্তঃস্বরূপটি ধরা পড়ে। এ কারণে পদের প্রাধান্যের ভিত্তিতে বিভক্ত অব্যয়ীভাবাদি চতুর্বিধ (চার প্রচার) বা ষড়্‌বিধ (ছয় প্রকার) শ্রেণীবিভাগই গ্রহণীয়। তবে অন্যান্য শ্রেণীবিভাগও উপেক্ষণীয় নয়। সমাস সম্পর্কে যথার্থ ধারণা লাভ করতে হলে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভক্ত প্রতিটি শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। সমাসের কোনো কোনো শ্রেণীবিভাগ আপাতদৃষ্টিতে অপ্রয়োজনীয় বা অবান্তর মনে হতে পারে, কিন্তু কোনো শ্রেণীবিভাগই অপ্রয়োজনীয় বা অবান্তর নয়। সমাসের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে হলে তথা সমাসের সামগ্রিক মূল্যায়নের জন্য সকল প্রকার শ্রেণীবিভাগই জ্ঞাতব্য।

সমাসগঠনের মূল ভিত্তি যেহেতু দুটি পদ, সেহেতু অর্থগত প্রাধান্যের দিক থেকে সমাস অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি ও দ্বন্দ্ব এই চার প্রকারের অধিকভাগে বিভক্ত হওয়া সম্ভব নয়। এতৎসত্ত্বেও কোনো কোনো বৈয়াকরণ এই চতুর্বিধ শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে একমত পোষণ করেননি। তাঁদের মতে কর্মধারয় ও দ্বিগু স্বতন্ত্র সমাস। এ হিসেবে সমাস ছয় প্রকার। অধিকাংশ বৈয়াকরণ সরাসরি ছয় প্রকার সমাস স্বীকার করে পৃথক পৃথক ভাবে প্রতিটি সমাস সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন এবং ছয় প্রকার সমাসই সর্বতোভাবে গৃহীত

হয়েছে। নিত্য ও অনিত্য, লুক্ ও অলুক্ প্রভৃতি অন্যান্য শ্রেণীবিভাগ এই ছয় প্রকার সমাসের অন্তর্গত।

বাংলায় যেহেতু লিঙ্গ ও বচন অনুসারে সমাসনিষ্পন্ন শব্দের কোনো রূপান্তর হয় না, সেহেতু ব্যাসবাক্য বিশ্লেষণ না করা পর্যন্ত কোন শব্দ কোন সমাসনিষ্পন্ন তা অনেক ক্ষেত্রেই অনুমান করা যায় না। আর যেসব ক্ষেত্রে একই শব্দে অর্থভেদে ভিন্ন ভিন্ন সমাস হয় সেসব ক্ষেত্রে তো সম্ভবই নয়। তবে অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ, কর্মধারয়, দ্বিগু, বহুব্রীহি এবং দ্বন্দ্ব সমাসের গঠনপ্রণালী সম্পর্কে ধারণা থাকলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে রূপ দেখেই অনুমান করা যায় যে, শব্দটি কোন সমাসনিষ্পন্ন। যেমন – অপদেবতা, উপভাষা, প্রতিঘর, প্রশাখা প্রভৃতি সমাসনিষ্পন্ন শব্দ দেখেই অনুমান করা যায় যে, শব্দগুলো অব্যয়ীভাব সমাসনিষ্পন্ন। কেননা বাংলায় অব্যয়ীভাব সমাসে অব্যয় পূর্বপদরূপে প্রযুক্ত হয় এবং সমাসে তার অর্থপ্রাধান্য থাকে (তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অব্যয় পরপদ হয়; যেমন – জনপ্রতি, মণপ্রতি, মাথাপিছু ইত্যাদি)।

পরিশেষে বলা যায় যে, আকৃতি দেখে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমাস সম্পর্কে অনুমান করা গেলেও পদের প্রাধান্যবিচারই হচ্ছে সমাস নির্ধারণের উৎকৃষ্ট মানদণ্ড।

তথ্যনির্দেশ

১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, প্রথম রূপা সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ: বৈশাখ ১৪০২ / মে ১৯৯৫, পৃ. ১৭৬

২. 'পূর্বপদার্থপ্রধানো-' ব্যয়ীভাবঃ, উত্তরপদার্থপ্রধানস্তৎপুরুষঃ, অন্যপদার্থপ্রধানো বহুব্রীহিঃ, উভয়পদার্থপ্রধানো দ্বন্দ্বঃ' (ভট্টোজিদীক্ষিত, *বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী)*

৩. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, *বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, প্রকাশক: প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরি, ঢাকা, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৩৮৩, পৃ. ১২৫

৪। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, *ব্যাকরণ মঞ্জরী*, প্রথম মাওলা ব্রাদার্স সংস্করণ, বৈশাখ ১৪১০/ মে ২০০৩, পৃ. ১৪৪

৫. ঐ, পৃ. ১৪৫

৬. ড. মাহবুবুল হক, *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও রচনারীতি*, বই প্রকাশনী, ঢাকা, চতুর্থ প্রকাশ: জুলাই ২০০২, পৃ. ৮৮

৭. ঐ, পৃ. ৯৩

৮। প্রাগুক্ত, *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, পৃ. ১৭৬–১৭৭

৯. অধ্যাপক শ্রীপরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, *ভাষাবিদ্যা পরিচয়*, জয়দুর্গা লাইব্রেরী, কলিকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ: শ্রাবণ ১৩৯৬/ জুলাই ১৯৮৯, পৃ. ২৩৫; প্রফেসর মুহাঃ মনসূর উর রহমান, *ভাষা পরিক্রমা* (দ্বিতীয় পর্ব), প্রকাশক: জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: ২০০৫, পৃ. ৩৯৯

১০. প্রাগুক্ত, *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, পৃ. ১৭৭; প্রাগুক্ত, *ভাষাবিদ্যা পরিচয়*, পৃ.২৩৫; প্রাগুক্ত, *ভাষা পরিক্রমা*, পৃ. ৩৯৯
১১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙলা ব্যাকরণ*, বাক্-সাহিত্য (প্রা:) লিমিটেড, কলিকাতা , নূতন সংস্করণ: ফেব্রুয়ারি ২০০১, পৃ. ১২৩
১২. শ্রীবামনদেব চক্রবর্তী, *উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ*, অক্ষয় মালঞ্চ, কলকাতা, অভিনব ষোড়শ সংস্করণ: ডিসেম্বর ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ: জুন ২০০৬, পৃ. ২৩১
১৩। মাহবুবুল আলম, *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*, খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: আগস্ট ২০০২, পৃ. ১৭২
১৪. ঐ, পৃ. ১৭২
১৫. ঋষি দাস, *মাধ্যমিক ভাষা-বিচিত্রা*, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর ১৯৮১/ পৌষ ১৩৮৮, পৃ. ১৩২
১৬. ঐ, পৃ. ১৩২
১৭. *ঐ*, পৃ. ১৩২ – ১৩৩
১৮. প্রাগুক্ত, *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও রচনারীতি*, পৃ. ৮৯
১৯. প্রাগুক্ত, *ব্যাকরণ মঞ্জরী*, *পৃ.* ১৬১
২০. প্রাগুক্ত, *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও রচনারীতি*, পৃ. ১০৫
২১. প্রাগুক্ত, *মাধ্যমিক ভাষা-বিচিত্রা*, পৃ. ১৪২
২২. জ্যোতিভূষণ চাকী, *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* (আনন্দবাজার পত্রিকা ব্যবহার বিধি), আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, মে ২০০১, পৃ. ২৩৮
২৩. করুণাসিন্ধু দাস, *সংস্কৃত ব্যাকরণ ও ভাষা প্রসঙ্গ* (সমাসতত্ত্ব: সংস্কৃতে ও বাংলায়), স্বদেশ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: মহাসপ্তমী ২০০৫, পৃ. ১৫০
২৪. প্রাগুক্ত, *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও রচনারীতি*, পৃ. ৮৯
২৫. প্রাগুক্ত, *ব্যাকরণ মঞ্জরী*, পৃ. ১৪৯
২৬. ঐ পৃ. ১৪৫–১৪৬
২৭. প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত ব্যাকরণ ও ভাষা প্রসঙ্গ* , পৃ. ১৫১
২৮. ঐ, পৃ. ১৫০
২৯. প্রাগুক্ত, *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, পৃ. ১৮৫
৩০. অশোক মুখোপাধ্যায়, *সংসদ ব্যাকরণ অভিধান*, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা. লি, কলকাতা, পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ: জানুয়ারি ২০০৫, পৃ. ১৮
৩১. প্রাগুক্ত, *সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙলা ব্যাকরণ*, পৃ. ১৩৮
৩২. অজিতকুমার গুহ ও আনিসুজ্জামান, *নতুন বাংলা রচনা*, মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা, সপ্তদশ সংস্করণ, ভাদ্র ১৪০৪ (আগস্ট ১৯৯৭), *পৃ.* ৮৬
৩৩. প্রাগুক্ত, *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও রচনারীতি*, পৃ. ৯৩
৩৪. প্রাগুক্ত, *সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙলা ব্যাকরণ*, পৃ. ১২৯
৩৫. প্রাগুক্ত, *ব্যাকরণ মঞ্জরী*, *পৃ.* ১৬৩
৩৬. প্রাগুক্ত, *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও রচনারীতি*, পৃ. ৯৪
৩৭. ঐ, পৃ. ৯৫
৩৮. প্রাগুক্ত, ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, পৃ. ১৮০ – ১৮১
৩৯. প্রাগুক্ত, *ব্যাকরণ মঞ্জরী*, পৃ. ১৫০
৪০. প্রাগুক্ত, *উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ*, পৃ. ২৩৩

৪১. প্রাগুক্ত, *সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙলা ব্যাকরণ*, পৃ. ১২৪
৪২. প্রাগুক্ত, *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, পৃ. ১৮১ – ১৮৬
৪৩. প্রাগুক্ত, *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও রচনারীতি*, পৃ. ৯৫
৪৪. প্রাগুক্ত, *বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, পৃ. ১২৭ – ১২৯
৪৫. সুকুমার সেন, *ভাষার ইতিবৃত্ত*(৪নং পাদটীকা), আনন্দ পাবলিশার্স (প্রা.লি.), কলিকাতা, দশম মুদ্রণ, নভেম্বর ২০০৪, পৃ. ২৬১
৪৬. প্রাগুক্ত, *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* (আনন্দবাজার পত্রিকা ব্যবহার বিধি), পৃ. ২৩৩
৪৭. প্রাগুক্ত, *সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙলা ব্যাকরণ*, পৃ. ১২৪
৪৮. প্রাগুক্ত, *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও রচনারীতি*, পৃ. ৯৫
৪৯. প্রাগুক্ত, *সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙলা ব্যাকরণ*, পৃ. ১২৪
৫০. প্রাগুক্ত, *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও রচনারীতি*, পৃ. ৯৬
৫১. প্রাগুক্ত, *উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ*, পৃ. ২৩৪
৫২. প্রাগুক্ত, *সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙলা ব্যাকরণ*, পৃ. ১২৪
৫৩. প্রাগুক্ত, *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও রচনারীতি*, পৃ. ৯৭
৫৪. প্রাগুক্ত, *সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙলা ব্যাকরণ*, পৃ. ১২৪
৫৫. প্রাগুক্ত, *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও রচনারীতি*, পৃ. ৯৮
৫৬. প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত ব্যাকরণ ও ভাষা প্রসঙ্গ*, পৃ. ১৪৯
৫৭. প্রাগুক্ত, *ব্যাকরণ মঞ্জরী*, পৃ. ১৫০
৫৮. বিশ্বরূপ সাহা, *বৈদভাষানির্মিতি*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ১৯৯৭, পৃ. ৪৬৩–৪৬৪
৫৯. প্রাগুক্ত, *উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ*, পৃ. ২৩৫
৬০. প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত ব্যাকরণ ও ভাষা প্রসঙ্গ*, পৃ. ১৪৯
৬১. প্রাগুক্ত, *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* (আনন্দবাজার পত্রিকা ব্যবহার বিধি), পৃ. ২৩৪
৬২. প্রাগুক্ত, সংস্কৃত ব্যাকরণ ও ভাষা প্রসঙ্গ, পৃ. ১৪৯
৬৩. ঐ, পৃ. ১৫০
৬৪. প্রাগুক্ত, *ব্যাকরণ মঞ্জরী*, পৃ. ১৫১
৬৫. প্রাগুক্ত, *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* (আনন্দবাজার পত্রিকা ব্যবহার বিধি), পৃ. ২৩৪
৬৬. প্রাগুক্ত, *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, পৃ. ১৮২
৬৭. প্রাগুক্ত, *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* (আনন্দবাজার পত্রিকা ব্যবহার বিধি), পৃ. ২৩৫
৬৮. প্রাগুক্ত, *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও রচনারীতি*, পৃ. ৯৬
৬৯. প্রাগুক্ত, *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* (আনন্দবাজার পত্রিকা ব্যবহার বিধি), পৃ. ২৩৫
৭০. অশোক মুখোপাধ্যায়, *সংসদ ব্যাকরণ অভিধান*, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা লি, কলকাতা, পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ: জানুয়ারি ২০০৫, পৃ. ১৭৫
৭১. প্রাগুক্ত, *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, পৃ. ১৮২ এখানে উল্লেখ্য যে, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় *সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙলা ব্যাকরণ* গ্রন্থে কিন্তু নিমিত্ত তৎপুরুষ বলেছেন।
৭২. প্রাগুক্ত, *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* (আনন্দবাজার পত্রিকা ব্যবহার বিধি), পৃ. ২৩৫
৭৩. প্রাগুক্ত, *সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙলা ব্যকরণ*, পৃ. ১২৪
৭৪. প্রাগুক্ত, *বাংলা ভাষার ব্যকরণ ও রচনারীতি*, পৃ. ৯৭
৭৫. প্রাগুক্ত, *মাধ্যমিক ভাষা-বিচিত্রা*, পৃ. ১৪২
৭৬. প্রাগুক্ত, *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* (আনন্দবাজার পত্রিকা ব্যবহার বিধি), পৃ. ২৩৬

৭৭. প্রাগুক্ত, *সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙলা ব্যাকরণ*, পৃ. ১৩৬
৭৮. প্রাগুক্ত, *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* (আনন্দবাজার পত্রিকা ব্যবহার বিধি), পৃ. ২৩৭
৭৯. প্রাগুক্ত, *বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, পৃ. ১৩৪
৮০. প্রাগুক্ত, *ব্যাকরণ মঞ্জরী*, পৃ. ১৫৬
৮১. প্রাগুক্ত, *ব্যাকরণ মঞ্জরী*, পৃ. ১৫৬
৮২. প্রাগুক্ত, *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, পৃ. ১৮১
৮৩. প্রাগুক্ত, *ভাষাবিদ্যা পরিচয়*, পৃ. ২৩৬
৮৪. মাহবুবুল আলম, *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*, খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: আগস্ট ২০০২, পৃ. ১৭৩–১৭৪
৮৫. প্রাগুক্ত, *নতুন বাংলা রচনা*, পৃ. ৮৩
৮৬. প্রাগুক্ত, *ব্যাকরণ মঞ্জরী*, পৃ. ১৬০ – ১৬১
৮৭. প্রাগুক্ত, *বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, পৃ. ১২৭
৮৮. প্রাগুক্ত, *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*, পৃ. ১৭৪
৮৯. প্রাগুক্ত, *বেদভাষানির্মিতি*, পৃ. ৫১১
৯০. প্রাগুক্ত, *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, পৃ. ১৭৯
৯১. প্রাগুক্ত, *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*, পৃ. ১৭৪
৯২. প্রাগুক্ত, *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* (আনন্দবাজার পত্রিকা ব্যবহার বিধি), পৃ. ২৩৩
৯৩. প্রাগুক্ত, *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, পৃ. ১৮০
৯৪. প্রাগুক্ত, *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* (আনন্দবাজার পত্রিকা ব্যবহার বিধি), পৃ. ২৩৩
৯৫. প্রাগুক্ত, *মাধ্যমিক ভাষা-বিচিত্রা*, পৃ. ১৩৫
৯৬. প্রাগুক্ত, *উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ*, পৃ. ২৪১
৯৭. অলিভা দাক্ষী, *বাংলা ভাষাবিজ্ঞান অভিধান*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৩, পৃ. ৯৩; ডঃ শাহজাহান মনির, *বাংলা ব্যাকরণ*, স্টুডেন্টস পাবলিকেশন্স, ঢাকা, নবম সংস্করণ, কার্তিক ১৪০৩, পৃ. ১৪৮; প্রাগুক্ত, *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও রচনারীতি*, পৃ. ১০২; প্রাগুক্ত, *সংসদ ব্যাকরণ অভিধান*, পৃ. ১৭৯
৯৮. প্রাগুক্ত, *মাধ্যমিক ভাষা-বিচিত্রা*, পৃ. ১৪৪
৯৯. প্রাগুক্ত, *ব্যাকরণ মঞ্জরী*, পৃ. ১৫৬ – ১৫৯
১০০. প্রাগুক্ত, *সংসদ ব্যাকরণ অভিধান*, পৃ. ৬১
১০১. প্রাগুক্ত, *উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ*, পৃ. ২৪১–২৪২; প্রাগুক্ত, *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* (আনন্দবাজার পত্রিকা ব্যবহার বিধি), পৃ. ২৩৮; প্রাগুক্ত, *বাংলা ভাষাবিজ্ঞান অভিধান*, পৃ. ৯৩–৯৪
১০২. প্রাগুক্ত, *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, পৃ. ১৮৭–১৮৮
১০৩. প্রাগুক্ত, *মাধ্যমিক ভাষা-বিচিত্রা*, পৃ. ১৪৫
১০৪. প্রাগুক্ত, *ব্যাকরণ মঞ্জরী*, পৃ. ১৬০
১০৫. প্রাগুক্ত, *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* (আনন্দবাজার পত্রিকা ব্যবহার বিধি), পৃ. ২৩৯
১০৬. প্রাগুক্ত, *সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙলা ব্যাকরণ*, পৃ. ১২৭
১০৭. প্রাগুক্ত, *বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, পৃ. ১৩৪
১০৮. প্রাগুক্ত, *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, পৃ. ১৯১–১৯২; প্রাগুক্ত, *ভাষাবিদ্যা পরিচয়*, পৃ. ২৩৭
১০৯. প্রাগুক্ত, *সংসদ ব্যাকরণ অভিধান*, পৃ. ১২৬
১১০. প্রাগুক্ত, *বাংলা ভাষাবিজ্ঞান অভিধান*, পৃ. ২৫০–২৫১
১১১. প্রাগুক্ত, *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* (আনন্দবাজার পত্রিকা ব্যবহার বিধি), পৃ. ২৪১–২৪৪

১১২. প্রাগুক্ত, *ব্যাকরণ মঞ্জরী*, পৃ. ২৬২ – ২৬৩
১১৩. প্রাগুক্ত, *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*, পৃ. ১৭৯
১১৪. প্রাগুক্ত, *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও রচনারীতি* , পৃ. ৮৭–৮৮
১১৫. প্রাগুক্ত, *নতুন বাংলা রচনা*, পৃ. ১৪৭
১১৬. প্রাগুক্ত, *ভাষার ইতিবৃত্ত*, পৃ. ২৬২
১১৭. প্রাগুক্ত, *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও রচনারীতি* , পৃ. ১০৯
১১৮. প্রাগুক্ত, *ব্যাকরণ মঞ্জরী*, পৃ. ১৬৩
১১৯. প্রাগুক্ত, *নতুন বাংলা রচনা*, পৃ. ৮৮
১২০. প্রাগুক্ত, *উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ*, পৃ. ২৫৩
১২১. প্রাগুক্ত, বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (আনন্দবাজার পত্রিকা ব্যবহার বিধি), পৃ. ২৪৩
১২২. প্রাগুক্ত, *ভাষার ইতিবৃত্ত*, পৃ.২৬২
১২৩. প্রাগুক্ত, *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* (আনন্দবাজার পত্রিকা ব্যবহার বিধি), পৃ. ২৪৪
১২৪. প্রাগুক্ত, *ভাষার ইতিবৃত্ত*, পৃ. ২৬২
১২৫. প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত ব্যাকরণ ও ভাষা প্রসঙ্গ*, পৃ. ১৫১
১২৬. প্রাগুক্ত, *সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙলা ব্যাকরণ*, পৃ. ১৩২
১২৭. প্রাগুক্ত, *উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ*, পৃ. ২৫৯
১২৮. প্রাগুক্ত, *সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙলা ব্যাকরণ*, পৃ. ১৩৫
১২৯. প্রাগুক্ত, *মাধ্যমিক ভাষা-বিচিত্রা*, পৃ. ১৫১
১৩০. প্রাগুক্ত, *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, পৃ. ১৭৫
১৩১. প্রাগুক্ত, *ব্যাকরণ মঞ্জরী*, পৃ. ১৪৯
১৩২. প্রাগুক্ত, *বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, পৃ. ১৩৩
১৩৩. প্রাগুক্ত, *ব্যাকরণ মঞ্জরী*, পৃ. ১৪৬
১৩৪. ঐ, পৃ. ১৪৯
১৩৫. প্রাগুক্ত, *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, পৃ. ১৮৬
১৩৬. প্রাগুক্ত, *সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙলা ব্যাকরণ*, পৃ. ১৩৫
১৩৭. ঐ, পৃ. ১৩৮
১৩৮. প্রাগুক্ত, *মাধ্যমিক ভাষা-বিচিত্রা*, পৃ. ১৫১
১৩৯. প্রাগুক্ত, *নতুন বাংলা রচনা*, পৃ. ৯১
১৪০. প্রাগুক্ত, *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* (আনন্দবাজার পত্রিকা ব্যবহার বিধি), পৃ. ২৪৫
১৪১. প্রাগুক্ত, *সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙলা ব্যাকরণ*, পৃ. ১৩৮
১৪২. প্রাগুক্ত, *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* (আনন্দবাজার পত্রিকা ব্যবহার বিধি), পৃ. ২৪৫
১৪৩. প্রাগুক্ত, *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, পৃ. ১৯৪
১৪৪. প্রাগুক্ত, *ভাষা পরিক্রমা*, পৃ. ৪০৩
১৪৫. প্রাগুক্ত, *ভাষাবিদ্যা পরিচয়*, পৃ. ২৩৭
১৪৬. প্রাগুক্ত, *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* (আনন্দবাজার পত্রিকা ব্যবহার বিধি), পৃ. ২৪৭
১৪৭. প্রাগুক্ত, *ভাষা পরিক্রমা*, পৃ. ৪০৩
১৪৮. প্রাগুক্ত, *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* (আনন্দবাজার পত্রিকা ব্যবহার বিধি), পৃ. ২৩৪
১৪৯. প্রাগুক্ত, *সংসদ ব্যাকরণ অভিধান*, পৃ. ১৮২
১৫০. প্রাগুক্ত, *ব্যাকরণ মঞ্জরী*, পৃ. ১৪৫
১৫১. প্রাগুক্ত, *সংসদ ব্যাকরণ অভিধান*, পৃ. ১৮২

১৫২. প্রাগুক্ত, *ব্যাকরণ মঞ্জরী*, পৃ. ১৫৪
১৫৩. প্রাগুক্ত, *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, পৃ. ১৮৬
১৫৪. প্রাগুক্ত, *ভাষার ইতিবৃত্ত*, পৃ. ২৬১ – ২৬৩
১৫৫. ঐ, পৃ. ২৬৩
১৫৬. রাজা রামমোহন রায়, *গৌড়ীয় ব্যাকরণ*, রামমোহন রচনাবলী, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: শুভ নববর্ষ ১৩৮০/ ১৪ এপ্রিল ১৯৭৩, পৃ. ৩৮০
১৫৭. ঐ, পৃ. ৩৮০
১৫৮. ঐ, পৃ. ৩৮০
১৫৯. ঐ, পৃ. ৩৮০
১৬০. ঐ, পৃ. ৩৮০
১৬১. ঐ, পৃ. ৩৮১
১৬২. ঐ, পৃ. ৩৮১
১৬৩. ঐ, পৃ. ৩৮১
১৬৪. ঐ, পৃ. ৩৮১

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, ত্রিংশ খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৯/জুন ২০১২

রবীন্দ্রনাথের ভাষা-চিন্তা

সেলিনা জেসমিন*
রওশন আরা**

সারসংক্ষেপ

ইংল্যান্ডে থাকা অবস্থায় এক ইংরেজ বন্ধুকে বাংলা পড়াতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার উচ্চারণ বিশৃঙ্খলা আবিষ্কার করেন এবং সেই বিশৃঙ্খলার পথ ধরেই নিয়ম অনুসন্ধান শুরু করেন। তারই ফলস্বরূপ আমরা পাই 'শব্দতত্ত্ব' ও 'বাংলাভাষা পরিচয়' নামক গ্রন্থ। সাহিত্য রচনার সময় তিনি বাংলা ভাষা, শব্দের গঠন, কারক, ধ্বনি ও উচ্চারণ সম্পর্কে যেসব অসঙ্গতি লক্ষ্য করেছিলেন তা সাহিত্যিকের মন নিয়ে পর্যবেক্ষণ আকারে তুলে ধরেছেন উল্লিখিত গ্রন্থ দুটোর অন্তর্গত বিভিন্ন প্রবন্ধে। রবীন্দ্রনাথের এ সমস্ত লেখায় একজন ভাষাবিজ্ঞানীর সচেতন মনোভাবের যে পরিচয় পাওয়া যায় তারই খানিকটা তুলে ধরার প্রচেষ্টাস্বরূপ তাঁর বাংলা উচ্চারণ, স্বরবর্ণ এ, বাংলা ব্যাকরণে তির্যকরূপ, বাংলা নির্দেশক, বাংলা বহুবচন, বানান বিভ্রাট, বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়, ভাষার খেয়াল ইত্যাদি প্রবন্ধের একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিয়েই এ লেখা।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ সন্তান রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আক্ষরিক অর্থেই সৃষ্টিছাড়া। অন্য ভাইদের মতো নিয়মতান্ত্রিক লেখাপড়া তাঁর হয় নি। পরিবারের পক্ষ থেকে চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। কবির নিজের ভাষায় 'জীবন আছিল লঘু প্রথম বয়সে'। স্কুল-কলেজে যাওয়া ছিল না তাই পরীক্ষার পড়াশুনা ছিল না। তবে মনের আনন্দে যা কিছু তিনি পড়েছেন আর সেই যে কিশোর বয়সে কলম ধরেছেন তারই অবিরাম ধারায় কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য। বাংলা সাহিত্য তাঁরই প্রতিভার স্পর্শে আপন সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বের দরবারে নিজের আসন করে নিয়েছে। 'সাহিত্যের এমন কোন শাখা নেই যা তাঁর অকৃপণ বর্ষণে প্লাবিত নয়। উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, নাটক, গান, চিঠিপত্র, ভ্রমণকাহিনী এ সব অজস্র তো আছেই। তিনি ভূগোল লিখেছেন, ইতিহাস লিখেছেন, বিজ্ঞানের ওপর বইপত্রও। এমনকি ক্লাস ওয়ান-টুতে পড়ার বর্ণপরিচয় পর্যন্ত।'[১]

যখন প্রকৃত বাংলা ব্যাকরণ রচনায় কেউ হাত দেননি, বাংলা ব্যাকরণ লিখতে গিয়ে সবাই সংস্কৃত ব্যাকরণ লিখেছেন (তখন ধারণা করা হতো সংস্কৃত বাংলার জননী) তখন প্রকাশিত

---

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজ, ঢাকা
** প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজ, ঢাকা

হয় রবীন্দ্রনাথের 'বাংলাভাষা-পরিচয়'। ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত এ গ্রন্থটি আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, কেননা ততদিনে আমরা বাংলা ভাষার উৎস সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা থেকে অনেক সরে এসেছি, বাংলা ব্যাকরণ লেখার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছি। রবীন্দ্রনাথ শতোর্ধ্ব বছর আগে আক্ষেপ করে বলেছেন—

> কিন্তু যখন দেখি আজ পর্যন্ত কোনো বাঙালি প্রকৃত বাংলা ব্যাকরণ রচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই তখন প্রলোভন সংবরণ করিয়া লইতে হয়। আমরা কেন বাংলা ব্যাকরণ লিখিতে গিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ লিখি, আমাদের কোনো শিক্ষক লোককেও বাংলা ব্যাকরণের নিয়ম জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার চক্ষু স্থির হইয়া যায় কেন, এ সব কথা ভাবিয়া দেখিলে নিজের উপর ধিক্কার এবং সাহেবের উপর শ্রদ্ধা জন্মে।' [২]

ব্যাকরণের কঠিন বিষয়গুলো কথাচ্ছলে হালকা ভঙ্গিতে তার জরুরি দিকগুলো তুলে ধরেছেন তাঁর ভাষা বিষয়ক প্রবন্ধগুলোতে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'ভাষার কথা' ও 'বাংলাভাষা-পরিচয়' নামক প্রবন্ধ থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যায়—

ক. বাংলা গদ্য সাহিত্যেরও সূত্রপাত হইল বিদেশীর ফরমাশে, এবং তার সূত্রধার হইলেন সংস্কৃত পণ্ডিত, বাংলা ভাষার সঙ্গে যাঁদের ভাসুর-ভাদ্রবউয়ের সম্বন্ধ। তাঁরা সংস্কৃত ব্যাকরণের হাতুড়ি পিটিয়া নিজের হাতে এমন একটা পদার্থ খাড়া করিলেন যাহার কেবল বিধিই আছে কিন্তু গতি নাই।[৩]

খ. রামমোহন রায় যখন গদ্য লিখতে বসেছিলেন তখন তাঁকে নিয়ম হেঁকে হেঁকে কোদাল হাতে, রাস্তা বানাতে হয়েছিল।[৪]

গ. ভাষাকে ছন্দে ওজন করা পদে বিভক্ত করতে গেলে তার মধ্যে স্বাভাবিক কথা বলিবার নিয়ম খাটে না, ক্রমে তার একটা বিশেষ রীতি বেঁধে যায়। প্রথমত কর্তা-কর্ম -ক্রিয়াপদের সহজ পর্যায় রক্ষা হতেই পারে না।[৫]

ঘ. 'ক্ষণিকা'য় আমি প্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রাকৃত বাংলা ভাষা ও প্রাকৃত ছন্দ ব্যবহার করিয়াছিলাম। তখন সেই ভাষার শক্তি, বেগ ও সৌন্দর্য প্রথম স্পষ্ট করিয়া বুঝি। দেখিলাম এ ভাষা পাড়াগাঁয়ের টাট্টু ঘোড়ার মতো কেবলমাত্র গ্রাম্য ভাবের বাহন নয়, ইহার গতিশক্তি ও বাহনশক্তি কৃত্রিম পুঁথির ভাষার চেয়ে অনেক বেশি।[৬]

বাংলার ভূতপূর্ব সিভিলিয়ন জন্ বীম্‌স্ সাহেব অনেক দিনের চেষ্টায় কেবল বাংলা শেখেন নি বাংলা ভাষার একটি ব্যাকরণ রচনা করেছেন। শুধুমাত্র জ্ঞানানুরাগের বশবর্তী হয়ে তিনি যা করেছেন, জ্ঞানানুরাগ ও দেশানুরাগ দুটো মিলিয়েও কোন বাঙালি তা করতে পারেননি। তাই বীম্‌স্ সাহেবের শত ত্রুটিযুক্ত ব্যাকরণও রবীন্দ্রনাথের মতে, প্রাতঃস্মরণীয়। এ বিষয়ে তিনি বলেন, 'বীম্‌স্ সাহেব তাঁহার (তাঁহারা) ব্যাকরণে যে সমস্ত ভুল করিয়াছেন, সেইগুলি আলোচনা ও বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেও মাতৃভাষা সম্বন্ধে আমাদের অনেক শিক্ষালাভ হইতে পারে'।[৭]

বীম্‌সের ব্যাকরণের প্রথম অধ্যায়ে বাংলা ভাষার উচ্চারণ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। বীম্‌স্ বাংলা স্বরবর্ণ 'অ'-এর দুই রকম উচ্চরণের কথা ইংরেজি শব্দের দৃষ্টান্ত দিয়ে তুলে ধরেন। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, এগুলোকে যদি উচ্চারণবিকার ধরা হয় তাহলে তা-ও

অনেক স্থলে নিয়মবদ্ধ। এ সব নিয়মের মধ্যে অনেক সূক্ষ্মতা আছে। তিনি বলেন যে, আমরা বন, মন প্রভৃতি শব্দের অকারের উচ্চারণ ওকারবৎ করি, কিন্তু তিন অক্ষরের শব্দের বেলায় তা হয় না; যেমন– জনম, তনয়, ক্ষণেক ইত্যাদি। বীম্‌স্ লিখেছেন, সিলেবলের শেষ 'অ' স্বরের লোপ হয়ে হসন্ত হয়। যেমন– কলস, ঘটক। রবীন্দ্রনাথ লিখিত ও কথিত বাংলার ব্যাকরণের পার্থক্য তুলে ধরে বলেন যে, কিছু কিছু প্রচলিত কথায় (লিখিত ভাষায় নয়) বীম্‌সের নিয়ম খাটে। যেমন– পর্‌কলা, আল্‌পনা, অব্‌সর ইত্যাদি। তাঁর মতে–

> যে-সকল সংস্কৃত শব্দ ভাষায় নূতন প্রবেশ করিয়াছে এবং জনসাধারণের দ্বারা সর্বদা ব্যবহৃত হয় না, তাহাতে সংস্কৃত উচ্চারণের নিয়ম এখনো রক্ষিত হয়। কিন্তু 'পাঠশালা' প্রকৃত সংস্কৃত কথা যাহা চাষাভুষারাও নিয়ত ব্যবহার করে, তাহাতে বাংলা ভাষার নিয়ম সংস্কৃত নিয়মকে পরাস্ত করিয়াছে।[৮]

বীম্‌স্ সাহেবের নিয়মকে একটু সংকীর্ণ করে রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, শব্দের পরবর্তী সিলেবল স্বরান্ত হলে পূর্ব সিলেবলের অ-কার লোপ পায়, পরন্তু হসন্তের পূর্ববর্তী অ-কার কিছুতেই লোপ পায় না। যেমন- আঁচল এবং আঁচলা, আপন এবং আপ্‌নি, আঁচড় এবং আঁচ্‌ড়ানো ইত্যাদি।

অন্যত্র বীম্‌স্ সাহেব ও রামমোহন রায়ের নিয়মের স্বপক্ষে উদ্ধৃত দৃষ্টান্তের বিপরীতে তিনি বলেন যে, খাঁটি বাংলায় দুই অক্ষরের অধিকাংশ বিশেষণ শব্দ হলন্ত নয়। আর বিশেষণ শব্দ বিশেষ রূপে অ-কারান্ত উচ্চারিত হবেই এমন কোন নিয়ম নেই। বাংলায় অধিকাংশ দুই অক্ষরের বিশেষণ, যা সংস্কৃত মূল শব্দ অনুসারে অ-কারান্তে হওয়া উচিত ছিল, তা আ-কারান্ত হয়। যেমন– সহজ-সোজা, রুগ্ন-রোগা, ভগ্ন-ভাঙা ইত্যাদি।

'বাংলা উচ্চারণ' নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি শব্দের উচ্চারণ মুখস্থ করতে গিয়ে কেন বাঙালির প্রাণ বের হবার উপক্রম হয় তার কারণ হিসেবে বলেন যে, ইংরেজি অক্ষরের নামের সাথে কাজের সঙ্গতি নেই। অক্ষর দুটো আলাদা অবস্থায় একরকম, অথচ একত্র হয়ে গেলেই অন্য রকম। বাংলা বর্ণমালার ক্ষেত্রে তেমন নয়। আবার ইংরেজি একটি অক্ষরের একাধিক রকম উচ্চারণ যেমন- বি এ =বে, সি এ = কে, বি এ বি= ব্যাব, সি এ বি= ক্যাব, বি এ আর = বার, সি এ আর = কার, বি এ ডব্‌ল এল = বল, সি এ ডব্‌ল এল = কল। আবার দেখা যায় এক এক জায়গায় অক্ষর আছে কিন্তু তার উচ্চারণ নাই। তিনি কৌতুক করে বলেন– "একটা কেন, এমন পাঁচটা অক্ষর সারি সারি বেকার দাঁড়াইয়া আছে, বাঙালির ছেলের মাথার পীড়া ও অম্লরোগ জন্মাইয়া দেওয়া ছাড়া তাহাদের আর কোনো সাধু উদ্দেশ্যই দেখা য়ায় না।"[৯] এ ব্যাপারে তিনি আরও বলেন-

> পেয়ারার মধ্যে যেমন অনেকগুলো বীজ কেবলমাত্র খাদকের পেটকামড়ানির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিরাজ করে, তেমনি ইংরেজি শব্দের উদর পরিপূর্ণ করিয়া অনেকগুলি অক্ষর কেবল রোগের বীজস্বরূপে থাকে মাত্র। [১০]

তাঁর মতে, সে তুলনায় বাংলায় এ ধরনের উপদ্রব নেই। কেবল তিনটে স, দুটো ন ও দুটো জ আমাদের বিপাকে ফেলে। এই তিনটে স-এর হাত এড়াবার জন্য পরীক্ষার পূর্বে পণ্ডিতমশায় নাকি ছাত্রদের পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, "দেখো বাপু, 'সুশীতল সমীরণ' লিখতে যদি ভাবনা উপস্থিত হয় তো লিখে দিয়ো 'ঠাণ্ডা হাওয়া'।

এছাড়া আমাদের বর্ণমালার দুটো ব-এর মধ্যে একটা ব কোনো কাজে লাগে না। তবে সবচেয়ে কষ্ট দেয় দীর্ঘহ্রস্ব স্বর। বর্ণমালার মধ্যে এরকম গোলযোগ যতই থাক না কেন, আমাদের উচ্চারণের মধ্যে কোনো অনিয়ম নেই প্রথমে এমন ধারণাই ছিল রবীন্দ্রনাথের। ইংল্যান্ডে থাকা অবস্থায় একজন ইংরেজ বন্ধুকে বাংলা পড়াবার সময় রবীন্দ্রনাথ প্রথম উপলব্ধি করেন বাংলা বর্ণমালায় তিনটি স, দুটো ব, দীর্ঘহ্রস্ব স্বর ছাড়াও বাংলা অক্ষরে যথেষ্ট গোলযোগ আছে। তিনি বলেন–

> হরি শব্দে আমরা হ যেরূপ উচ্চারণ করি, হর শব্দে হ সেরূপ উচ্চারণ করি না। দেখা শব্দের একার একরূপ এবং দেখি শব্দের একার আর একরূপ। পবন শব্দে প অকারান্ত, ব ও কারান্ত, ন হসন্ত শব্দ। শ্বাস শব্দের শ্ব-এর উচ্চারণ বিশুদ্ধ শ এর মতো। কিন্তু বিশ্বাস শব্দের শ্ব এর উচ্চারণ শশ এর ন্যায়। 'ব্যয়' লিখি কিন্তু পড়ি ব্যায়। অথচ অব্যয় শব্দে ব্য-এর উচ্চারণ ব্ব-র মতো। আমরা লিখি গর্দভ, পড়ি গর্ধোব। লিখি 'সহ্য', পড়ি সোজঝো। [১১]

রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, আমাদের তিনটে স-এর উচ্চারণে তফাত নেই অর্থাৎ বাংলায় সকল স-ই তালব্য শ-এর মতো উচ্চারিত হয়, কিন্তু আমাদের যুক্ত অক্ষরের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। কষ্ট ও ব্যস্ত শব্দের দুই শ-এর উচ্চারণের পার্থক্যই তার প্রমাণ। জ-এর উচ্চারণ কোথাও বা ইংরেজি জেড এর মতো হয়। সাধারণত আমাদের ভাষায় অন্ত্যস্থ ব-এর দরকার হয় না, তবে জিহ্বা আহ্বান শব্দে অন্ত্যস্থ ব ব্যবহৃত হয়।

বাংলা ভাষার এসব উচ্চারণ বিশৃঙ্খলা নজরে পড়ার পর তিনি এই বিশৃঙ্খলার মধ্যেও নিয়ম অনুসন্ধান শুরু করেন। দুটো বাংলা অভিধান থেকে উদাহরণ সংগ্রহ করে সেখান থেকেই একটা নিয়ম বের করার চেষ্টা করেন। নিয়মগুলো নিম্নরূপ–

অ কিংবা অকারান্ত বর্ণ উচ্চারণকালে মাঝে মাঝে ও কিংবা ওকারান্ত হয়ে যায়। যেমন– অতি, কল, ঘড়ি, কল্য, মরু, দক্ষ ইত্যাদি। তিনি লক্ষ্য করেন যে, অ কেবল স্থান বিশেষেই ও হয়ে যায়, সুতরাং এরও একটা নিয়ম তিনি আবিষ্কার করেন। নিয়মগুলো রবীন্দ্রনাথের ভাষায়:

> ১ম নিয়ম। ই (হ্রস্ব অথবা দীর্ঘ) অথবা উ (হ্রস্ব অথবা দীর্ঘ) কিংবা ইকারান্ত উকারান্ত ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে তাহার পূর্ববর্তী অকারের উচ্চারণ 'ও' হইবে; যথা, অগ্নি অগ্রিম কপি তরু অঙ্গুলি অধুনা হনু ইত্যাদি।
>
> ২য়। নিয়ম। যফলা-বিশিষ্ট ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে 'অ' 'ও' হইয়া যাইবে। এ নিয়ম প্রথম নিয়মের অন্তর্গত বলিলেও হয়, কারণ যফলা ই এবং অ-এর যোগমাত্র। উদাহরণ; গণ্য, দন্ত্য, লভ্য ইত্যাদি।...

৩য়। ক্ষ পরে থাকিলে তৎপূর্ববর্তী 'অ' 'ও' হইয়া যায়; যথা, অক্ষর কক্ষ লক্ষ পক্ষ ইত্যাদি। ক্ষ-র উচ্চারণ বোধ করি এককালে কতকটা ইকার - ঘেঁষা ছিল, তাই এই অক্ষরের নাম হইয়াছে ক্ষিয়।...

৪র্থ। ক্রিয়াপদের স্থলবিশেষে অকারের উচ্চারণ 'ও' হইয়া যায়; যেমন, হ'লে ক'রলে ম'ল ইত্যাদি। অর্থাৎ যদি কোনো স্থলে অ-এর পরবর্তী হ অপভ্রংশে লোপ হইয়া থাকে, তথাপিও পূববর্তী অ-এর উচ্চারণ ও হইবে। হইলে-ও অপভ্রংশ হ'লে, করিলে-ও অপভ্রংশ ক'রলে পড়িল-প'ল, মরিল-ম'ল। করিয়া-ও অপভ্রংশ ক'রে, এইজন্য ক-এ ওকার যোগ হয়, কিন্তু সমাপিকা ক্রিয়া 'করে' অবিকৃত থাকে। কারণ করে শব্দের মধ্যে ই নাই এবং ছিল না।

৫ম। ঋফলা বিশিষ্ট বর্ণ পরে আসিলে তৎপূর্বের অকার 'ও' হয়; যথা, কর্তৃত্ব, ভর্তৃ, মসৃণ, যকৃত, বক্তৃতা ইত্যাদি। ইহার কারণ স্পষ্ট পড়িয়া রহিয়াছে, বঙ্গভাষায় ঋফলার উচ্চারণের সহিত ইকারের যোগ আছে।

৬ষ্ট। এবারের যে নিয়ম উল্লেখ করিতেছি তাহা নিয়ম কি নিয়মের ব্যতিক্রম বুঝা যায় না। দ্ব্যক্ষর বিশিষ্ট শব্দে দন্ত্য ন অথবা মূর্ধন্য ণ পরে থাকিলে পূর্ববর্তী অকার 'ও' হইয়া যায়; বন, ধন, জন, মন, মণ, পণ, ক্ষণ। ঘন শব্দের উচ্চারণের স্থিরতা নাই। কেহ বলেন, 'ঘনো দুধ', কেহ বলেন ' 'ঘোনো দুধ'। গণ এবং রণ শব্দ এই নিয়মের মধ্যে পড়ে না। তিন অথবা তাহার বেশি অক্ষরের শব্দে এই নিয়ম খাটে না; যেমন, কনক, গণক ,সনসন ,কনকন। তিন অক্ষরের অপভ্রংশে যেখানে দুই অক্ষর হইয়াছে, সেখানেও এ নিয়ম খাটে না; যেমন, কহেন শব্দের অপভ্রংশ ক'ন, হয়েন শব্দের অপভ্রংশ হ'ন ইত্যাদি। যাহা হউক ৬ষ্ঠ নিয়মটা তেমন পাকা নহে।

৭ম। ৪র্থ নিয়মে বলিয়াছি অপভ্রংশে ইকারের লোপ হইলেও পূর্ববতী অ 'ও' হইয়াছে। অপভ্রংশে উকারের লোপ হইলেও পূর্ববর্তী অ উচ্চারণস্থলে ও হইবে; যথা, হউন—হ'ন, রহুন—র'ন, কহুন—ক'ন ইত্যাদি।

৮ম। রফলা- বিশিষ্ট বর্ণের অ লিপ্ত থাকিলে তা 'ও' হইয়া যায়; শ্রবণ, ভ্রম, ভ্রমণ, বজ্র, গ্রহ, ত্রস্ত, প্রমাণ, প্রতাপ ইত্যাদি। কিন্তু য় পরে থাকিলে অ-এর বিকার হয় না; যথা, ক্রয়, শ্রয়। [১২]

নিয়মগুলো উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, দুয়েকটি ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বোঝা যাচ্ছে ই কিংবা উ-এর পূর্বে অ-এর উচ্চারণ 'ও' হয়ে যায়। এমন কি, যফলা ও ঋফলায় ইকারের সংস্রব আছে বলে তার পূর্বের অ-এর বিকার হয়।

তিনি কিছু ব্যতিক্রমের কথাও বলেছেন। ই উ যফলা ঋ ফলা ক্ষ পরে থাকলেও অভাবার্থসূচক অ-এর বিকার হয় না; যথা অকিঞ্চন, অকুতোভয়, অখ্যাতি, অক্ষয় ইত্যাদি। আবার ই উ যফলা ইত্যাদি পরে না থাকা সত্ত্বেও এদের আদ্যাক্ষরবর্তী অ 'ও' হয়ে যায়। যেমন- মন্দ, নখ, মঙ্গল, ব্রহ্ম ইত্যাদি।

মধ্যাক্ষরে যে প্রথম অক্ষরের নিয়ম খাটে না, তাও তিনি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। বল শব্দের ব-এর সাথে সংযুক্ত অকারের কোনো পরিবর্তন হয় না, কিন্তু কেবল শব্দের ব-এ হ্রস্ব ওকার লাগে। এই প্রবন্ধের শেষাংশে তিনি বলেন, "প্রকৃত বাংলা ব্যাকরণ একখানিও প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত ব্যাকরণের একটু ইতস্তত করিয়া তাহাকে বাংলা ব্যাকরণ নাম দেওয়া হয়"।[১৩]

'স্বরবর্ণ অ' নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, প্রধানত ই এবং উ– এই দুই স্বরবর্ণের প্রভাবেই অন্য স্বরবর্ণের উচ্চারণ বিকার ঘটে থাকে। এর দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে তিনি বলেন যে,

'গত' শব্দের গ-এ কোনো পরিবর্তন ঘটে না, কিন্তু ইকার পরে থাকাতে গতি শব্দের গ-এ ওকারের সংযোগ হয়। তেমনি কণা এবং কণিকা, ফণা এবং ফণী ইত্যাদি। উকার পরে থাকলেও প্রথম অক্ষরবর্তী স্বরবর্ণের এরূপ বিকার ঘটে। যেমন– কল এবং কলু, সর এবং সরু, বট এবং বটু ইত্যাদি। পরবর্তী বর্ণে যফলা থাকলে পূর্ববতী প্রথম অক্ষরের অকার পরিবর্তিত হয়। যেমন– গণ-গণ্য, পথ-পথ্য। তাঁর মতে, যফলা মূলত ইকার এবং অকারের সংযোগমাত্র। তাই একে পূর্ব নিয়মের অন্তর্গত করা যেতে পারে। ঋফলা বিশিষ্ট বর্ণ পরে এলে তার পূর্বের অকার 'ও' হয়। যেমন– কর্তা-কর্তৃ, ভর্তা-ভর্তৃ ইত্যাদি। বাংলায় ঋফলা উচ্চারণে ই-কার যোগ করা হয় বলে একেও পূর্ব নিয়মের শাখারূপে গণ্য করা যায়। ক্ষ-ও পূর্বের অ ও হয়ে যায়; যেমন: কক্ষ, পক্ষ, লক্ষ ইত্যাদি। এই প্রবন্ধের শেষে তিনি বলেন:

> দেখা যাইতেছে ও-স্বরবর্ণের প্রতি বাংলা উচ্চারণের কিছু বিশেষ ঝোঁক আছে। প্রথমত, আমরা সংস্কৃত অ-র বিশুদ্ধ উচ্চারণ রক্ষা করি নাই। আমাদের অ সংস্কৃত অ এবং ও-র মধ্যবর্তী। তাহার পরে আবার সামান্য ছুতা পাইলেই আমাদের অ সম্পূর্ণ ও হইয়া দাঁড়ায়। কতকগুলি স্বরবর্ণ আছে যাহাকে সন্ধিস্বর বলা যাইতে পারে; যেমন অ এবং উ-র মধ্যপথে-ও,অ এবং ই-র সেতুরূপ এ; যখন এক পক্ষে ই অথবা এ এবং অপর পক্ষে আ, তখন অ্যা তাহাদের মধ্যে বিরোধভঞ্জন করে। [১৪]

সংস্কৃত ভাষায় 'ক্ত' প্রত্যয়যোগে যেসব বিশেষণ পদ নিষ্পন্ন হয়, বাংলায় তা প্রায়ই আকারান্ত বিশেষণ পদে পরিণত হয়। যেমন–ছিন্ন থেকে ছেঁড়া।

বীম্‌স্ সাহেব বলেন যে, চলিত কথায় 'আ' স্বরের পর 'ঈ' স্বর থাকলে উভয়ে সংকুচিত হয়ে 'এ' হয়ে যায়। যেমন– খাইতে- খেতে, পাইতে- পেতে ইত্যাদি। তবে, 'হ' আশ্রয় করে যে ইকারগুলো আছে তার বল অধিক হওয়ায় বহিতে, সহিতে, কহিতে শব্দের ইকার বইতে, সইতে, কইতে শব্দের মধ্যে টিকে যায়। রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, বীম্‌সের এই নিয়ম দুই অক্ষরের কথায় খাটে না। হাতি শব্দে কোন পরিবর্তন হয় না।

'এ' স্বরবর্ণের উচ্চারণ বৈচিত্র্য সম্বন্ধে বীম্‌স্ সাহেবের মতামতের বিপরীতে রবীন্দ্রনাথ বলেন, যেসব ক্রিয়াপদের আরম্ভ শব্দে ই-কার আছে, তারা ই-কারের পরিবর্তে এ-কার গ্রহণ করলে এ-কারের উচ্চারণ বিশুদ্ধ থাকে। অর্থাৎ ই যখন এ হয় তখন তার উচ্চারণ সংবৃত হয় না, অবিকৃতই থাকে। যেমন– গিলন- গেলা, লিখন– লেখা, শিখন– শেখা ইত্যাদি। অন্য সর্বত্রই এ-কারের উচ্চারণ 'এ্যা' হয়ে যায়। বিশেষ করে যে-সব শব্দের আদ্যাক্ষরের স্বর এ বা ই থেকে হয়নি তাদের উচ্চারণ বিকৃত বা এ্যা হয়ে যায়। যথা– খেলন– খেলা, ঠেলন– ঠেলা, দেখন– দেখা ইত্যাদি। তিনি বলেন:

> গোড়ায় যেখানে ই থাকে সেটা হয় এ, গোড়ায় যেখানে এ থাকে সেটা হয় অ্যা, গোড়ায় কোথায় ই আছে, তা ই-তে প্রত্যয়ের দ্বারা ধরা পড়ে; যথা, গিলিতে, মিলিতে, লিখিতে, শিখিতে, মিটিতে, পিটিতে, অন্যত্র, খেলিতে, ঠেলিতে, দেখিতে, ঠেকিতে, বেঁকিতে, হেলিতে, ইত্যাদি। [১৫]

'স্বরবর্ণ এ' নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন বাংলায় 'এ' স্বরবর্ণ আদ্যাক্ষররূপে ব্যবহৃত হলে তার দু'রকম উচ্চারণ দেখা যায়। একটি বিশুদ্ধ এ, আর একটি অ্যা। যেমন– এক(এ্যাক), একুশ। একারের বিকৃত উচ্চারণ বাংলায় অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায় তবে, পরে ই কার অথবা উ কার থাকলে তার পূর্ববর্তী এ কারের কখনোই বিকৃতি হয় না। যেমন– জেঠা- জেঠী, বেটা-বেটী ইত্যাদি। এ নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম আছে বলে তিনি মনে করেন না।

কিন্তু এ-কারের বিকার কোথায় হবে তার নিশ্চিত কোনো নিয়ম বের করা তিনি কঠিন বলে মনে করেন। কেননা, অনেক স্থলে দেখা যায় অবিকল একইরকম প্রয়োগে 'এ' কোথাও বিকৃত কোথাও বা অবিকৃত দেখা যায়। যেমন– তেলা এবং বেলা। তাঁর মতে, পরে অ-কারান্ত ব বিসর্গ শব্দ থাকলে অধিকাংশ স্থলে পূর্ববর্তী এ-কারের কোনো পরিবর্তন হয় না। যেমন– কেশ, বেশ, পেট, হেট, বেল, তেল, তেজ, শেজ, খেদ, বেদ, প্রেম, হেম ইত্যাদি। তবে দন্ত্য ন-এর পূর্বে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। যেমন– ফেন (ভাতের), কেন,যেন ইত্যাদি। মূর্ধন্য ণ-এর পূর্বেও হয়তো এই নিয়ম খাটে, কিন্তু প্রচলিত বাংলায় তার কোনো উদাহরণ পাওয়া যায় না। ন অক্ষরের পূর্ববর্তী অ-কারেরও বিকৃত উচ্চারণ হয়। যেমন– বন, মন, জন ইত্যাদি। এ বিষয়ে যুক্তিটি স্পষ্ট হবে বলে তিনি বট, মঠ, জল প্রভৃতি শব্দের সাথে উক্ত শব্দগুলোর তুলনা করেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলায় প্রচলিত দুই শ্রেণীর শব্দ দ্বিগুণীকরণ প্রথার কথা বলেন। যেমন–

১। বিশেষণ ও অসমাপিকা ক্রিয়াপদ; যথা, বড়ো-বড়ো, ছোটো-ছোটো নেচে-নেচে, গেয়ে-গেয়ে, হেসে-হেসে ইত্যাদি।

২। শব্দানুকরণমূলক বর্ণনাসূচক ক্রিয়ার বিশেষণ। যথা– প্যাট প্যাট, টী টী, খিট মিট ইত্যাদি। ক্রিয়াপদজাত বিশেষ্য শব্দের প্রথম অক্ষরাবর্তী উচ্চারণভেদ (যথা: খেলা এবং গেলা) লক্ষ্য করে তিনি স্থির করেন যে, সংস্কৃত মূলশব্দের ই-কারের অপভ্রংশ বাংলায় যেখানে 'এ' হয় সেখানে বিশুদ্ধ 'এ' উচ্চারণ থাকে। খেলন থেকে খেলা হয়, কিন্তু গেলা (গলাধঃকরণ) যেহেতু গিলন থেকে তাই 'এ' অবিকৃত থাকে।

তেমনি মিলন থেকে মেলা (মিলিত হওয়া), মিশ্রণ থেকে মেশা। এর ব্যতিক্রমের কথাও তিনি বলেন। যেমন– বিক্রয় থেকে বেচা, সিঞ্চন থেকে সেঁচা, চিৎকার থেকে চেঁচানো ইত্যাদি। তাঁর মতে, চ অক্ষরের পূর্বে এ-কার উচ্চারণের বিকার ঘটে। তাই জ চ-এর পূর্বে তাঁর শেষোক্ত নিয়মটি খাটেনি। এ ধরনের শব্দ সম্বন্ধে যে সর্বব্যাপী নিয়মের কথা তিনি বলেন তা হলো–

যে সকল অসমাপিকা ক্রিয়া (র) আদ্যক্ষরে ই সংযুক্ত থাকে, বিশেষ্যরূপ ধারণকালে তাহাদের সেই ইকার একারে বিকৃত হইবে, এবং অসমাপিকারূপে অ্যাকারে পরিণত হইবে। যথা;

অসমাপিকা ক্রিয়ারূপে	বিশেষ্য রূপে
কিনিয়া	কেনা
বেচিয়া	ব্যাচা
মিলিয়া	মেলা
ঠেলিয়া	ঠ্যালা
লিখিয়া	লেখা
দেখিয়া	দ্যাখা
হেলিয়া	হ্যালা
গিলিয়া	গেলা [১৬]

তবে উক্ত অসমাপিকা ক্রিয়াবাচক শব্দগুলো চলিত রূপে যথাক্রমে কিনে, বেচে, মিলে, ঠেলে, লিখে, দেখে, হেলে, গিলে হয়ে যায়।

এ নিয়মের কোথাও ব্যতিক্রম পাওয়া যাবে না বলেই তিনি মনে করেন। 'য' ফলার উচ্চারণ বৈচিত্র্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, কেবল 'ব' এর সাথে 'য' ফলা যোগেই উচ্চারণ বৈচিত্র্য ঘটে না, অন্যান্য বর্ণের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য হয়। যেমন–

> ব্যবহার শব্দের ব্য এবং ত্যক্ত শব্দের ত্য উভয়েই য ফলার স্থলে য ফলা-আকার উচারণ হয়। ইকারের পূর্বে য ফলার উচ্চারণ এ হইয়া যায়, ব্যক্তি এবং ব্যতীত তাহার দৃষ্টান্ত। নব্য ভব্য প্রভৃতি মধ্য বা শেষাক্ষরবর্তী য ফলা আশ্রয় বর্ণকে দ্বিখণ্ডিত করে মাত্র। ইকারের পূর্বে য ফলা যেমন এ কার হইয়া যায়, তেমনি ক্ষও একার গ্রহণ করে; যেমন-ক্ষতি ....। [১৭]

'বাংলা শব্দদৈত' নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন, বাংলায় শব্দদ্বৈতর প্রাদুর্ভাব যত বেশি, অন্য আর্যভাষায় তত নয়। তাঁর মতে– বাংলা শব্দদ্বৈতের বিধিও বিচিত্র; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংস্কৃত ভাষায় তার তুলনা পাওয়া যায় না। অজস্র দ্বৈতশব্দের উদাহরণ দিয়ে তিনি সেগুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন–

১। পুনরাবৃত্তিবাচক – বারে বারে, পথে পথে, ঘরে ঘরে, কথায় কথায়, ঘণ্টায় ঘণ্টায় ইত্যাদি।

২। পরস্পর সংযোগবাচক – মুখে মুখে, চোখে চোখে, মানুষে মানুষে ইত্যাদি।

৩। নিয়তবর্তিতাবাচক – এ ধরনের শব্দগুলোতে সর্বদা লেগে থাকার ভাব ব্যক্ত হয়। যেমন- সঙ্গে সঙ্গে, আগে আগে, পাশে পাশে, পিছনে পিছনে, মনে মনে, তলে তলে, পেটে পেটে, ভিতরে ভিতরে, বাইরে বাইরে, উপরে উপরে ইত্যাদি।

৪। দীর্ঘকালীনতাবাচক – চলিতে চলিতে, হাসিতে হাসিতে, চলিয়া চলিয়া, হাসিয়া হাসিয়া ইত্যাদি।

৫। বিভক্ত বহুলতাবাচক – অন্য অন্য, অনেক অনেক, নূতন নূতন, ঘন ঘন, টুকরা টুকরা ইত্যাদি। নূতন নূতন কাপড়, বললে প্রত্যেক নূতন কাপড়কে পৃথক করে দেখা হয়। অনেক অনেক লোক বললে, লোকগুলোকে অংশে অংশে ভাগ করা হয়, কিন্তু শুধু 'অনেক লোক' বললে নিরবচ্ছিন্ন বহু লোক বোঝায়।

বাংলা অনেকগুলো শব্দদ্বৈত দ্বিধা, ঈষদুনতা, মৃদুতা, অসম্পূর্ণতার ভাব ব্যক্ত করে। যেমন– যাব যাব, উঠি উঠি, মেঘ মেঘ, জ্বর জ্বর, শীত শীত, মর মর, পড়ো পড়ো, ভরা ভরা, ফাঁকা ফাঁকা, ভিজে ভিজে, ভাসা ভাসা, কাঁদো কাঁদো, হাসি হাসি ইত্যাদি।

> মানে মানে, ভাগ্যে ভাগ্যে শব্দের মধ্যেও এই ঈষদুনতার ভাব আছে। মানে মানে পলায়ন, অর্থে– মান প্রায় প্রায় যায় যায় করিয়া পলায়ন। ভাগ্যে ভাগ্যে রক্ষা পাওয়া অর্থাৎ যেটুকু ভাগ্যসূত্রে রক্ষা পাওয়া গেছে তাহা অতি ক্ষীণ। [১৮]

ঘোড়া ঘোড়া (খেলা), চোর চোর (খেলা) যেহেতু সত্যিকার ঘোড়া বা চোর নয়, তাদের নকল করে খেলা তাই এগুলোও ওই জাতীয়। তাঁর মতে, এরকম ঈষদুনত্বসূচক অসম্পূর্ণতাবাচক শব্দদ্বৈত অন্য আর্য ভাষায় দেখা যায় না। তবে ফরাসি ভাষায় একপ্রকার শব্দের ব্যবহার আছে যার সাথে এর কিছুটা তুলনা করা যায়। আর একরকম বিকৃত শব্দদ্বৈত বাংলায় চলিত আছে, যা অনির্দিষ্ট-প্রভৃতি বাচক। যেমন- জল-টল, পয়সা-টয়সা। জল-টল বললে জলের সঙ্গে সঙ্গে আরো যে ক'টা আনুষঙ্গিক জিনিস শ্রোতার মনে উদয় হতে পারে তা সংক্ষেপে সেরে নেয়া যায়। এ ধরনের শব্দ ভারতীয় অন্য অনেক আর্য ভাষায় আছে বলে তিনি মনে করেন– বোঁচকা-বুঁচকি, দড়া-দড়ি, গোলা-গুলি, কাপড়-চোপড়– এগুলো প্রভৃতিবাচক হলেও তাঁর মতে এগুলো পূর্বোক্ত শ্রেণীর চেয়ে নির্দিষ্টতর। কেননা, বোঁচকা-বুঁচকি বললে ছোটো বড়ো মাঝারি একজাতীয় নানাপ্রকার বোঁচকা বোঝায়, অন্য কিছু বোঝায় না।

'ধ্বন্যাত্মক শব্দ' নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, বাংলা ভাষায় একশ্রেণীর বর্ণনাসূচক শব্দ বিশেষণ ও ক্রিয়ার বিশেষণরূপে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যারা অভিধানে স্থান পায়নি। অথচ সে-সব শব্দ ভাষা থেকে বাদ দিলে বাংলা ভাষার বর্ণনাশক্তি পঙ্গু হয়ে পড়ে। এরকম শব্দ বিশেষের দীর্ঘ তালিকা করেন তিনি। তাঁর সে তালিকা থেকে কিছু শব্দের উল্লেখ করা হল– আনচান, আমতা আমতা, উসখুস, কচকচ, কচর-কচর, কচমচ, কচর-মচর, কটকট, কটমট, কটর-মটর, কড়মড়, কিলবিলে, কুচকুচে, ক্যাঁক্যাঁ, কোঁকোঁ, ক্যাঁচক্যাঁচ, কচকচে, কটমটে, কড়কড়ে, কনকনে, কিটকিটে, কিরকিরে, খচখচ, খচমচ, খটখট, খটরমটর, খটখটে, খরখরে, খিটখিট, খুকখুক, খ্যাঁচখ্যাঁচ, খুঁৎখুঁতে, খুসখুসে, খ্যাঁকখ্যাঁক, খ্যাঁচরখ্যাঁচর, খ্যানখ্যান, গজগজ, গজর-গজর, গটগট, গদগদ, গপগপ, গবাগব, গমগম,গরগর, গড়গড়, গনগন, গিজগিজ, গিসগিস, গুনগুন, গুমগুম, গুরগুর,

গোঁগোঁ, গোঁৎগোঁৎ, গনগনে, গমগমে, ঘটঘট, ঘটর-ঘটর, ঘসঘস, ঘুটঘুট,ঘুটমুট, ঘুরঘুর, ঘেউঘেউ, ঘিনঘিন, ঘ্যানঘ্যান, ঘ্যানর-ঘ্যানর, ঘুরঘুরে, ঘুসঘুসে, ঘ্যানঘেনে, চকচক, চকমক, চটচট, চটপট, চনচন, চপচপ, চিঁচিঁ, চিড়বিড়, চিনচিন, চিকচিক, চিকমিক, চুকচুক, চোঁচোঁ, চ্যাভ্যাঁ, ছটফট, ছপছপ, ছোঁছোঁ, ছটফটে, ছিপছিপে, জরজর, জ্যালজ্যাল, জবজবে, জিরজিরে, ঝকমক, ঝটপট, ঝমঝম, ঝরঝর, ঝাঁঝাঁ, ঝিকঝিক, ঝিকমিক, ঝিরঝির, ঝুনঝুন, ঝুপঝুপ, ঝুমঝুম, ঝকঝকে, ঝরঝরে, ঝিকঝিকে, টকটক, টকাটক, টংটং, টনটন, টপটপ, টপাটপ, টলটল, টলমল টসটসে, টিকটিক, টিংটিং, টিংটিঙে, টলটলে, টুকটুকে, টুপটাপ, ঠকঠক, ঠংঠং, ঠুকঠুক, ঠকাঠক, ঠনঠনে, ডগডগে, ডিগডিগে, ঢকঢক, ঢলঢল, ঢকঢকে, ঢলঢলে, ঢুলঢুল, তকতক, তরতর, তুলতুল, তিড়িংতিড়িং, তকতকে, তুলতুলে, থপথপ, থমথম, থলথল, থকথকে, দপদপ, দমদম,দমাদ্দম, দরদর দাউদাউ, দুপদাপ, দুমদুম, দুমদাম দগদগে, ধকধক, ধড়াসধড়াস, ধড়ফড়, ধড়মড়, ধবধব, ধিকিধিকি, ধুকধুক, ধুমধাম,ধুপধাপ, ধবধবে, নড়বড়, নিশপিশ, নড়বড়ে, পটপট, পটাপট, পচপচ, পটাসপটাস, পিলপিল, প্যানপ্যান, পিটপিটে, প্যাঁচপেঁচে, ফটফট, ফিনফিন, ফুটফুটে, ফুরফুর, ফুসফাস, ফোঁসফোঁস, ফ্যাঁচফ্যাঁচ, ফ্যাঁচরফ্যাঁচর, ফ্যালফ্যাল, ফিনফিনে, বকবক, বকরবকর, বনবন, বিড়বিড়, ভকভক, ভড়ভড়, ভনভন, ভোঁভোঁ, ভ্যাঁভ্যাঁ, ম্যাড়ম্যাড়, ম্যাজম্যাজ, মড়মড়ে, হড়হড়, হনহন, হাউমাউ, হাঁসফাঁস, হিড়হিড়, হুড়মুড়।

ধ্বনির অনুকরণে ধ্বনির বর্ণনা ইংরেজি ভাষাতেও আছে কিন্তু বাংলা ভাষার সাথে তুলনায় তা খুবই সামান্য। তাঁর মতে, বাংলা ভাষার একটি অদ্ভুত বিশেষত্ব হচ্ছে, যেসব অনুভূতি শ্রুতিগ্রাহ্য নয়, আমরা তাকে ধ্বনিরূপে বর্ণনা করে থাকি। তিনি উল্লিখিত তালিকাভুক্ত শব্দগুলোকে অর্থবদ্ধ শব্দ না বলে ধ্বনিই বলতে চান। তিনি বলেন–

> সৈন্যদলের পশ্চাতে যেমন একদল আনুযাত্রিক থাকে, তাহারা রীতিমত সৈন্য নহে অথচ সৈন্যদের নানাবিধ প্রয়োজন সরবরাহ করে, ইহারাও বাংলাভাষার পশ্চাতে সেইরূপ ঝাঁকে ঝাঁকে ফিরিয়া সহস্র কর্ম করিয়া থাকে, অথচ রীতিমত শব্দশ্রেণীতে ভরতি হইয়া অভিধানকারের নিকট সম্মান প্রাপ্ত হয় নাই। ইহারা অত্যন্ত কাজের অথচ অখ্যাত অবজ্ঞাত। ইহারা না থাকিলে বাংলাভাষার বর্ণনার পাঠ একেবারে উঠাইয়া দিতে হয়।[১৯]

রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, গতির দ্রুততা চক্ষু ইন্দ্রিয়ের বিষয় হলেও আমরা ধাঁ করে, সাঁ করে, ভোঁ করে চলে গেল বললে যেন তীর প্রভৃতি দ্রুতগামী পদার্থ বাতাসে উক্তরূপ ধ্বনি করে, আর সেই ধ্বনিকে আশ্রয় করে বাংলাভাষা চকিতের মধ্যে তীরের উপমা মনে আনয়ন করে। 'তীরবেগে চলে গেল', বললে প্রথমে অর্থবোধ ও পরে কল্পনাকে সে অব্যবহিত ভাবে ঠেলা দিয়ে উপস্থিত করে। তাঁর মতে, এর আর একটা সুবিধা এই যে, ধ্বনিবৈচিত্র্য এত সহজ বর্ণবৈচিত্র্যের অবতারণা করতে পারে যে, তা অর্থবদ্ধ শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। সাঁ

করে গেল, এবং গটগট করে গেল, উভয়েই দ্রুতগতি প্রকাশ করছে; অথচ উভয়ের মধ্যে যে-পার্থক্য আছে, তা অন্য উপায়ে প্রকাশ করতে গেলে হতাশ হতে হয়। যেসব ছবি ধ্বনির সাথে দূর সম্পর্কবিশিষ্ট, তা-ও বাংলা ভাষায় ধ্বন্যাত্মক শব্দে ব্যক্ত করা সম্ভব। যেমন– পাতলা জিনিসকে ফিনফিন ফুরফুর ধ্বনির দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। ধ্বনির সাথে যেসব ভাবের দূর সম্বন্ধও নাই, তা-ও বাংলায় ধ্বনির দ্বারা ব্যক্ত হয়। যেমন: কনকনে শীত। আমরা শরীরের প্রায় সর্বপ্রকার বেদনাকেই বিশেষ বিশেষ ধ্বনির ভাষায় ব্যক্ত করি। যেমন– কুটকুট, চিনচিন, ছমছম, ঝিনঝিন, ম্যাজম্যাজ, সুড়সুড় ইত্যাদি।

সবরকম শূন্যতা, স্তব্ধতা, এমন কি, নিঃশব্দতাকেও আমরা ধ্বনির দ্বারা ব্যক্ত করি। আমাদের ভাষায় শূন্য ঘর খাঁ খাঁ করে, রোদের স্তব্ধতা ঝাঁ ঝাঁ করে, শূন্য মাঠ ধু ধু করে, শূন্য হৃদয় হু হু করে এ সব নিঃশব্দতার ধ্বনি অন্যভাষীদের কাছে যেমনই হোক, আমাদের কাছে খুবই স্পষ্ট ভাববহ। এই ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলোর সীমা অর্থাৎ কোন্ কোন্ বিশেষজাতীয় ছবি ও ভাব প্রকাশের জন্য এরা নিযুক্ত তা লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য:

> প্রথমত ইহাদিগকে স্থাবর এবং জঙ্গমে একটা মোটা বিভাগ করা যায়, অর্থাৎ স্থিতিবাচক এবং গতিবাচক শব্দগুলিকে স্বতন্ত্র করা যাইতে পারে। স্থিতিবাচক শব্দ অতি অল্প। কেবল শূন্যতাপ্রকাশক শব্দগুলিকে ঐ দলে ধরা যাইতে পারে; যথা, মাঠ ধু ধু করিতেছে, অথবা রেদ্রৈ ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। এই ধু ধু এবং ঝাঁ ঝাঁ ভাবের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম স্পন্দনের ভাব আছে বলিয়াই তাহারা এই ধ্বন্যাত্মক শব্দের দলে মিশিতে পারিয়াছে।[২০]

তিনি বলেন যে, স্থিতিবাচক শব্দ অধিকাংশই অর্থাত্মক। গতিবোধ এবং বেদনাবোধ স্থিতিবোধ অপেক্ষা অধিকতর অনির্বচনীয়। তা বুঝতে হলে বর্ণনা ছেড়ে সংকেতের সাহায্য নিতে হয়। ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলো সংকেত। তাঁর মতে–

> গদ্য ও পদ্যের প্রভেদ এই কারণমূলক। গদ্য জ্ঞান লইয় এবং পদ্য অনুভব লইয়া বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্থের সাহায্যে পরিস্ফুট হয়; কিন্তু অনুভব কেবলমাত্র অর্থের দ্বারা ব্যক্ত হয় না, তাহার জন্য ছন্দের ধ্বনি চাই; সেই ধ্বনি অনির্বচনীয়কে সংকেতে প্রকাশ করে।[২১]

রবীন্দ্রনাথের মতে, আমাদের বর্ণনায় যে-অংশ অপেক্ষাকৃত অনির্বচনীয়তর, সেগুলোকে ব্যক্ত করার জন্য বাংলাভাষায় এ-সব অভিধানের আশ্রয়চ্যুত অব্যক্ত ধ্বনি কাজ করে– যা চঞ্চল, যার বিশেষত্ব খুব সূক্ষ্ম, যার অনুভূতি সহজে সুস্পষ্ট হবার নয়, তাদের জন্য এই ধ্বনিগুলো সংকেতের কাজ করছে।

'বাংলা ব্যাকরণে তির্যকরূপ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, কোন্ কোন্ স্থলে বাংলা বিশেষ্যপদ তার সহজরূপ পরিত্যাগ করে। যেমন: ভায়া, কালা, বাদলা ইত্যাদি। বাংলা ভাষার এই রূপকে তিনি মূল শব্দের বিকৃতরূপ বলে তির্যকরূপ নাম দিয়েছেন। কখনও কখনও কর্তৃকারকে এ-কার যোগ হলে যে রূপ হয় তাকে তিনি তির্যকরূপের অন্তর্ভুক্ত করেন। যেমন: পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায়।

তাঁর মতে, বাংলায় নামসংজ্ঞা ছাড়া বিশেষ্য পদ বাচক শব্দমাত্রই সহজ অবস্থায় সামান্য বিশেষ্য। বানর, টেবিল, কলম, ছুরি– এই বিশেষ্য পদগুলো সাধারণভাবেই সমস্ত বানর, টেবিল, কলম, ছুরিকে বোঝায়, কোনো বিশেষ এক বা একাধিক বানর, টেবিল, কলম ছুরিকে বোঝায় না। তাই এগুলো সামান্য বিশেষ্য পদ। এই সামান্য বিশেষ্য পদগুলো জাতিবাচক। এই সামান্য বিশেষ্য পদ জীববাচক হলে তা তখনই তির্যকরূপ গ্রহণ করে। যেমন– বানরে লাফায়। শুধু কর্তৃকারকেই এমন তির্যকরূপের প্রয়োগ দেখা যায়, তবে তারও বিশেষ নিয়ম আছে। নামসংজ্ঞা সম্বন্ধে এ তির্যকরূপ ব্যবহৃত হয় না, কেননা, বিশেষ নাম কখনো সামান্য বিশেষ্য পদ নয়। এ ক্ষেত্রে বাংলায় প্রচলিত একটি প্রবাদবাক্যের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, 'রামে মারলেও মরব, রাবণে মারলেও মরব'। এখানে 'রাম' ও 'রাবণ' বলতে কোন বিশেষ রাম বা রাবণকে বোঝানো হয় নি বরং শব্দ দুটো দিয়ে দুই প্রতিপক্ষকে বোঝানো হয়েছে। তাই শব্দ দুটো তাঁর মতে সামান্য বিশেষ্য পদ। তিনি বলেন যে, তির্যকরূপের মধ্যে সমষ্টিবাচকতা থাকে। যেমন– লোকে বলে। এখানে লোকে অর্থ সর্বসাধারণ। 'বানরে বাগান নষ্ট করেছে' না বলে 'বানর করেছে' বললে বানরদল বোঝায় না। বাংলা ব্যাকরণে বিশেষ বিশেষ্য নামক প্রবন্ধের পাদটীকায় তিনি বলেন:

> বাংলা ব্যাকরণে তির্যকরূপ নামক প্রবন্ধে, বাংলায় বিশেষ বিশেষ স্থলে কর্তৃকারকে একারযোগে যে রূপ হয় তাহাকে তির্যকরূপ নাম দিয়াছিলাম। তাহাতে কোনো পাঠক আপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন ইহাকে বলা উচিত কর্তৃকারকে সপ্তমী বিভক্তি। নাম লইয়া তর্ক নিষ্ফল। না হয় নাই বলিলাম 'তির্যকরূপ' না হয় অন্যকোনো নাম দেওয়া গেল। আমার বক্তব্য এই ছিল যে, কোনো কোনো স্থলে বাংলা বিশেষ্যপদ তাহার সহজরূপ পরিত্যাগ করে। তাহার এই রূপের বিকারকেই অন্যান্য গৌড়ীয় ভাষার সহিত তুলনা করিয়া তির্যকরূপ নাম দিয়াছিলাম। ঘোড়া, কুত্তে প্রভৃতি হিন্দি শব্দই হিন্দি তির্যকরূপের দৃষ্টান্ত; ঘোড়ওয়া কাহারওয়া প্রভৃতি শব্দ নহে– অনন্ত তুলনা মূলক ব্যাকরণবিদগণ শেষোক্তগুলিকে তির্যকরূপের দৃষ্টান্ত বলিয়া ব্যবহার করেন নাই। দ্বিতীয় কথা এই– বাংলা কর্তৃকারকের এ-কার সংযুক্ত রূপকে যদি সংস্কৃত কোনো বিভক্তির নাম দিতেই হয় তবে আমার মতে তাহা সপ্তমী নহে তৃতীয়া। বাংলা 'বাঘে খাইল' বাক্যটি সংস্কৃত 'ব্যাঘ্রেণ খাদিতঃ' বাক্য হইতে উৎপন্ন এমন অনুমান করা যাইতেও পারে। যাহাই হইক এ-সকল অনুমানের কথা। আমার সে প্রবন্ধে আসল কথাটা ব্যাকরণের নাম নহে, ব্যাকরণের নিয়ম। [২২]

নির্দেশক চিহ্নের সাহায্যে সামান্য বিশেষ্যপদ যখন একবচন ও বহুবচন রূপ ধারণ করে তখন সেটি বিশেষ বিশেষ্য। অর্থাৎ বিশেষ পদ একবচন ও বহুবচন রূপ গ্রহণ করলেই সামান্যতা পরিহার করে। তিনি বলেন যে, একটি ঘোড়া বা তিনটি ঘোড়া বললেই ঘোড়া শব্দের জাতিবাচক অর্থ সংকীর্ণ হয়ে আসে তখন বিশেষ এক বা একাধিক ঘোড়া বোঝায়। সুতরাং, তখন তাকে সামান্য বিশেষ্য না বলে বিশেষ বিশেষ্য বলাই উচিত।

নির্দেশক চিহ্ন 'টি' ও 'টা' শব্দের পরেই যুক্ত হয়। ইংরেজীতে 'দি' আর্টিকেল একবচন ও বহুবচন উভয়ক্ষেত্রেই বসে কিন্তু বাংলায় 'টি' 'টা' সংকেতের দ্বারা একটিমাত্র পদার্থকে

বিশিষ্ট করা হয়। যেমন: রাস্তাটা কোন দিকে? তবে ইংরেজিতে 'দি' শব্দের প্রয়োগ যত ব্যাপক বাংলায় 'টি' তেমন নয়। "আমাদের ভাষায় এই প্রয়োগ সম্বন্ধে মিতব্যয়িতা আছে। 'টি' সংকেতটি ছোট আয়তনের ও আদরের জিনিসের ক্ষেত্রে যুক্ত হয় এবং 'টা' বড় বা অবজ্ঞা বা অপ্রিয়তা বোঝাতে শব্দের শেষে যুক্ত হয়। যে পদার্থ সম্বন্ধে আদর বা অনাদর বিছুই বোঝায় না সেক্ষেত্রেও 'টা' প্রয়োগ হয়।" উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে 'ছাতাটি কোথায়' বললে ছাতার প্রতি বক্তার যে যত্ন প্রকাশ পায়,'ছাতাটা কোথায়' বললে যত্ন বা অযত্ন বিছুই বোঝায় না। তাঁর মতে সাধারণত নামসংজ্ঞার সাথে টা, টি বসে না। তবে বিশেষ কারণে ঝোঁক দিতে হলে নামসংজ্ঞার সাথেও টা, টি, বসে না। তবে বিশেষ কারণে ঝোঁক দিতে হলে নামসংজ্ঞার সাথেও নির্দেশক বসে। যেমন, হরিটা বাড়ি গেছে, শ্যামটা ভারি দুষ্টু, শৈলটি ভারি ভালো মেয়ে ইত্যাদি। টি ও টা অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ পদের সাথে বক্তার হৃদয়ের সুর মিশিয়ে দেয়। তবে মান্য ব্যক্তির নাম সমন্ধেও টি বা টা ব্যবহৃত হয় না। এছাড়া 'টি' 'টা' আর কোথায় কোথায় বসে, কোথায় বসে না, ব্যতিক্রম হলে কী হতে পারে, সংখ্যাবাচক শব্দের সাথে যুক্ত হলে কীভাবে তা বিশেষণ পদ হয় ইত্যাদি বিষয়ে সহজ ভঙ্গিতে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা আছে এই প্রবন্ধটিতে। প্রবন্ধের শেষে বক্তব্যটি নিম্নরূপ–

> বলা আবশ্যক সংস্কৃতের অনুকরণ করিতে গিয়া বাংলা লিখিত ভাষায় নির্দেশক সংকেতের ব্যবহার বিরল হইয়াছে। যেহেতু সংস্কৃত রীতির পক্ষপাতী তাহাদের রচনায় ইহা প্রায় পরিত্যক্ত হইয়াছে। যেহেতু বাংলায় বক্তা ইচ্ছা করিলে কোনো একটি বিশেষ্যপদকে বিশেষ ভাবে নির্দেশ করিতেও পারেন নাও করিতে পারেন সেইজন্য ইহাকে বর্জন করা সম্ভব হইয়াছে কিন্তু ভাষায় স্বাভাবিক রীতিকে ত্যাগ করিলে নিশ্চয়ই তাহাকে দুর্বল করা হয়। আধুনিক কালের লেখকগণ মাতৃভাষার সমস্ত স্বকীয় সম্পদগুলিকে অকুণ্ঠিতচিত্তে ব্যবহার করিবার চেষ্টা করিয়া ক্রমশই ভাষাকে প্রাণপূর্ণ ও বেগবান করিয়া তুলিতেছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। [২৩]

এই প্রবন্ধের পাদটীকায় তিনি বলেন:

> এই প্রবন্ধে নির্দেশক নামক একটি নূতন পারিভাষিক ব্যবহার করিয়াছি। পাঠকদের প্রতি আমার নিবেদন, এইরূপ নামকরণ অভাবে ঠেকিয়া দায়ে পড়িয়া করিতে হয়। ইহাদের সম্বন্ধে আমার কোনো মমতা বা অভিমান নাই। এই সকল নামকে উপলক্ষ করিয়া ভাষার মর্মগত সমস্ত নিয়মের আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহার মধ্যে ভুল ও অসম্পূর্ণতা থাকাই সম্ভব। কারণ বাংলা ভাষাকে বাংলা ভাষা বলিয়া গণ্য করিতে তাহার নিয়ম আলোচনা চেষ্টা তেমন করিয়া হয় নাই। পাঠকগণ আমার এই ব্যাকরণ বিষয়ক প্রবন্ধের ভুল সংশোধন ও অভাব পূরণ করিয়া দিলে বিশেষ কৃতজ্ঞ হইব। [২৪]

'বাংলা নির্দেশক' নামক প্রবন্ধে 'খানি' ও 'খানা' 'গাছা' ও 'গাছি' নামক নির্দেশক চিহ্নের ব্যবহার দেখিয়েছেন। 'টুকু' শব্দের ব্যবহার দেখাতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, 'টুকু' শব্দ সংস্কৃত 'তনুক' শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। 'টুকু' স্বল্পতাবাচক। সজীব পদার্থ সম্বন্ধে এর ব্যবহার নেই। ক্ষুদ্রায়তন হলেও এমন পদার্থ সম্বন্ধে ব্যবহার হয় না যার বিশেষ গঠন আছে। উদাহরণ হিসেবে বলেন, ইয়াররিংটুকু বলা যায় না, সোনাটুকু বলা যায়। তাঁর মতে

কেবল যাকে টুকরো করলেও তার বিশেষত্ব যায় না তার সম্বন্ধেই 'টুকু' ব্যবহার করা চলে। কাগজকে টুকরা করলেও তা কাগজ, কাপড়কে টুকরা করলেও তা কাপড়, আবার এক পুকুর জলও জল, এক ফোঁটা জলও জল। তাই কাগজটুকু কাপড়টুকু জলটুকু বলা যায় কিন্তু চৌকিটুকু, খাটটুকু বলা যায় না। অরূপ পদার্থবাচক বিশেষ্য পদে এর ব্যবহার চলে। যেমন, হাওয়াটুকু, কৌশলটুকু, ভারটুকু । প্রবন্ধের শেষাংশে বলা হয়েছে:

> অন্যান্য নির্দেশক চিহ্নের ন্যায় 'এক' বিশেষণ শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ইহা ব্যবহৃত হয় কিন্তু দুই তিন প্রভৃতি অন্য সংখ্যার সহিত ইহার যোগ নাই। দুইটা দুইখানি দাউগাছি হয় কিন্তু দুইটুকু তিনটুকু হয় না।'এক' শব্দের সহিত যোগ হইলে টুকু বিকল্পে টু হয় যথা একটু। অন্যত্র কোথাও এরূপ হয় না। এই একটু শব্দের সহিত খানি যোজনা করা যায় যথা— একটুখানি বা একটুক্‌খানি। এখানে খানা চলে না। অন্যত্র যেখানে টুকু বসিতে পারে সেখানে কোথাও বিকল্পে খানি খানা বসিতে পারে না, কিন্তু টি টা সর্বত্রই বসে। [২৫]

'বাংলা বহুবচন' নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন, নির্দেশক চিহ্ন 'গোটা'রই বহুবচনরূপ 'গুলা' 'গুলো' শব্দযোগে বহুবচনরূপ নিষ্পন্ন করাই বাংলার সাধারণ নিয়ম। বিশেষ ক্ষেত্রে শব্দের সাথে 'রা' 'এরা' যোগ হতে পারে। তবে জীববাচক বিশেষ্যপদ ছাড়া অন্য কোথাও 'রা' 'এরা' ব্যবহৃত হয় না। হলন্ত শব্দের সাথে 'এরা' এবং অন্য স্বরান্ত শব্দের সাথে 'রা' যুক্ত হয়। যেমন— বালকেরা, বধূরা। কথ্যভাষায় 'এরা' চিহ্নের 'এ' লুপ্ত হতে দেখা যায়। যেমন— ছেলেরা, ছাত্ররা ইত্যাদি। ব্যক্তিবাচক বিশেষ্যপদেরও বহুবচনরূপ হয়ে থাকে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কখনও 'গুলা' 'গুলি'র প্রয়োগ হয় না। 'সব' 'সকল' 'সমুদয়' শব্দও বিশেষ্য শব্দের পূর্বে বসে বহুত্ব প্রকাশ করে। সে ক্ষেত্রে এটি সমষ্টিবাচক বিশেষণ হয়ে যায়। 'সব লোক' এবং 'লোকগুলি'র অর্থ এক নয় এটিই তার প্রমাণ।

'অনেক' 'বিস্তর' ইত্যাদি বিশেষণ শব্দ যখন বিশেষ্যপদের পূর্বে বসে তখন তা বিশেষ্যের বহুত্ব প্রকাশ করে। সংখ্যাবাচক বিশেষ্য পূর্বে যুক্ত হলে বিশেষ্যপদ বহুবচন রূপ গ্রহণ করে না। যেমন— চার দিন, তিন জন, দুটো আম ইত্যাদি। গণ, দল, সমূহ, বৃন্দ, মালা, শ্রেণী, পঙক্তি প্রভৃতি শব্দযোগে বিশেষ্যপদ বহুত্ব অর্থ গ্রহণ করে। তবে রবীন্দ্রনাথ এগুলোকে বহুবচনের চিহ্ন বলতে চান না। কারণ প্রথমত এটা সংস্কৃতরীতি বলে অবিকৃত সংস্কৃত শব্দ ছাড়া অন্য কোথাও এদের ব্যবহার নেই, দ্বিতীয়ত এদের সম্বন্ধেও বহুবচনের প্রয়োগ হতে পারে। যেমন— পদাতিক দলেরা। প্রাকৃত বাংলার বহুত্ব প্রকাশক শব্দ ঝাঁক, গোছা, আঁটি ও গ্রাসের কথা তিনি বলেছেন যা সমাসরূপে শব্দের সাথে যুক্ত হয় না। যেমন— পাখির ঝাঁক, চার আঁটি ধান, দুই গ্রাস ভাত। 'পত্র' শব্দযোগে বাংলায় কিছু শব্দ বহুত্ব অর্থ গ্রহণ করে। যেমন— গহনাপত্র, তৈজসপত্র, আসবাবপত্র ইত্যাদি।

পরিমাণ সম্বন্ধীয় বহুত্ব বোঝাবার জন্য বাংলায় শব্দদ্বৈত ঘটে। যেমন– ঝুড়িঝুড়ি, মুঠামুঠা, বস্তাবস্তা ইত্যাদি। তবে এগুলো শুধু আধারবাচক শব্দ সম্বন্ধেই খাটে। মাপ বা ওজন সম্বন্ধে খাটে না। সময় সম্বন্ধেও বহুত্ব অর্থে শব্দেদ্বৈত ঘটে। যেমন– বার বার, দিন দিন ইত্যাদি।

এছাড়া বহুত্ব বোঝাবার জন্য তিনি শব্দের তিন ধরনের সমার্থক শব্দ ব্যবহারের কথা বলেন। যেমন– লোকজন, কাজকর্ম, ছেলেপুলে এগুলো একরকম, যুগ্ম শব্দের দুই অংশের অর্থ এক নয় তবে কাছাকাছি অর্থ প্রকাশ করে এমন দৃষ্টান্ত দেখাতে তিনি দোকানহাট, শাকসবজি, মুটেমজুর ইত্যাদির কথা বলেন। আবার যুগ্ম শব্দের একাংশের কোন অর্থ নেই এমন শব্দের উদাহরণ দিতে কাপড়চোপড়, বাসনকোসন, চাকরবাকর ইত্যাদি শব্দের কথা বলেন। এপ্রসঙ্গে তিনি কথ্য বাংলায় 'ট' অক্ষরের সাহায্যে একধরনের বিকৃত শব্দদ্বৈতের কথা বলেছেন। যেমন– জিনিসটিনিস, ঘোড়াটোড়া ইত্যাদি।

'স্ত্রীলিঙ্গ' নামক প্রবন্ধে তিনি বলেন-

> ভারতবর্ষের অন্যান্য গৌড়ীয় ভাষায় শব্দগুলি অনেক স্থলে বিনা কারণেই স্ত্রী ও পুরুষ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। হিন্দিতে ভোঁ (ভ্রূ) মৃত্যু, আগ (অগ্নি) ধূপ শব্দগুলি স্ত্রীলিঙ্গ। সোনা, রুপা, হীরা, প্রেম, লোভ পুংলিঙ্গ। বাংলা শব্দে এরূপ অকারণ, কাল্পনিক, বা উচ্চারণমূলক স্ত্রী পুরুষ ভেদ নাই। এমনকি অনেক সময় স্বাভাবিক স্ত্রীবাচক শব্দও স্ত্রীলিঙ্গসূচক কোনো প্রত্যয় গ্রহণ করে না। [২৬]

সাধারণত ই ও ঈ প্রত্যয় ও নি এবং নী প্রত্যয় যোগে বাংলায় স্ত্রীলিঙ্গ পদ নিষ্পন্ন হয়। যেমন– কাকা কাকি, মামা মামি, খোকা খুকি, বোষ্টমী, অভাগা, গয়লা গয়লানি, বাঘ বাঘিনী, মালি মালিনী ইত্যাদি।

তাঁর মতে ময়ূর জাতির স্ত্রী পুরুষের মধ্যে দৃশ্যত বিশেষ পাথর্ক্য আছে বলে ভাষায় ময়ূর ময়ূরী ব্যবহৃত হয় কিন্তু চিল সম্বন্ধে এর ব্যবহার নেই। কিছু শব্দ আছে যাদের স্ত্রীলিঙ্গবাচক ও পুংলিঙ্গবাচক রূপ স্বতন্ত্র। যেমন– স্বামী-স্ত্রী, ভাইবোন, বরকনে, সাহেববিবি, ভূতপেত্নী ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের ভাষ্য:

> সংস্কৃত ভাষার মতো বাংলা ভাষায় স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বিশেষণ স্ত্রীলিঙ্গ হয় না। বাংলায় লিখিত বা কথিত ভাষায় সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারকালে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বিশেষণে কখনো কখনো স্ত্রীলিঙ্গ রূপ ব্যবহার হয় কিন্তু ক্রমশ ভাষা যতই সহজ হইতেছে ততই ইহা কমিয়া আসিতেছে। বিষমা বিপদ, পরমা সম্পদ, বা মধুরা ভাষা পরম পণ্ডিতেও বাংলা ভাষায় ব্যবহার করেন না। বিশেষত বিশেষণ যখন বিশেষ্যের পরে ক্রিয়ার সহিত যুক্ত হয় তখন তাহা বর্তমান বাংলায় কখনোই স্ত্রীলিঙ্গ হয় না। অতিক্রান্তা রজনী বলা যাইতে পারে কিন্তু রজনী অতিক্রান্তা হইল, আজকালকার দিনে কেহই লিখে না। [২৭]

কিছু সংস্কৃত শব্দ বাংলায় স্ত্রীপ্রত্যয় গ্রহণকালে সংস্কৃত নিয়ম রক্ষা করে না। যেমন সিংহলী (সিংহী), অধীনী (অধীনা), হংসিনী (হংসী), বিহঙ্গিনী (বিহঙ্গী), ভুজঙ্গিনী (ভুজঙ্গী), হেমাঙ্গিনী (হেমাঙ্গী) ইত্যাদি। তিনি বলেন যে, বিশেষণ শব্দ বাংলায় স্ত্রী প্রত্যয় প্রাপ্ত হয় না তবে বিশেষণপদ বিশেষ্য অর্থ গ্রহণ করলে এ নিয়ম সর্বত্র খাটে না। যেমন– খেঁদী, নেকী ইত্যাদি।

ইয়া প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে ইয়া প্রত্যয় গ্রহণ করে। যেমন– ঘর ভাঙানিয়া (ভাঙ্গানে) ঘর ভাঙ্গানী, মনমাতানিয়া মনমাতানী, কীর্তনিয়া কীর্তনী ইত্যাদি।

তাঁর মতে, হিন্দিতে ক্ষুদ্রতা ও সৌকুমার্য বোধক ই প্রত্যয়যুক্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ বলে গণ্য হলেও বাংলায় ক্ষুদ্রত্ব অর্থে ই প্রত্যয় প্রয়োগ হয়ে থাকে। সে ক্ষেত্রে বৃহত্ত্ব অর্থে আ প্রত্যয়ের প্রয়োগ হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ রকম রূপান্তরে কেবল ক্ষুদ্রত্ত্ব বৃহত্ব ভেদ না বুঝিয়ে দ্রব্যভেদ বুঝায়। যেমন- কোঁড়া (বাঁশের) কুঁড়ি (ফুলের), জাঁতা জাঁতি, বাটা (পানের) বাটি। টা ও টি, গুলা ও গুলি স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ উভয় প্রকার শব্দেই ব্যবহৃত হয়। যেমন– মেয়েগুলো, ছেলেগুলি, বউটা, জামাইটি ইত্যাদি।

'বানান বিভ্রাট' নামক প্রবন্ধে তিনি অব্যয় শব্দ 'কি' এবং সর্বনাম শব্দ 'কী'-এর স্বতন্ত্র সার্থকতার কথা বলেন। তাঁর মতে এদের ভিন্ন বানান না থাকলে অনেক স্থলেই অর্থ বুঝতে বাধা ঘটে। এমনকি, প্রসঙ্গ বিচার করেও বাধা দূর হয় না। এছাড়া প্রশ্নসূচক অব্যয় 'কি' এবং প্রশ্নবাচক সর্বনাম 'কি' উভয়ের এক বানান থাকা উচিত নয়। তাঁর মতে, একটাতে হ্রস্ব ই ও অন্যটাতে দীর্ঘ ঈ দিলে উভয়ের ভিন্ন জাতি এবং ভিন্ন অর্থ বুঝতে সুবিধা হয়। এর উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, 'তুমি কি রাঁধছ', 'তুমি কী রাঁধছ' এ দুটো বাক্যের ব্যঞ্জনা যে স্বতন্ত্র তা বলাই বাহুল্য। এ প্রসঙ্গে তিনি এও বলেন যে প্রশ্ন দুটো এক নয়, অথচ এক বানানে দুই প্রয়োজন সারতে গেলে বানানের খরচ বাঁচিয়ে প্রয়োজনের বিঘ্ন ঘটানো হবে। 'বানান প্রসঙ্গ' নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, যেসব সংস্কৃত শব্দ অপভ্রংশের নিয়মে পুরো বাংলা হয়ে গেছে সেগুলোর ধ্বনি অনুযায়ী বানান হওয়া উচিত। কানাইলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রে তিনি বলেন–

> ভেবে দেখলে বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দ একেবারেই নেই। যাকে তৎসম শব্দ বলি উচ্চারণের বিকারে তাও অপভ্রংশ পদবীতে পড়ে। সংস্কৃত নিয়মে লিখি সত্য কিন্তু বলি শোত্যো। মন শব্দ যে কেবল বিসর্গ বর্জন করেছে তা নয় তার ধ্বনিরূপ বদলে সে হয়েছে মোন। এই যুক্তি অনুসারে বাংলা বানানকে আগাগোড়া ধ্বনি অনুযায়ী করব এমন সাহস আমার নেই– যদি বাংলায় কামাল পাশার পদ পেতুম তা হলে হয়তো এই কীর্তি করতুম এবং সেই পুণ্যে ভাবী কালের অগণ শিশুদের কৃতজ্ঞতাভাজন হতুম। অন্তত তদ্ভব শব্দে যিনি সাহস দেখিয়ে ষত্বণত্ব ও দীর্ঘস্বরের পণ্ডপাণ্ডিত্য ঘুচিয়ে শব্দের ধ্বনি স্বরূপকে শ্রদ্ধা করতে প্রবৃত্ত হবেন তার আমি জয়জয়কার করব। সে পণ্ডিতমূর্খরা 'গভর্ণমেন্ট' বানান প্রচার করতে লজ্জা পান তিনি তাদেরই প্রেতাত্মার দল আজও বাংলা বানানকে শাসন করছেন। [২৮]

'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়' নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, তিনি সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত প্রত্যয়কে সংস্কৃত প্রত্যয় বলার পক্ষপাতী নন। তাঁর মতে, সংস্কৃত ইন্ প্রত্যয় বাংলায় ই প্রত্যয় হয়েছে, সেজন্য তা সংস্কৃত পূর্বপুরুষের প্রথা রক্ষা করে না। বাংলা অন্ত প্রত্যয় শতৃ প্রত্যয় থেকে উৎপন্ন কিন্তু তা শতৃ প্রত্যয়ের অনুশাসন লঙ্ঘন করে একবচনে জিয়ন্ত, ফুটন্ত ইত্যাদি রূপ ধারণ করে। ত প্রত্যয়যোগে সংস্কৃত শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে কিন্তু বাংলায় ত

প্রত্যয়ের ব্যবহার নেই। সেজন্য আমরা রঙিত বলি না। সজ্জিত হয়, সাজিত হয় না। অতএব ত বাংলা প্রত্যয় নয়।

অপরদিকে, সই বাংলা প্রত্যয় না হলেও (হিন্দি বা পারসি) তা বাংলা শব্দের সাথে মিশ্রিত হয়ে প্রমাণসই, মানানসই প্রভৃতি শব্দ তৈরি করেছে। গাড়োয়ান, দারোয়ান, পালোয়ান শব্দ হিন্দি থেকে বাংলায় এসেছে কিন্তু ওয়ান প্রত্যয় বাংলায় নেই। অর্থাৎ যে সব প্রত্যয় সংস্কৃত অথবা বিদেশীয় শব্দসহযোগে বাংলায় এসেছে কিন্তু বাংলার সাথে কোনোরকম আদানপ্রদান নেই, তাকে তিনি বাংলা ব্যাকরণে প্রত্যয়রূপে স্বীকার করেননি। তিনি বলেন–

> শব্দগড়নের কাজে বাংলাতেও কতকগুলো প্রত্যয় পাওয়া যায়। তার একটা দৃষ্টান্ত অন, যার থেকে হয়েছে: চলন বলন গড়ন ভাঙন। এরই সহকারী আ প্রত্যয়, যার থেকে পাওয়া যায় বিশেষ্য পদে: চলা বলা গড়া ভাঙা। এই প্রত্যয়টা বাংলায় সবচেয়ে সাধারণ, প্রায় সব ক্রিয়াতেই এদের জোড়া যায়। এই আ প্রত্যয় বিশেষণেও লাগে, যেমন– ঠেলা গাড়ি, ভাঙা রাস্তা। কিন্তু তি দিয়ে একটা প্রত্যয় আছে যেটা বিশেষভাবে বিশেষণেরই, যেমন: চলতি গাড়ি, কাটতি মাল, ঘাটতি ওজন। [২৯]

আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি প্রচলিত বিভিন্ন প্রত্যয়ের পরিচয় দিয়েছেন এভাবে–

অ প্রত্যয়- এই প্রত্যয়যোগে একশ্রেণীর বিশেষণ শব্দের সৃষ্টি হয়। যেমন– কট্ মট্ শব্দের উত্তর অ প্রত্যয় হয়ে কটমট হয়। তেমনি টল্ মল্ হয় টলমল। আসন্ন প্রবণতা বোঝানোর জন্য শব্দদ্বৈতযোগে যে বিশেষণ হয় তাতেও অ প্রত্যয়ের ভূমিকা আছে। যেমন– পড়্ ধাতু থেকে পড়পড়, মর্ ধাতু থেকে মরমর, কাঁদ্ ধাতু থেকে কাঁদ-কাঁদ ইত্যাদি।

আ প্রত্যয়– আ-কারান্ত বিশেষণগুলো আ প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন বলেই তিনি অনুমান করেন। উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন যে সংস্কৃত শব্দ কাণ, বাংলায় বিশেষণ হবার সময় কানা হয়েছে, তেমনি মৃত হয়েছে মড়া, মহৎ–মোটা, সিত–সাদা হয়েছে।

তিনি বলেন, সংস্কৃত ভাষার 'স্বার্থে ক' বাংলায় আ প্রত্যয়ের আকার ধারণ করেছে। যেমন: ঘোটক–ঘোড়া, মস্তক–মাথা, কণ্টক–কাঁটা, গোপালক–গোয়ালা, কুল্যক–কুলা ইত্যাদি।

বাংলায় অনেক শব্দ আছে যা কখনো স্বার্থে আ প্রত্যয় গ্রহণ করেছে কখনো করেনি। যেমন: তক্ত-তক্তা, বাঘ-বাঘা, ল্যাজ-ল্যাজা, চাঁদ–চাঁদা, থাল–থালা, কালো–কালা, বাদল–বাদলা, পাগল–পাগলা ইত্যাদি।

আ প্রত্যয় অনেকস্থলে অবজ্ঞ বা অতিপরিচয় জ্ঞাপন করতে, বিশেষ করে মানুষের নামের শেষে যুক্ত হয়েছে। যেমন: রাম–রামা, শ্যাম–শ্যামা। তবে সকল নামে যে আ প্রত্যয় হয় না সে কথাও তিনি বলেছেন।

স্বার্থে আ প্রত্যয় যুক্ত হলে অর্থের পরিবর্তন হয় না, আবার আ প্রত্যয়ে অর্থের পরিবর্তন ঘটে এমন উদাহরণও তিনি দিয়েছেন। যেমন: হাত থেকে হাতা, (রন্ধনের হাতা, জামার হাতা অর্থাৎ হাতের মতো পদার্থ), ভাত থেকে ভাতা (খোরাকি), বাস থেকে বাসা ইত্যাদি।

ধাতুর উত্তর আ প্রত্যয়যোগে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বিশেষণ (বাঁধা, ঝরা) তবে বহুমাত্রিক ধাতু বা ক্রিয়াবাচক শব্দের উত্তর আ যুক্ত হয় না। যেমন: আঁচড় আঁচড়া হয় না। শুধু বিশেষণরূপে হতে পারে। যেমন: থ্যাঁৎলা মাংস, কোঁকড়া চুল ইত্যাদি। পদার্থবাচক ও গুণবাচক বিশেষ্য আ প্রত্যয়যোগে হতে পারে। বিশিষ্ট অর্থে আ প্রত্যয় হয়ে থাকে। যেমন– তেল বিশিষ্ট তেলা। তেমনি, বেসুরা, চাপা, রোগা, ইত্যাদি। বৃহৎ অর্থে আ প্রত্যয় যুক্ত হতে পারে।

এভাবে এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আন্ (যোগান, হেলান, মানান) আন+অ (চুলকানো, কামড়ানো, তবে তাকান গড়ান আঁচান প্রভৃতি অনৈমিত্তিক শব্দ সম্বন্ধে তাকা, গড়া, আঁচা না হওয়ার কারণ এগুলোর মূল ধাতু একমাত্রিক নয়। অর্থাৎ উদ্ধৃত শব্দগুলোর মূল ধাতু তাক নয়, তাকা, হেল্ নয় হেলা)। অন (ঝাড়ন, মাজন্ গড়ন, ফোড়ন), অন+আ, (পাওন্ থেকে পাওনা, দেওন্ থেকে দেনা, মাগন্ থেকে মাগনা, তেমনি বাটনা, কুটনা, খেলনা), ই (গোলাপি, চাকরি, মোক্তারি, সাহেবি, হিসাবি, দামি, রাগি, ভারি, মারাঠি, পাঁচই সাতই), আ+ই (বাছাই, মালাই, ঢালাই), ই + আ (জালিয়া-জেলে), উ (চালু, ঢালু, যাদব থেকে যাদু, শিবু), উ+আ (পড়ুয়া- পোড়ো, বনুয়া-বুনো), আ+ও (চড়াও, ঘেরাও), ও+আ (বাঁচোয়া, ঘরোয়া), অন+ই (বহুমাত্রিক, একমাত্রিক উভয় শব্দে অন্ প্রত্যয়ের উত্তর ই হয়। যেমন– কামড়ানি, কাঁপনি, অন্+ই প্রত্যয়সন্ধি অধিকাংশ ক্রিয়াবাচক শব্দই অপ্রিয়ভাব ব্যক্ত করে। যেমন বকুনি, ধম্কানি, হাঁপানি ইত্যাদি), না (পাখনা, ছোটনা), আনা (বাবুয়ানা, মুন্সিয়ানা), ল (হাতল,মাতল), র (বাংলা ধ্বন্যাত্মক শব্দের উত্তর এই র্ প্রত্যয়ে অবিরামতা বুঝায়। যেমন– গজগজ থেকে গজর গজর, বক্ কক্ থেকে বকর বকর), আল্ (দয়াল, কাঙাল, বাচাল) ল+আ (মেঘলা, বাদলা পাতলা), ল+ই+আ (আগলিয়া, ছুটলিয়া), আড় (জাগাড়, সাবাড়, উজাড়), আড়+ই+আ (হাতাড়িয়া, জোগাড়িয়া) রা ও ড়া (টুকরা, চাপড়া), আরি (পূজারি, ভিখারি), আরু (সজারু, দাবাড়ু), ক্ (মড়ক, বৈঠক, আটক), আক্, উক্ -ইক্ (ফুড়ুক, তিড়িক্, তড়াক, ঝিলিক), ক্+আ (মটকা, হালকা), ক্+ই+আ (শুটকিয়া, পুঁচকিয়া), উক্ (মিথ্যুক, লাজুক, মিশুক), গির+ই (গির্ প্রত্যয়টি বাংলায় না চললেও গির প্রত্যয়ের সাথে ই প্রত্যয় মিশে গিরি প্রত্যয় বাংলা ভাষায় স্থান লাভ করেছে।) ব্যবসায় অর্থে ই প্রত্যয় সর্বত্র হয় না। এই গির+ই যোগে অধিকাংশ ব্যবসায় ব্যক্ত হয়। যেমন– মুচিগিরি, কামারগিরি, মুটেগিরি ইত্যাদি।

অনুকরণ অর্থে: (বাবুগিরি, নবাবগিরি) দার (দোকানদার, চৌকিদার) ইত্যাদি। আবার এর সাথে ই প্রত্যয় যুক্ত হয়ে বৃত্তিবাচক বিশেষ্য হয়। যেমন– দোকানদারি, দান (বাতিদান, আতরদান, পিকদান। স্বার্থে ই প্রত্যয়যোগে বাতিদানি, আতরদানি, পিকদানি হয়ে থাকে।), প্রমাণসই, মানানসই, পনা (বুড়াপনা, গিন্নিপনা), ওলা বা ওয়ালা (কাপড়ওয়ালা,

ছাতাওয়ালা), তর (এমনতর, কেমনতর), অৎ (মানৎ, বসৎ, ফেরৎ), অৎ+আ (ফেরতা, পড়তা, জানতা), তা (বিশিষ্ট অর্থে: পানতা, নোনতা, তলতা-তরলতা, তরল বাঁশ। আওতা, নামতা শব্দের ব্যুৎপত্তি বুঝা যায় না।), অৎ+ই (ফিরতি, চলতি, উঠতি, বাড়তি), অৎ+আ+ই (খোলতাই, ধরতাই), অন্ত (জিয়ন্ত, ফুটন্ত, চলন্ত), মন্ত (লক্ষ্মীমন্ত, বুদ্ধিমন্ত), অন্‌দা (এই প্রত্যয়টির পাশে একটি '?' দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত প্রত্যয়টির প্রতি তাঁর অনাস্থাই প্রকাশ করেছেন।) ট্ (চ্যাপটা, ঝাপটা, দাপট), ট+ই (চিমটি), ট্ট (ভরট্ট-নদীভরট্ট, খালভরট্ট জমি), আ+ট (জমাট, ভরাট), টা (চ্যাপটা, ঝাপটা,চিমটা), আট+ই+আ (রোগাটিয়া-রোগাটে, তামাটিয়া-তামাটে, ঘোলাটিয়া ঘোলাটে, ভাড়াটিয়া–ভাড়াটে, বামনটিয়া-বেঁটে), অং আং ইং (ভড়ং ভুজং-ভাজাং চোং-নল, তিড়িং), অঙ্গ আঙ্গ অঙ্গিয়া (সুড়ঙ্গ,সুড়ঙ্গি, কুলাঙ্গি, ধিঙ্গি), চ চা চি (আল্‌গচ, ভ্যাংচা, ভাংচি,ঘামাচি। আধার অর্থে; ধুমচি, চিলিমচি। ক্ষুদ্রঅর্থে: ব্যাঙাচি, কঞ্চি, কুচি) অস (খোলস, মুখস), সা (ঝাপসা ভাপসা, চিম্‌সা, পানসা), সা+ইয়া (ফ্যাকাসিয়া- ফ্যাকাসে), আম (অনুকরণ অর্থে: ছেলেমো, পাগলামো, জ্যাঠামো, বাঁদরামো। ভাব অর্থে: মাতলামো, আলসেমো), আম+ই (বুড়ামি, মাতলামি), স্ত্রীলিঙ্গে ই (ছুঁড়ি, ছুকরি, বেটি, খুড়ি), স্ত্রীলিঙ্গে নি প্রত্যয়ের যথাসম্ভব উদাহরণ উল্লেখ করে বলেন–

> প্রত্যয়গুলির মধ্যে পক্ষপাতের ভাব দেখা যায়। তাহারা কেন কয়টিমাত্র শব্দকে বাছিয়া লয়, বাকি সমস্তকেই বর্জন করে, তাহা বুঝা কঠিন। তালিকা সম্পূর্ণ হইলে তাহার নিয়ম আবিষ্কারের আশা করা যাইতে পারে। মন্ত প্রত্যয় কেনই-বা আক্কেল শব্দকে আশ্রয় করিয়া আক্কেলমন্ত হইবে, অথবা চালাকি শব্দের সহযোগে চালাকিমন্ত হইতে পরিল না, তা কে বলিবে। নি যোগে বহুতর বাংলা স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে– কামারনি খোট্টানি ইত্যাদি। কিন্তু বদ্যিনি (বৈদ্য,-স্ত্রী) কেহ তো বলে না; উড়েনি বলে, কিন্তু পঞ্জাবিনি বা শিখিনি বা মগিনি বলে না। বাঘিনি হয়, কিন্তু উটিনি হয় না, কুকুরনি বেড়ালনি হয় না। প্রত্যয়যোগে স্ত্রীলিঙ্গ অনেক স্থলে হয়ই না, সেই কারণে মাদি কুকুর বলিতে হয়। পাঁঠার স্ত্রীলিঙ্গে পাঁঠি হয়, মোষের স্ত্রীলিঙ্গে মোষি হয় না। এ-সমস্ত অনুধাবন করিবার যোগ্য। [৩০]

রবীন্দ্রনাথের মতে, সংস্কৃত প্রত্যয় নিয়ম মেনে চলে, বাংলায় প্রায়ই ফাঁকি দেয়। বেসুর-বিশিষ্টকে বলা হয় 'বেসুরা' (চলতি উচ্চারণ 'বেসুরো'); সুর-বিশিষ্টকে 'সুরা' বলা হয় না। বালি-বিশিষ্টকে বলা হয় 'বেলে' কিন্তু চিনি বিশিষ্টকে 'চিনিয়া' বা 'চিনে' বলা হয় না। তিনি অসংখ্য দৃষ্টান্ত ও যুক্তি প্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে, বাংলাভাষাতে প্রত্যয় আছে, কিন্তু তাদের প্রয়োগ সংকীর্ণ, আর তাদের নিয়ম ও ব্যতিক্রমে পাল্লা চলেছে।

'প্রতিশব্দ' নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, কেবল পরিভাষা নয়, সকলপ্রকার আলোচনাতেই আমরা এমন অনেক কথা পাই যা ইংরেজি ভাষায় প্রচলিত অথচ যার ঠিক প্রতিশব্দ বাংলায় নেই। এই প্রবন্ধেই অন্যত্র তিনি বলেন যে, তর্জমা করার সময় আমরা প্রায় ভুলে যাই যে প্রত্যেক ভাষায় এমন কিছু শব্দ থাকে যার নানা অর্থ আছে। সবসময়

প্রত্যেক শব্দ সুনির্দিষ্ট একটিমাত্র অর্থই যে বহন করে তা নয়। সুতরাং অন্য ভাষায় তার একটিমাত্র প্রতিশব্দ খাড়া করবার চেষ্টা বিপত্তিজনক।

রবীন্দ্রনাথের মতে, ইংরেজি শব্দের তরজমায় আমাদের দাস্যভাব প্রকাশ পায়, যখন একই শব্দের একই প্রতিশব্দ খাড়া করা হয়। উদাহরণ হিসেবে তিনি 'সিম্প্যাথি'র প্রতিশব্দ হিসেবে 'সহানুভূতি' ব্যবহারের কথা বলেন। ইংরেজিতে সিম্প্যাথি কোথাও বা হৃদয়গত কোথাও বা বুদ্ধিগত। কিন্তু সহানুভূতি দিয়েই দুই কাজ চালিয়ে নেয়াকে তিনি কৃপণতা কিংবা হাস্যকর বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন যে, 'এই প্রস্তাবের সঙ্গে আমার সহানুভূতি আছে' বললে মানতে হয় সে প্রস্তাবের অনুভুতি আছে। তাঁর মতে, এ স্থলে বলা যায়, এই প্রস্তাবে আমাদের সম্মতি আছে, কারণ প্রস্তাবের অনুভূতি নেই, তাই তার সাথে সহানুভূতি চলে না। কাজেই বলা যায় একভাষায় যেখানে এক শব্দ দ্বারা নানা অর্থ বোঝায়, অন্য ভাষায় তার একটি প্রতিশব্দ হতেই পারে না।

'ভাষার খেয়াল' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে শব্দের ব্যবহার সম্বন্ধে বলেন যে, কাব্যের বোধশক্তি গদ্যের চেয়ে সূক্ষ্মতর। বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদকে একত্র করে মাইকেল যে নামধাতুর ক্রিয়া সৃষ্টি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাকে দুঃসাহসিক আখ্যা দিয়ে বলেন যে, কবির অধিকারকে তিনি প্রশস্ত রেখেছেন, ভাষার সংকীর্ণ দেউড়ির পাহারাকে তিনি উপেক্ষা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মতে, কাব্যে যেটা সম্ভব গদ্যে সেটা প্রায় অসম্ভব, কেননা, গদ্যটা চলিত কথার বাহন।

এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে তিনি বলেন–

> 'ত্রাস' শব্দটিকে 'ত্রাসিল' ক্রিয়া রূপ দিতে কোনো কবির দ্বিধা নেই কিন্তু 'ভয়' শব্দটাকে 'ভয়িল' করতে ভয় পায় না এমন কবি আজও দেখি নি। তার কারণ ত্রাস শব্দটা চলতি ভাষার সামগ্রী নয়, এইজন্যে ওর সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অসামাজিকতা ডিমক্রাসির খাতির করে। কিন্তু 'ভয়' কথাটা সংস্কৃত হলেও প্রাকৃত বাংলা ওকে দখল করে বসে। এইজন্যে ভয় সম্বন্ধে যে প্রত্যয়টার ব্যবহার বাংলায় নেই তার দরজা বন্ধ।[৩১]

তাঁর মতে- 'বাংলা ভাষা একান্ত আচারনিষ্ঠ। সংস্কৃত বা ইংরেজি ভাষায় প্রত্যয়গুলিতে নিয়মই প্রধান, ব্যতিক্রম অল্প। বাংলা ভাষার প্রত্যয় আচারই প্রধান; নিয়ম ক্ষীণ।'[৩২] 'ভাষার ইঙ্গিত' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন–

> বাংলা ব্যাকরণের কোনো কথা তুলিতে গেলে গোড়াতেই দুই-একটা বিষযে বোঝাপড়া স্পষ্ট করিয়া লইতে হয়। বাংলাভাষা হইতে তাহার বিশুদ্ধ সংস্কৃত অংশকে কোনো মতেই ত্যাগ করা চলে না, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। মানুষকে তাহার বেশভূষা বাদ দিয়া আমরা ভদ্রসমাজে দেখিতে ইচ্ছা করি না। বেশভূষা না হইলে তাহার কাজ চলে না, সে নিষ্ফল হয়; কী আত্মীয়সভায় কী রাজসভায় কী পথে মানুষকে যথোপযুক্ত পরিচ্ছদ ধারণ করিতেই হয়।[৩৩]

রবীন্দ্রনাথ অনেকটা জোর দিয়েই বলেন–

> সংস্কৃত ভাষার যোগ ব্যতীত বাংলার ভদ্রতা রক্ষা হয় না এবং বাংলা তাহার অনেক শোভা ও সফলতা হইতে বঞ্চিত হয়, কিন্তু তবু সংস্কৃত বাংলার অঙ্গ নহে, তাহা তাহার আবরণ, তাহার লজ্জা রক্ষা, তাহার দৈন্য গোপন, তাহার বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনসাধনের বাহ্য উপায়।[৩৪]

এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, 'মানুষের বস্ত্রবিজ্ঞান ও শরীরবিজ্ঞান যেমন একই কথা নহে তেমনই বাংলার সংস্কৃত অংশের ব্যাকরণ এবং নিজ বাংলার ব্যাকরণ এক নহে।'[৩৫] তাঁর মতে, 'বাংলার সংস্কৃত অংশের ব্যাকরণটি কিঞ্চিৎ পরিমাণে পরিবর্তিত সংস্কৃত ব্যাকরণ।'[৩৬] এই প্রবন্ধের অন্যত্র তিনি বলেন–

> বাংলাদেশে প্রচলিত প্রাকৃত ভাষাগুলির একটি তুলনামূলক ব্যাকরণ যদি লিখিত হয়, তবে বাংলাভাষা বাঙালির কাছে ভালো করিয়া পরিচিত হইতে পারে। তাহা হইলে বাংলাভাষার কারক, ক্রিয়া ও অব্যয় প্রভৃতির উৎপত্তি ও পরিণতির নিয়ম অনেকটা সহজে ধরা পড়ে।[৩৭]

এ প্রবন্ধের শেষে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য–

> বৈয়াকরণের যে-সকল গুণ ও বিদ্যা থাকা উচিত তাহা আমার নাই, শিশুকাল হইতে স্বভাবতই আমি ব্যাকরণভীরু; কিন্তু বাংলাভাষাকে তাহার সকল প্রকার মূর্তিতেই আমি আদরের সহিত শ্রদ্ধা করি, এইজন্য তাহার সহিত তন্ন তন্ন করিয়া পরিচয় সাধনে আমি ক্লান্ত বোধ করি। এই চেষ্টার ফলস্বরূপে ভাষার ভাণ্ডার হইতে যাহা কিছু আহরণ করিয়া থাকি, মাঝে মাঝে তাহার এটা ওটা সকলকে দেখাইবার জন্য আনিয়া উপস্থিত করি; ইহাতে ব্যাকরণকে চিরঋণে বদ্ধ করিতেছি বলিয়া স্পর্ধা করি না, ভুলচুক অসম্পূর্ণতাও যথেষ্ট থাকিবে। কিন্তু আমার এই চেষ্টায় কাহারও মনে যদি এরূপ ধারনা হয় যে, প্রাকৃত তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া শ্রদ্ধার সহিত অধ্যবসায়ের সহিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণরচনায় যদি যোগ্য লোকের উৎসাহ বোধ হয়, তাহা হইলে আমার এই বিস্মরণযোগ্য ক্ষণস্থায়ী চেষ্টা সকল সার্থক হইবে।[৩৮]

ভাষা যেহেতু বানানোর বিষয় নয়, গড়ে ওঠার বিষয় তাই ব্যাকরণের বানানো পথে বাংলা ভাষাকে চলবার নির্দেশ দেন যাঁরা, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের উদ্দেশে বলেন–

> অনেক খুঁত আছে তার (অর্থাৎ ভাষার) মধ্যে, নানা স্থানেই সে যুক্তিসঙ্গত নয়। না হোক, তবু সে প্রাণের জিনিস, সমস্ত জাতের প্রাণমনের সঙ্গে সে গেছে এক হয়ে।[৩৯]

ইংরেজ বন্ধুকে বাংলা পড়াবার সময় বাংলা ভাষার উচ্চারণে বিরাজমান বিশৃঙ্খলা দেখে রবীন্দ্রনাথ সেই বিশৃঙ্খলার মধ্যেই যে নিয়ম অনুসন্ধান শুরু করেন তারই সূত্র ধরে একে একে রচিত হয় তাঁর হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বর, স্বরবর্ণ, 'অ', 'এ' উচ্চারণের নিয়ম, 'টা' 'টো' 'টে' (একটা, দুটো, তিনটে)-এর ব্যবহারভেদের কারণ, বাংলা শব্দদ্বৈত, ধ্বন্যাত্মক শব্দ, বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়সহ ভাষা বিষয়ক অসংখ্য প্রবন্ধ। ফলে তাঁর সাহিত্যিক মনের সংস্পর্শে সংস্কৃত ব্যাকরণের আদলে গড়ে ওঠা বাংলা ভাষার নিষ্প্রাণ দেহে ঘটেছে প্রাণের সঞ্চার।

তথ্যনির্দেশ

১. হায়াৎ মামুদ, *রবীন্দ্রনাথঃ কিশোর জীবনী*, প্রতীক প্রকাশন সংস্থা, পঞ্চম প্রকাশ ২০০০, পৃ.৮২
২. রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, *শব্দতত্ত্ব, বীমসের বাংলা ব্যাকরণ*, ঐতিহ্য, প্রকাশকাল ২৯৯৪, পৃ. ৬৩৫
৩. রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষোড়শ খণ্ড, *শব্দতত্ত্ব, ভাষার কথা*, ঐতিহ্য, প্রকাশকাল ২০০৪, পৃ. ৩৫২
৪. রবীন্দ্র-রবনাবলী ত্রয়োদশ খণ্ড, *বাংলাভাষা-পরিচয়*, ঐতিহ্য, প্রকাশকাল ২০০৪, পৃ. ৬১৪
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৫
৬. রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষোড়শ খণ্ড, ভাষার কথা, ঐতিহ্য, প্রাশকাল ২০০৪, পৃ. ৩৫২
৭. রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, শব্দতত্ত্ব, *বীমসের বাংলা ব্যাকরণ*, ঐতিহ্য, প্রকাশকাল ২০০৪, পৃ. ৬৩৫
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৬
৯. প্রাগুক্ত, শব্দতত্ত্ব, বাংলা উচ্চারণ, পৃ. ৬২৫
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২৫
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২৬
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২৭
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২৯
১৪. প্রাগুক্ত, স্বরবর্ণ অ, পৃ. ৬৩০
১৫. প্রাগুক্ত, *বীমসের বাংলা ব্যাকরণ*, পৃ. ৬৩৯
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩১
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৯
১৮. প্রাগুক্ত, বাংলা শব্দদ্বৈত, পৃ.৬৫০
১৯. প্রাগুক্ত, ধ্বন্যাত্মক শব্দ, পৃ. ৬৫৩
২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫৬
২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫৬
২২. রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষোড়শ খণ্ড, শব্দতত্ত্ব, বাংলা ব্যাকরণের বিশেষ বিশেষ্য, ঐতিহ্য, প্রকাশকাল ২০০৪, পৃ. ৩৬৫
২৩. প্রাগুক্ত, বাংলা ব্যাকরণের বিশেষ বিশেষ্য, ঐতিহ্য, প্রকাশকাল ২০০৪, পৃ. ৩৬৮
২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৮
২৫. রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষোড়শ খণ্ড, শব্দতত্ত্ব, বাংলা নির্দেশক, ঐতিহ্য, প্রকাশকাল ২০০৪,পৃ. ৩৭০
২৬. রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, শব্দতত্ত্ব, স্ত্রীলিঙ্গ, ঐতিহ্য, প্রকাশকাল ২০০৪, পৃ. ৩৭৩
২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৪
২৮. রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষোড়শ খণ্ড, শব্দতত্ত্ব, বানান প্রসঙ্গ, ঐতিহ্য, প্রকাশকাল ২০০৪, পৃ. ৪৪২
২৯. রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, বাংলাভাষা-পরিচয়, ঐতিহ্য, প্রকাশকাল ২০০৪, পৃ. ৬৩২
৩০. রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, শব্দতত্ত্ব, বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়, ঐতিহ্য, প্রকাশকাল ২০০৪, পৃ. ৬৬৭
৩১. রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষোড়শ খণ্ড, শব্দতত্ত্ব, ভাষার খেয়াল, ঐতিহ্য, প্রকাশকাল ২০০৪, পৃ. ৪১১
৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১১
৩৩. প্রাগুক্ত, ভাষার ইঙ্গিত, ঐতিহ্য, প্রকাশকাল ২০০৪, পৃ. ৬৬৮
৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬৮
৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬৮
৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬৮
৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬৮
৩৮. প্রগুক্ত, পৃ. ৬৭৬
৩৯. রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, বাংলাভাষা-পরিচয়, ঐতিহ্য, প্রকাশকাল ২০০৪, পৃ. ৬৩২

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, ত্রিংশ খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৯/জুন ২০১২

ভারতীয় শিক্ষা কমিশনে (১৮৮২) নবাব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী ও সৈয়দ আমির হোসাইনের সাক্ষ্য : একটি পর্যালোচনা

মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম*

সারসংক্ষেপ

ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের শাসনব্যবস্থার একটি প্রধান নীতি ছিল এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন ও পুনর্গঠন। এ ক্ষেত্রে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি চার্লস উডের (পরে ভারত সচিব) ডেসপ্যাচ (১৮৫৪) প্রেরণের পর সরকারের পক্ষ থেকে অধিক আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। উড ডেসপ্যাচে শিক্ষার উন্নয়নের বিবিধ প্রস্তাব করা হয়। তারপর ১৮৭১ সালে সরকার ভারতীয় পশ্চাৎপদ মুসলমানদের জন্য বিশেষ শিক্ষানীতি ঘোষণা করেন। ঐ সকল প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক অগ্রগতি পর্যালোচনা, নানা সমস্যা অনুসন্ধান ও সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৮৮২ সালে ব্রিটিশ সরকার ইংরেজ সিভিলিয়ন উইলিয়াম উইলসন হান্টারের নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কমিশন (Report of the Indian Education Commission 1882) গঠন করেন। শিক্ষা কমিশন তখন বাংলাসহ ভারতের ৭টি প্রদেশের শিক্ষাব্যবস্থা বিশেষভাবে তদন্তের জন্য পৃথক কমিটিও গঠন করে। সে পরিপ্রেক্ষিতে হান্টার কমিশনের বাংলা প্রাদেশিক শিক্ষা কমিটি এতদঞ্চলে শিক্ষার সমস্যা এবং এর উত্তরণ ও সুপারিশ গ্রহণের লক্ষ্যে দেশী–বিদেশী অন্তত ৩১ জন শিক্ষিত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করে। তাঁদের মধ্যে তৎকালীন মুসলিম সমাজের কয়েকজন কাণ্ডারী– নবাব আবদুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩), সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৯) ও সৈয়দ আমির হোসাইনের(১৮৪৩-?) প্রদত্ত সাক্ষ্যের বিবরণ ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রধানত তাঁদের সাক্ষ্য ও আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় শিক্ষা কমিশন মুসলিম শিক্ষা বিস্তারে ১৭টি উন্নয়নমূলক সুপারিশ পেশ করেছিল যেগুলোর ভিত্তিতে পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সরকার অনগ্রসর মুসলমানদের জন্য নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ভারতীয় শিক্ষা কমিশনে বাংলার মুসলিম সমাজের উল্লিখিত নেতৃবৃন্দ কর্তৃক সাক্ষ্যের বিবরণ পর্যালোচনা করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

কোন দেশ বা জাতির উন্নয়নে শিক্ষা সংস্কার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সময় ও যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠনও একটি চলমান প্রক্রিয়া। শিক্ষা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও তদন্তের জন্য কমিশন গঠন হচ্ছে সংস্কারের পূর্বশর্ত বা অধ্যায়। শিক্ষার ভবিষ্যৎ নীতি নির্ধারণের জন্য স্বাধীন বাংলাদেশেও মোট ৯টি কমিশন গঠিত হয়েছে। এ অবস্থায় দেশের বর্তমান শিক্ষানীতির সিদ্ধান্ত গ্রহণে অতীতে উপস্থাপিত শিক্ষা কমিশনের পর্যালোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ব্রিটিশ সরকার ১৮১৩ সাল থেকে শিক্ষার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেও ১৮৮২ সালের পূর্বে সমগ্র ভারতব্যাপী কোন শিক্ষা কমিশন প্রস্তুত করেননি।

* সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

সুতরাং ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক গঠিত প্রথম ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের পর্যালোচনা বর্তমান শিক্ষা সংস্কারের প্রেক্ষাপটেও অধিক প্রয়োজনীয় ও গুরুত্ববহ। হান্টার কমিশন ভারতের মুসলিম সমাজের শিক্ষা সমস্যার ওপর বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করেছিল, যার প্রতিফলন ঘটে কমিশনে প্রদত্ত আলোচ্য তিনজন ব্যক্তিত্বের সাক্ষ্য প্রদানে। পরবর্তীকালে সমগ্র ব্রিটিশ আমলে মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষার বিষয়টি দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের আলোচনার অন্যতম প্রধান কেন্দ্রবিন্দু ছিল। এখানে আরো লক্ষণীয় বিষয় যে, মুসলমানদের বিশেষ শিক্ষা তথা 'মাদ্রাসা শিক্ষা'র ভবিষ্যৎ নিয়ে এখনও দেশের বুদ্ধিজীবী এবং সরকারি–বেসরকারি মহলে আলোচনা বিতর্ক অব্যাহত রয়েছে। তাই একশত ত্রিশ বছর পূর্বে বাংলার প্রধান তিন মুসলিম নেতা ধর্মীয় বা মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে কমিশনের নিকট কি বক্তব্য উপস্থাপন করেছিলেন সে বিষয়টিও বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে যা, ধর্মীয় শিক্ষার ওপর চলমান বিতর্কের অবসান ঘটাতে সহায়ক হবে। আলোচিত ব্যক্তিদের মধ্যে বিশেষত আবদুল লতিফ ও আমীর আলীর জীবন ও কর্মের উপর কয়েকটি প্রামাণ্য গ্রন্থ[১] প্রকাশিত হলেও হান্টার কমিশনে উপস্থাপিত তাঁদের সাক্ষ্যের বিস্তারিত বিবরণ তেমন কোথাও বর্ণিত নেই। সৈয়দ আমির হোসাইনের জীবনী সম্পর্কে কোন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। এ ছাড়াও ভারতীয় শিক্ষা কমিশন বাংলা প্রদেশের ৩১ জন ব্যক্তিত্বের সাক্ষ্য গ্রহণ করলেও তাঁদের মধ্যে মুসলিম ছিলেন মাত্র ৩ জন যাঁদেরকে আমরা বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনায় নির্বাচন করেছি। অতএব, নানা দিক ও প্রেক্ষাপট থেকে উপরোক্ত তিন ব্যক্তিত্বের সাক্ষ্যের বিবরণ পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি। আলোচ্য প্রবন্ধটি মূলত সমকালে প্রকাশিত ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কমিটির রিপোর্ট, আলোচিত ব্যক্তিদের রচনাবলি ও অন্যান্য সরকারি–বেসরকারি শিক্ষা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়েছে।

এটি সত্য যে, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের পেছনে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজি জানা একদল ভারতীয়দের দ্বারা প্রশাসনের নিচু পর্যায়ের কাজ সম্পন্ন করা এবং একই সাথে একটি ইংরেজ অনুগত শ্রেণীর সৃষ্টি করা, যারা সর্বদা সরকারের প্রশংসায় নিয়োজিত থাকবে। তবে সরকারি নীতিগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে এদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে একটি উঁচু ধাপের মাত্রা সংযোজনের অভিলাষও কর্তৃপক্ষের ছিল। সরকারের *জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন* (১৮২৩), *কাউন্সিল অব এডুকেশন* (১৮৪২), *ডাইরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন* (১৮৫৪)–এর কার্যাবলির মাধ্যমে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐ সকল কমিটির কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞগণ নানাভাবে সরকারি শিক্ষানীতির প্রয়োগ বা বাস্তবায়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। এর মধ্যে ১৮৫৪ সালে চার্লস উডের প্রেরিত বার্তার[২] পর উপমহাদেশের

শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ছিল বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এর পূর্বে কেবল কলকাতা কেন্দ্রিক মধ্যবিত্তগণই ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু উড ডেসপ্যাচের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল– দেশীয় ও ইংরেজি ভাষা শিক্ষার উন্নতি ও প্রসার। এর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ছিল সমাজের সাধারণ শ্রেণীর মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার ওপর জোর দেয়া, দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, উচ্চ শিক্ষার জন্য কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে তিনটি পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা আর তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, একটি আলাদা 'শিক্ষা বিভাগে'র উপর শিক্ষার প্রশাসনিক দায়িত্ব অর্পণ করা। এর পূর্বে 'শিক্ষা পরিষদ বা কমিটি'র ওপর শিক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব ছিল। উড ডেসপ্যাচে আরও বলা হয় যে, বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ট্রেনিং দেয়ার জন্য প্রশিক্ষণ স্কুল স্থাপন করতে হবে, সরকারি কলেজ ও স্কুলগুলো যথাযথভাবে তদারক করতে হবে এবং প্রয়োজন সাপেক্ষে সেগুলোর সংখ্যা বাড়াতে হবে। মধ্য-স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার কাজে উৎসাহ দেয়ার জন্য 'গ্রান্ট-ইন-এইড' পদ্ধতি প্রবর্তন করতে হবে। ঐ ডেচপ্যাচে প্রাথমিক শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করায় দেশের গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, সেখানে স্বল্পবিত্তের সাধারণ পরিবারের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ার সুযোগ লাভ করে।

অন্যদিকে আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ বাংলার পশ্চাৎপদ মুসলিম সমাজের শিক্ষা বিস্তারে নানা আন্দোলন শুরু করেন। মুসলমানদের শিক্ষার ব্যাপারে ঐ সময়ে ব্রিটিশ সরকারের মনোভাবেরও পরিবর্তন হয় এবং একটি পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের মধ্যে কিভাবে শিক্ষার হার বাড়ানো যায় তার জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যেমন, ১৮৫৪ সালে হিন্দু কলেজকে প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তর, মহসিন তহবিলের টাকায় মাদ্রাসা স্থাপন, মুসলিম ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠা, ছাত্রদের বৃত্তি প্রদান, বিনা বেতনে অধ্যয়ন, জেলা স্কুলগুলোতে ফারসি ভাষার শিক্ষক নিয়োগ ইত্যাদি ব্যবস্থা সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল। হিন্দু কলেজকে প্রেসিডেন্সি কলেজে পরিণত করা হলে সেখানে হিন্দু–মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ছাত্রদের পড়ার সুযোগ হয়; পূর্বে হিন্দু কলেজে মুসলিম ছাত্র ভর্তি হতে পারত না। উল্লেখ্য, এ সকল পদক্ষেপে চার্লস উডের শিক্ষা নীতিরই প্রতিফলন ঘটেছিল। ব্রিটিশ সরকারের উপরোক্ত নানা ব্যবস্থা গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বস্তরের ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রযাত্রা শুরু হয়। বিশেষত পশ্চাৎপদ মুসলমানদের শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহ–উদ্দীপনা বৃদ্ধি এবং সরকারি সহযোগিতার বিষয়টি ছিল উল্লেখযোগ্য। পাশাপাশি অবশ্য দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন তথা ঐ সময়ে পাটচাষ ও পাটের মূল্য বৃদ্ধি হলে তা মুসলিম চাষীদের শিক্ষার উন্নতিতে সহায়ক হয়েছিল। কেননা এই অর্থকরী ফসলের মাধ্যমে বাংলা অঞ্চলের চাষীগণ নগদ অর্থের মুখ দেখতে পান এবং পাটের ক্রমবর্ধমান চাহিদা উত্তর-পূর্ব বাংলার মুসলিম চাষীরাই মিটিয়েছিল, যা তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে

পাঠানোর সুযোগ ও উৎসাহ বৃদ্ধি করেছিল। মুসলমানদের শিক্ষার অগ্রগতি যদিও এক প্রকার প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তৎসত্ত্বেও শিক্ষা পরিদর্শক আবদুল করিম এ প্রসঙ্গে বলেন যে, বিগত দশকে (১৮৭২-১৮৮২) মুসলমানদের শিক্ষায় উৎসাহ ও প্রসার ঘটাতে যে কাজ ও প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে তা আগের অর্ধশতাব্দীর চাইতেও অনেক বেশি।[৩]

সুতরাং, ১৮৫৪ সালের পরবর্তী সিকি শতাব্দীতে ভারতের শিক্ষা পরিস্থিতির অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে সরকার একটি কেন্দ্রীয় শিক্ষা কমিশন গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। সরকার মনে করে, সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭-৫৮) পরবর্তী অবস্থায় কোম্পানির শাসনের অবসান ও ব্রিটিশ রাজের অধীন শিক্ষা ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ নির্ধারণে ১৮৫৪ সাল থেকে বর্তমান অবধি পরিস্থিতির পর্যালোচনা ও অনুসন্ধান খুবই জরুরী। সরকারি–বেসরকারি মহলে তখন দেশের শিক্ষা সংস্কার নিয়ে নানা দাবি উত্থাপিত হয়। এরই ফলে ১৮৮২ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি ভাইসরয় লর্ড রিপন তাঁর আইন পরিষদের অন্যতম সদস্য উইলিয়াম হান্টারকে (১৮৪০-১৯০০) সভাপতি করে ২০ সদস্য বিশিষ্ট একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। এটিই 'ভারতীয় শিক্ষা কমিশন' বা 'হান্টার কমিশন' নামে পরিচিত।[৪] কমিশন তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে ঘোষণা করে:

> Nearly a quarter of a century had since elapsed, and the governor general in council believed that the time had now come for instituting a further and more careful investigation into the existing system, and into the results attained by it, than had hitherto been attempted.[৫]

শিক্ষা কমিশনে বার্মা ও আসাম ব্যতীত ভারতের সকল প্রদেশের ১৪ জন ইংরেজ কর্মকর্তা ও ৬ জন দেশীয় সদস্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। দেশীয় সদস্যদের মধ্যে ২ জন ছিলেন মুসলিম ও ৪ জন হিন্দু।[৬] শিক্ষা কমিশন প্রায় এক বছর সাত মাস যাবৎ ভারতের পেশাগত শিক্ষা ব্যতীত শিক্ষার অন্যান্য সকল স্তর নিয়ে গভীর অনুসন্ধান, পর্যালোচনা ও পরিকল্পনা গ্রহণ করে। অতঃপর ১৮৮৩ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর সরকারের নিকট বিশালাকারে প্রতিবেদন দাখিল করে। মোট ১৩টি অধ্যায়ে ৬৩৯ পৃষ্ঠা সম্বলিত (পরিশিষ্ট ব্যতীত) রিপোর্টটি ছিল ভারতের আধুনিক শিক্ষার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। রিপোর্ট দাখিলের বছরেই (১৮৮৩) সরকারি প্রেস থেকে এটি জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়।

তবে ১৮৮২ সালের শিক্ষা কমিশনের কেন্দ্রীয় কমিটি ছাড়াও ভারতের তৎকালীন সাতটি প্রদেশের[৭] শিক্ষা পরিস্থিতি বিশেষভাবে পর্যালোচনার জন্য পৃথক কমিটি গঠিত হয়েছিল। প্রাদেশিক কমিটির প্রতিবেদনগুলো স্বতন্ত্র আকারে মূল রিপোর্টের এক বছর পর (১৮৮৪) প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে জনশিক্ষা পরিচালক আলফ্রেড ক্রফটের নেতৃত্বে বাংলা প্রাদেশিক

কমিটি গঠন ও এর তদন্ত অনুসন্ধান এবং এ অঞ্চলের শিক্ষা সম্পর্কে প্রতিবেদন[৮] তৈরীর বিষয়টি ছিল খুবই তাৎপর্যবহ। কেননা বাংলা ছিল ব্রিটিশ সরকারের ক্ষমতার কেন্দ্রস্থল এবং এ প্রদেশের মাধ্যমেই ভারতে আধুনিক শিক্ষার প্রবর্তন ঘটেছিল। এই অঞ্চলের শিক্ষা সম্পর্কে সম্যক ধারণালাভ ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করা শুধু এদেশীয় জনগণের ক্ষেত্রেই নয়, ব্রিটিশ সরকারেরও বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

হান্টার কমিশনের বাংলাসহ অন্যান্য প্রাদেশিক কমিটিসমূহ শিক্ষা পরিস্থিতি তদন্তের জন্য প্রধানত ৩টি উৎস গ্রহণ করে:

১. বিভিন্ন অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষ্য গ্রহণ,
২. বিভিন্ন সমিতি বা সংস্থা ও ব্যক্তিত্বের স্মারকলিপি,
৩. কমিটির সদস্য কর্তৃক সরাসরি তথ্য গ্রহণ।

এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা প্রাদেশিক কমিটি শিক্ষা অনুসন্ধানের অন্যতম প্রধান উৎস হিসেবে এ অঞ্চলের ৩১ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করে। এদের মধ্যে ২০ জন ছিলেন ইংরেজ কর্মকর্তা ও শিক্ষাবিদ এবং ১১ জন দেশীয় নেতা ও সমাজবিদ। এই ১১ জনের মধ্যে ৩ জন মুসলিম, ৩ জন খ্রিষ্টান ও ৫ জন ছিলেন হিন্দু।[৯] মুসলমানদের মধ্যে ছিলেন নবাব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী ও সৈয়দ আমির হোসাইন। এ তিনজন ব্যক্তিত্বই ইতিমধ্যে আধুনিক সমাজ গঠনে অংশ নিয়েছিলেন এবং ভারতের শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল যথেষ্ট। বিশেষত পিছিয়ে পড়া মুসলিম সমাজকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে তাঁরা ছিলেন সর্বদা চিন্তাশীল এবং উদ্বিগ্ন। সুতরাং, মুসলিম সমাজের শিক্ষা সম্পর্কে তাঁদের মতামত ও সুপারিশ জানাই ছিল সরকারের উদ্দেশ্য।

শিক্ষা কমিশনের বাংলা প্রাদেশিক কমিটি এ লক্ষ্যে নবাব আবদুল লতিফ, আমীর আলী ও সৈয়দ আমির হোসাইনের নিকট মুসলিম শিক্ষার বাস্তব সমস্যা ও অগ্রগতি বিষয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্ন উত্থাপন করে। তাঁরা সকলেই লিখিত আকারে সে সব প্রশ্নের জবাব কমিশনকে প্রেরণ করেন এবং তাঁদের প্রশ্নোত্তরগুলো কমিশনের প্রাদেশিক কমিটির প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়। শিক্ষা কমিশন আবদুল লতিফের নিকট বাংলার মুসলিম শিক্ষা পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও সুপারিশের জন্য মোট ৪টি প্রশ্ন উত্থাপন করে:[১০]

১. বাংলার মুসলমানদের প্রাথমিক শিক্ষা পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনার মতামত কি? এই শিক্ষার উন্নয়নে আপনার কি পরামর্শ রয়েছে?
২. মুসলিম মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে আপনার অভিমত দয়া করে ব্যাখ্যা করুন এবং এই শিক্ষা বিস্তারে আপনার মন্তব্য কি?

৩. বাংলার মুসলমানদের উচ্চ শিক্ষার ব্যাপারে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন। উচ্চ শিক্ষার উন্নতির জন্য আপনার কী সুপারিশ রয়েছে?

৪. আপনার মতে বাংলা ও বিহারের মুসলমানদের শিক্ষার মাধ্যম কী হওয়া উচিত?

নবাব আবদুল লতিফ হান্টার কমিশনের বাংলা শিক্ষা কমিটির প্রথম প্রশ্নের জবাবে দেশের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে বলেন যে, জনশিক্ষা পরিচালকের ১৮৮০-৮১ সালের প্রতিবেদনের ১০৭ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছিল যে, বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার (এই তিনটি অঞ্চল অবিভক্ত বাংলা প্রদেশভুক্ত ছিল) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ১,৫৬,০৮১ জন, অথচ মুসলমানদের সর্বমোট জনসংখ্যা ২ কোটি ১০ লক্ষের কাছাকাছি। এই তুলনামূলক পরিসংখ্যানের পরিপ্রেক্ষিতে আবদুল লতিফ বলেন যে, বাংলার সাধারণ কৃষক শ্রেণী তথা মুসলমানদের জন্য কোন প্রাথমিক স্কুল নেই এবং তিনি কমিশনকে এ সম্পর্কে বিবেচনার অনুরোধ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি পুনরায় সরকারের ১৮৮১ সালের ১৯ নভেম্বর প্রকাশিত রেজুলেশনের বিবৃতি তুলে ধরে বলেন, সরকার যদিও দেশের প্রাথমিক শিক্ষা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জন্য উপযোগী করে তোলার চেষ্টা করছে এবং মক্তবগুলোকেও সাহায্য প্রদান করে সংস্কারের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, কিন্তু এসব পদক্ষেপ এখনও মুসলমানদের আকর্ষণ করতে পারেনি।

নবাব আবদুল লতিফের মতে, মক্তবে মূলত কোরানিক শিক্ষা প্রদান করা হয় যেগুলোতে নিম্নবিত্তের চেয়ে মধ্যবিত্তের সন্তানেরাই বেশি পড়াশুনা করে। অতএব, এ-সব মক্তবে সরকারি সাহায্য মঞ্জুর হলে মধ্যবিত্তের মাঝে শিক্ষা বিস্তার ও সম্প্রসারণ ঘটবে। কিন্তু নিম্নবিত্ত মুসলমান যাদের মাতৃভাষা বাংলা তারা প্রচলিত পাঠশালায় যেতে আগ্রহী। কিন্তু পাঠশালার শিক্ষা পদ্ধতি ও পাঠ্যপুস্তকে হিন্দু সংস্কৃতির প্রাধান্য বেশি হওয়ায় মুসলমানদের জন্য সেগুলো উপযোগী নয়। এসব পাঠশালার শিক্ষকগণও সাধারণত হিন্দু যাদের নিকট মুসলমান সন্তানরা পড়তে আগ্রহী নয়। নবাব লতিফ এ প্রসঙ্গে উইলিয়াম হান্টারের গ্রন্থের *(The Indian Mussalmans)* একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরেন:

> মুসলমানদের তিনটি প্রধান ভাবাবেগের দরুন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা পদে পদে ব্যর্থ হতে চলেছে। প্রথমত শিক্ষার মাধ্যম যেহেতু বাংলা চালু করা হয়েছে এইজন্য মুসলমানরা এ ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করেন। কেননা, শিক্ষিত এবং সংস্কৃতিবান মুসলিমগণ এটি খুবই অপছন্দ করেন। দ্বিতীয়ত, এই সব স্কুলের শিক্ষকরা প্রায় সকলেই হিন্দু। এসব স্কুলের শিক্ষকরা যখন মুসলমান ছাত্রদের সাথে জোড়াতালি দিয়ে উর্দু বলার চেষ্টা করেন তখন এক হাস্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তৃতীয়ত, হিন্দু শিক্ষকদের ব্যবহার ও শিক্ষা পদ্ধতি মুসলমান ছাত্রদের মনে শ্রদ্ধার চাইতে বরং অশ্রদ্ধার সৃষ্টিই বেশি করে। কিছুদিন পূর্বে একজন মুসলমান কৃষক জনৈক ইংরেজ কর্মকর্তাকে জানায় যে, পৃথিবীর এমন কোন শক্তি নেই যে মুসলমানদেরকে হিন্দু শিক্ষকের কাছে পড়তে বাধ্য করবে।[১১]

আবদুল লতিফ উইলিয়াম হান্টারের ধারণার সাথে একমত পোষণ করে বলেন যে, প্রাথমিক শিক্ষায় পাঠশালার সংস্কৃতঘেঁষা বাংলা ভাষাটি হিন্দু মনন, ধ্যান-ধারণা ও মানসিকতার ফসল। এর পরিবর্তে পাঠশালার ভাষা এমন ধরনের বাংলা হতে হবে, যা সংস্কৃত ও পুঁথি সাহিত্যের মাঝামাঝি পর্যায়ের হবে। কেননা, পুঁথি সাহিত্যে আরবি-ফারসি শব্দ ও প্রবাদ রয়েছে। তা ছাড়াও আইন-আদালত থেকে ফারসি বাদ দিলেও বহু ফারসি বিশেষজ্ঞ বিচারক, কৌঁসুলি ও অন্যান্য কর্মচারী সমাজে বিচরণ করছেন যাদের দৈনন্দিন ব্যবহৃত ভাষায় ফারসির প্রাধান্য রয়েছে। তিনি মনে করেন, আরবি-ফারসি সংমিশ্রণে বাংলাভাষা হিন্দু-মুসলিম উভয়েরই বোধগম্য হবে। তাছাড়াও আবদুল লতিফ প্রাথমিক শিক্ষায় প্রাচীন পদ্ধতিতে অংক শিক্ষার প্রচলন ও সাধারণ পঠন প্রণালীর ওপর জোর দেন।

মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে আবদুল লতিফ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মুসলিম শিক্ষক নিয়োগের দাবি জানান। তিনি ১৮৮০-৮১ সালের শিক্ষা প্রতিবেদন থেকে পরিসংখ্যান উল্লেখ করে বলেন যে, দেশীয় পাঠশালার ট্রেনিং স্কুলগুলোতে ৫৩৭ জন হিন্দু শিক্ষকের বিপরীতে মুসলিম শিক্ষক মাত্র ৩০ জন। এতেই প্রমাণিত হয় যে, বাংলায় মুসলিম শিক্ষকের সংখ্যা খুবই কম। এজন্য তিনি বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানান।

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির উপায় হিসেবে আবদুল লতিফ সরকারের গ্রান্ট-ইন-এইড পদ্ধতির বিস্তারের দাবি জানান। এজন্য 'পাঁচ মাইলের আইন'কে শিথিল করার অনুরোধ করেন যাতে মুসলিম স্কুলগুলো অনুদান লাভ করতে পারে। অর্থাৎ মুসলিম প্রাথমিক স্কুল বা মক্তবগুলোর অবস্থানের ব্যবধান যাই হোক না কেন সরকার যেন সেগুলোর সাহায্যের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেন।

বাংলার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলোর প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য আব্দুল লতিফ সরকারকে একটি পৃথক বিভাগ প্রতিষ্ঠার দাবি জানান, যার মাধ্যমে স্থানীয় দরিদ্র কৃষকদের চালিত স্কুলগুলো উপকৃত হবে। তিনি বলেন, এক সময়ে লর্ড হার্ডিঞ্জ এ ধরনের একটি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন যার মাধ্যমে হিন্দু ছাত্ররা উপকৃত হয়েছিল। হার্ডিঞ্জ স্কুলগুলোতে প্রথমে বিনা পয়সায় ছাত্ররা শিক্ষালাভ করত। একপর্যায়ে তারা যখন শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠত তখন তাদের কাছ থেকে সামান্য বেতন আদায় করা হত। এভাবে কয়েক বছরের মধ্যে একটি সাহায্যপ্রাপ্ত প্রাথমিক স্কুল হাই স্কুলে উন্নীত হত। ফলে বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে শিক্ষার বিস্তার ঘটে। আবদুল লতিফ মনে করেন সরকার যদি পূর্ব বাংলার কৃষক মুসলমানদের জন্য ঐ ধরনের অন্তত ১০টি স্কুল স্থাপন করে প্রচেষ্টা চালাতেন তাহলে তাদের মনোভাব এক পুরুষের আমলেই পরিবর্তিত হত। সুতরাং, তিনি সরকারের দৃষ্টি

সেদিকে আকর্ষণ করেন এবং তিনি মনে করেন এভাবে একটি বিরোধিতা পোষণকারী সম্প্রদায়কে অতি সহজেই অনুগত করা সম্ভব হবে।

আবদুল লতিফ তাঁর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে বিবৃতি প্রদান করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি প্রথমে ১৮৮০-৮১ সালের শিক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোতে হিন্দু-মুসলিম ছাত্রের তুলনামূলক পরিসংখ্যান উপস্থাপন করেন। ঐ পরিসংখ্যানে সমসাময়িককালে বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষায় মুসলিম ছাত্র ছিল ২৭,২৮৯ জন এবং হিন্দু ছাত্র ছিল ১,৭০,০৮১ জন।

নবাব লতিফ মাধ্যমিক শিক্ষায় মুসলিম ছাত্রদের এই অনগ্রসরতার জন্য দুটি কারণ উল্লেখ করেন। প্রথমত বেতন দানের অক্ষমতা এবং দ্বিতীয়ত স্কুলের দূরত্ব। তিনি মনে করেন, মাধ্যমিক শিক্ষায় মধ্যবিত্ত পরিবারের ছাত্ররাই পড়াশুনা করতে সমর্থ হয়। কিন্তু মুসলিম মধ্যবিত্তদের সাধারণত দরিদ্রই বলা যেতে পারে। মুসলিম সাম্রাজ্যের পতনের পর এদের অবস্থার আরো অধঃপতন ঘটে। ফলে উপরোক্ত কারণ দুটি শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের বিশেষ বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি করেছে। এই বন্ধ্যাত্ব দূর করতে হলে বেতন-ফি হ্রাস করতে হবে অথবা বিশেষ ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা করতে হবে। সেই সাথে তিনি বলেন, সাধারণ মাধ্যমিক স্কুলগুলো মুসলমানদের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোতে শিক্ষা প্রদান করছে না। তিনি জীবিকার জন্যে ইংরেজি এবং মাতৃভাষা বাংলার পাশাপাশি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজনে উর্দু, ফারসি ও আরবি শেখার গুরুত্বও তুলে ধরেন। কিন্তু মাধ্যমিক স্কুলগুলো ঐসব বিষয় শিক্ষার ক্ষেত্রে মোটেও উপযোগী নয়। তিনি এ প্রসঙ্গে উইলিয়াম হান্টারের গ্রন্থের *(The Indian Mussalmans)* বিবৃতি উল্লেখ করেন:

> দ্বিতীয়ত আমাদের গ্রাম্য স্কুলগুলো মুসলমানদের জন্য মোটেই উপযুক্ত নয়। এসব স্কুলের ভাষা পড়ে মুসলমানরা সামাজিক বা ধর্মীয় কোন ক্ষেত্রেই মর্যাদা অর্জন করতে পারে না। প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত মুসলমানের কিছু ফারসি শিক্ষা করা উচিত। কিন্তু ফারসি এমনকি আমাদের হাইস্কুলগুলোতেও পড়ানো হয় না। শহুরে মুসলমান হোক আর গ্রাম্য মুসলমান, প্রত্যেকেই একটি উপযুক্ত ভাষার মাধ্যমে প্রার্থনা করতে চায় যা আমাদের স্কুলগুলো মোটেই স্বীকৃতি দিতে চায় না।[১২]

তাছাড়াও আবদুল লতিফ উইলিয়াম হান্টারের গ্রন্থের উক্তি তুলে ধরে প্রত্যেক জেলায় মৌলবি শিক্ষক নিয়োগের দাবি জানান, যাঁরা দেশীয় স্কুলগুলোতে উর্দু এবং মিডল ইংরেজি স্কুলগুলোতে আরবি-ফারসি ভাষায় শিক্ষা প্রদান করবেন। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, উইলিয়াম হান্টারের মত মহান ব্যক্তির ঐ বর্ণনাই যথেষ্ট নয়, শিক্ষা বিভাগ যেন বাস্তবে তা কার্যকর করে মুসলমানদের শিক্ষা সমস্যার অবসান ঘটান।

উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কে তৃতীয় প্রশ্নের জবাবে নবাব লতিফ বলেন, মুসলমানগণ উচ্চ শিক্ষায় খুবই অনগ্রসর। মাধ্যমিক শিক্ষাও তাদের তেমন সন্তোষজনক নয়। কেননা, মাধ্যমিক

পড়ার পর খুব কম ছাত্রই উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ লাভ করে। ইংরেজি পড়াশুনার ছাত্রও খুবই বিরল। অধিকাংশ ছাত্রই দরিদ্র এবং অভাব-অনটনের দরুন উচ্চ শিক্ষায় অগ্রসর হতে পারে না। সাম্প্রতিককালে লে. গভর্নর মুসলিম ছাত্রের দুই তৃতীয়াংশ বেতন মহসিন তহবিল থেকে দেয়ার যে নির্দেশ দিয়েছেন তা মুসলমানদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের উৎসাহিত করবে সন্দেহ নেই। কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও অধিকাংশ ছাত্র নিজেদের খরচ বহন করতে সম্পূর্ণ অপারগ। কলকাতা শহরে থাকা-খাওয়া এবং বই-পুস্তক ক্রয়ের মত আর্থিক সামর্থ্য এসব ছাত্রের নেই।

তিনি বলেন, একথা অনস্বীকার্য যে, উচ্চ শিক্ষাই উচ্চপদস্থ সরকারি চাকরির একমাত্র পথ। অতএব, উচ্চ শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের অগ্রসরতার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার বন্দোবস্ত করতে হবে। মুসলমানদের অভিযোগ ছিল মহসিন তহবিল বহুকাল অপাত্রে ব্যয় করা হয়েছে। তাছাড়াও কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার পরিস্থিতিও সন্তোষজনক নয়। কিন্তু এখন আনন্দের বিষয় যে, মুসলমানদের ঐ উভয় অভিযোগ দূরীভূত হয়েছে। মহসিন তহবিলকে আরবি-ফারসি শিক্ষার উন্নতির জন্য নিয়োজিত করা হয়েছে। অবশ্য তহবিলের একটি ক্ষুদ্র অংশ ইংরেজি শিক্ষার খাতেও ব্যয় হবে। কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও দেশীয় জনসাধারণের বিরাট সম্প্রদায় তথা মুসলমানরা সরকার প্রবর্তিত শিক্ষা দ্বারা উপকৃত হতে পারছে না। অতএব, সরকারের পক্ষ থেকে এর চেয়েও অধিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন শিক্ষার বন্দোবস্ত করতে হবে যাতে তারা হিন্দুদের তুলনায় যতটুকু পশ্চাৎপদ হয়েছে তা যেন পূরণ করতে পারে। আবদুল লতিফ শিক্ষার সাহায্য দানের ক্ষেত্রে সরকারি নীতির সমালোচনা করে বলেন যে, সরকার শুধু প্রাথমিক শিক্ষায় সাহায্য প্রদান করবেন, উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে করবেন না, এমনটি হওয়া উচিত নয়। মুসলমানদের অবস্থা হিন্দুদের মতই একথা মনে করা মোটেই সমীচীন হবে না। মুসলিম স্বার্থে যে-সব প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে তা অবশ্যই কার্যকর করতে হবে।

চতুর্থ প্রশ্নে বাংলা ও বিহারের মুসলমানদের শিক্ষার মাধ্যম কি হবে তার জবাবে আবদুল লতিফ বলেন, শিক্ষার প্রশ্নে আমি সব সময়ই মনে মনে ধারণা পোষণ করি যে, নিম্নবিত্ত মুসলমানদের (যাদের রীতিনীতি হিন্দুদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ) প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যম বাংলা হবে। তবে এই বাংলায় সংস্কৃত শব্দের পরিবর্তে আরবি-ফারসির প্রাধান্য থাকতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে আদালতের ব্যবহৃত বাংলাকে অনুসরণ করা উচিত। পক্ষান্তরে, মধ্য ও উচ্চবিত্ত মুসলমানদের শিক্ষার মাধ্যম হবে উর্দু। সম্ভ্রান্ত এবং রুচিশীল মুসলমানরা গ্রামে এবং শহরে এই ভাষাতেই কথা বলে এবং এই ভাষার বদৌলতে সমাজে সম্মান প্রাপ্ত হয়। মধ্য ও উচ্চবিত্ত মুসলমানরা সাধারণত বিজয়ী ও কুলীন মুসলমানদের অধস্তন পুরুষ যারা সেকালে আরব, পারস্য এবং মধ্য এশিয়া থেকে বাংলায় আগমন করেন এবং দিল্লীর

দরবারে বিভিন্ন উচ্চপদস্থ রাজকার্যে নিয়োজিত হন। এই শ্রেণীর মুসলমান বিভিন্ন সময়ে রাজকীয় প্রয়োজনে বাংলায় আসেন এবং কালক্রমে এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান। তাদের মাতৃভাষা উর্দুই ছিল। তাই আবদুল লতিফ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত পোষণ করেন যে, সন্তানদেরকে মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাদান করা উচিত। তাঁর মতে ভাষা নির্বাচনের প্রশ্নেও মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতি ও অবনতি নির্ভরশীল।

বিহারের শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে আবদুল লতিফ বলেন, বিহারের ধনী-দরিদ্র, উঁচু-নীচু, হিন্দু-মুসলমান সকলেই উর্দু ভাষায় কথা বলে এবং তাদের শিক্ষার মাধ্যমও তাই। কিন্তু কিছুদিন যাবৎ সরকার সেখানে হিন্দি ভাষা চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছেন। এ ব্যাপারে মুসলমানদের ঘোর আপত্তি রয়েছে। কেননা, এ কথা সর্বজনবিদিত যে, কোন জাতিই মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করে শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রসর হতে পারে না। বিহারের মুসলমানদের ভাষা উর্দুই, এটিই আমার বক্তব্য। তবে হিন্দিকে সেখানে ঐচ্ছিক ভাষা হিসেবে চলনসই শিক্ষা দেয়া যেতে পারে।

ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের বাংলা প্রাদেশিক কমিটি সৈয়দ আমীর আলীর নিকট মুসলমানদের শিক্ষা পরিস্থিতি জানতে এবং এ ক্ষেত্রে মন্তব্য ও পরামর্শ গ্রহণের লক্ষ্যে মোট ৯টি প্রশ্ন উপস্থাপন করে।[১৩]

১. বাংলা ও বিহারের মুসলমানদের বর্তমান শিক্ষা পরিস্থিতি কেমন?
২. কোন কারণগুলো ব্যাপকহারে ইংরেজি শিক্ষা থেকে মুসলমানদের পিছিয়ে রেখেছে?
৩. মুসলমানদের বর্তমান শিক্ষা সংক্রান্ত প্রয়োজনগুলো (requirements) কি কি?
৪. বাংলা ও বিহারের মুসলমানদের প্রাথমিক শিক্ষার পরিস্থিতি কেমন?
৫. মুসলমানদের উচ্চ ইংরেজি শিক্ষার জন্যে বৃহত্তর সুযোগ দেয়া উচিত কি না?
৬. প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধাগুলোর প্রকৃতি কী হওয়া উচিত?
৭. কোন প্রকার সরকারি সুবিধা প্রত্যাহার হলে মুসলমানদের শিক্ষার অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হবে কি?
৮. বাংলার মুসলমানদের শিক্ষার অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ওপর আপনার কী ধরনের মতামত রয়েছে?
৯. ভাগলপুর স্কুলের মুসলিম ছাত্রদের সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কী?

উপরোক্ত প্রশ্নমালার উত্তরে সৈয়দ আমীর আলী বাংলার মুসলিম শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর সুদীর্ঘ মতামত পেশ করেন। তিনি প্রথম দুটি প্রশ্নের উত্তর একই সঙ্গে দেয়ার অনুমতি চেয়ে বলেন যে, এই জবাবের মাধ্যমেই বাংলা ও বিহারের মুসলিম শিক্ষা পরিস্থিতি এবং তাদের অনগ্রসরতার কারণগুলো সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। তিনি মুসলিম সমাজের বর্তমান

অসন্তোষজনক শিক্ষার অবস্থার জন্য প্রথমত পরোক্ষভাবে হলেও তাদের রাজনৈতিক অধঃপতনকে দায়ী করেন। তিনি বলেন যে, পুরনো দিনের স্মৃতিচারণ করে লাভ নেই, পঁচিশ বছর পূর্বেও শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের কতটুকু সুযোগ-সুবিধা ছিল তার একটা চিত্র তুলে ধরতে চাই। তখন ইংরেজি শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমানদের তেমন আগ্রহ ছিল না যতটুকু সম্প্রতি তৈরী হয়েছে। তারা ছিল আরবি ও ফারসির জন্যই উৎসর্গিত প্রাণ। সেকালে কলকাতা ও হুগলীতে মাত্র দুটি মাদ্রাসা ছিল, যেগুলোতে মুসলিম ছাত্ররা শুধু ধর্মীয় উদ্দেশ্যেই নয়, পার্থিব স্বার্থের জন্যও শিক্ষা লাভ করত। কেননা, ছাত্ররা সিনিয়র স্কলারশিপ পাশ করার পর সরকারি অফিস-আদালতেও চাকরি লাভ করত। দূর-দূরান্তের ছাত্ররা হুগলী বা কলকাতায় আসলে স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাদের থাকা–খাওয়ার (জায়গীর) বন্দোবস্ত করতেন। আমীর আলী তাঁর স্মৃতিচারণ থেকে বলেন, ১৮৫৫ সালে হুগলী মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষকের বাড়িতে প্রায় ৩০/৪০ জন ছাত্র 'জায়গীর' ছিল। কলকাতায় 'জায়গীর' প্রথার বেশ বিস্তার ছিল। ইংরেজ খানসামাদের বাড়িতে অসচ্ছল ও দরিদ্র পরিবারের সন্তানেরা মোটামুটি ভালভাবেই নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারত। যদি কোন মতে একজন ছাত্র স্কলারশিপ লাভ করত তাহলে বাড়ির মালিক তাকে 'জামাতা' হিসেবে বরণ করে নিত এবং খানসামারা ইংরেজ 'বসের' তোষামোদ করে জামাতার সম্ভাব্য সকল উন্নতির বন্দোবস্ত করত। মোট কথা, আরবি–ফারসি পড়ুয়াদের শিক্ষাজীবনের সুযোগ–সুবিধা ও উপকরণ এই ধরনের ছিল। শতকরা পঞ্চাশ জন ছাত্রই তাদের শিক্ষা জীবনের খরচ এই ভাবে নির্বাহ করত। ব্রিটিশ সরকারের রেকর্ড সূত্রে আমীর আলী বলেন, শতকরা পঁচিশ জন ছাত্রই জীবিকা ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠত হতে পারত এবং ভাল সরকারি পদে চাকরি লাভ করত। তবে কলকাতা মাদ্রাসার ছাত্রদের তুলনায় ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের ছাত্ররা চাকরিক্ষেত্রে তেমন সুবিধা করতে পারত না।

তদানীন্তন প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে তিনি বলেন, প্রত্যেক মসজিদ সংলগ্ন একটি মক্তব ছিল যেখানে মসজিদের মোল্লা বা খতিব পাড়া–প্রতিবেশীর সন্তানদেরকে পাঠ দান করতেন। সাধারণত এসব মক্তবে আরবী বর্ণ শিক্ষা, কুরআন শরীফের আমপারা এবং গুলিস্তাঁ, বোস্তাঁ ইত্যাদি পড়ানো হত। অতঃপর আমির আলী বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতি সম্পর্কে বলেন যে, এখন আরবি-ফারসির গুরুত্ব বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপারে সকলেই আজ উৎসাহিত। ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি সবাই আগ্রহশীল এবং এই পরিবর্তনের পাশাপাশি মুসলমানদের সর্বস্তরে দারিদ্র্যের কালোছায়া নেমে এসেছে। পূর্বে যেসব মধ্যবিত্ত ও অবস্থাপন্ন মুসলমান ছাত্রদের 'জায়গীর' রাখত, বর্তমানে তাদের অবস্থা এতটাই শোচনীয় হয়ে পড়েছে যে, তারা আর 'জায়গীর' রাখতে পারছে না। অন্যদিকে সমাজের ধনাঢ্য ব্যক্তিগণও শিক্ষায় অনীহা প্রকাশ করেন এবং ধন–সম্পদ তাদের

বিলাস–সত্তাকে জাগ্রত করে তুলেছে। কিছু অভিভাবক লেখা-পড়ায় আগ্রহী হলেও সন্তানেরা আবার পড়াশুনা থেকে গা বাঁচিয়ে চলছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা পরিস্থিতি সম্পর্কে আমির আলী অভিমত প্রকাশ করেন ইংরেজি শিক্ষার জন্য সরকার এক্ষেত্রে যেসব সুযোগ–সুবিধা প্রদান করেছেন তা খুবই উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও মুসলমানরা যে শুধু বিজাতীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজি শিক্ষা থেকে বিরত রয়েছে তা নয়। পূর্বেকার সময়ে মুসলমানদের ভাবাবেগ ও চিন্তা–ভাবনা যাই হোক না কেন, বর্তমানে সেই মানসিকতা অনেকাংশে পরিবর্তিত হয়েছে। এখন সকলেই ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে মুসলমানদের অনগ্রসরতার প্রধান কারণ হল তাদের দারিদ্র্য এবং অসচ্ছলতা। তবে আমীর আলী এ ক্ষেত্রে সমাজের বিপরীত চিত্রও তুলে ধরে বলেন যে,

> সত্য বলতে কি, সমাজে এমন কিছু সংখ্যক অবস্থাসম্পন্ন মুসলমান রয়েছেন যারা ইচ্ছা করলে যে কোন মূল্যে ছেলেদের দ্বারা শিক্ষা ক্ষেত্রে হিন্দু এমনকি এ্যাংলো– ইণ্ডিয়ানদেরকেও পেছনে ফেলে যাবার নজির স্থাপন করতে পারেন। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এসব পিতা ছেলেদেরকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেন না। পক্ষান্তরে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হতে দেখেছি যে, বহু বিদ্যোৎসাহী এবং মেধাবী ছাত্র বিপুল প্রতিশ্রুতি নিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর হয়ে চলেছে, কিন্তু ঠিক উচ্চ শিক্ষার দ্বারপ্রান্তে এসে নাটকীয় ভাবে তারা পড়াশুনায় ইতি টানতে বাধ্য হয়। কারণ, বাবা–মা তাদের খরচ চালাতে পারেন না।[১৪]

তিনি উপরোক্ত সমস্যার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আরও বলেন যে, যখন 'জায়গীর' প্রথা ছিল তখন মুসলিম ছাত্ররা ছাত্রাবাস বা বোর্ডিং-এর মুখাপেক্ষী কম হত। কিন্তু দরিদ্রতার জন্য চিরাচরিত 'জায়গীর' প্রথা ক্রম-বিলুপ্তির পর ছাত্রদেরকে ছাত্রাবাসের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু হুগলী কলেজ সংলগ্ন যে বোর্ডিং রয়েছে তাতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে ছাত্রদের থাকতে হয় তা সাধারণ দৃষ্টিতে কম হলেও এতটুকু পরিমাণ খরচও মুসলমানদের পক্ষে বহন করা সম্ভব হয় না। সুতরাং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষায় মুসলিম সমাজের পশ্চাৎপদতার জন্য আমীর আলী দুটি কারণকে সুস্পষ্ট করেন: (১) মুসলমানদের রাজনৈতিক অধঃপতনের কারণে তাদের মৌলিক সচ্ছলতা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে ঐতিহ্যগত চিন্তাভাবনা হ্রাস, (২) ছাত্রদের পড়াশুনার ক্ষেত্রে সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক আনুকূল্যের বিলুপ্তি।

তাছাড়াও আমির আলী শিক্ষা কমিশনের প্রথম দুটি প্রশ্নের জবাবে বলেন যে, সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণী সত্যিকার অর্থে জাতীয় জীবনের প্রাণ, তারা ব্রিটিশ শাসনের প্রথম দিকে সরকারের উচ্চ পদগুলোতে আসীন ছিল। কিন্তু এখন আর সেদিন নেই। তাদের জীবনের অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়েছে। আবার যে-সব মুসলিম আমির–ওমরা সরকারের বিভিন্ন পদে এখনও ক্ষমতায় আছেন তারাও সন্তানদেরকে নামে মাত্র ইংরেজি শিক্ষা দিয়ে

থাকেন। তিনি বলেন যে, ইংরেজি শিক্ষা পশ্চাৎপদতার জন্য কারণ শুধু তাই নয়, বরং জেলা স্কুলগুলোতে হিন্দু শিক্ষকদের প্রাধান্যও অন্যতম কারণ। শিক্ষা বিভাগীয় দফতরেও মুসলিম কর্মকর্তার সংখ্যা নগণ্য যার ফলে এ সব স্কুলে বাংলাভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হয়। এ কথা অনস্বীকার্য যে, ব–দ্বীপ অঞ্চলের জেলাগুলো ব্যতীত সর্বত্রই মুসলমানের ভাষা উর্দু। তাই বাংলাভাষী শিক্ষকগণ মুসলমান ছাত্রদের হৃদয়গ্রাহীভাবে শিক্ষাদান করতে পারেন না। সেই সাথে আমীর আলী মুসলমানদের জন্য আরবি–ফারসির গুরুত্বও স্বীকার করে বলেন যে, কিছুদিন পূর্বেও কয়েকটি মাত্র জেলা স্কুলে মৌলবি শিক্ষক ছিল যারা ফারসি, উর্দু বা আরবি শিক্ষা দান করতেন। আরবি–ফারসির ব্যবস্থা না থাকায় মুসলমানরা সরকারের শিক্ষা–সংস্কারের প্রতি আগ্রহী হয়নি এবং তারা ঐসব স্কুল থেকে দূরে ছিল। কিন্তু মুসলমানরা এখন সচেতন হয়েছে এবং ক্রমান্বয়ে তারা ইংরেজি শিক্ষার প্রতি ধাবিত হচ্ছে।

কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে বোধগম্যতা আসার পরও তারা শিক্ষার অগ্রসরতায় নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। আমীর আলী আরবি–ফারসি শিক্ষার গুরুত্ব মেনে নিলেও ইংরেজির মাধ্যমেই মুসলিম ছাত্রদের শিক্ষা প্রদান করা উচিত বলে মনে করতেন। এ ক্ষেত্রে তিনি সরকারি নীতির সমালোচনা করে বলেন যে, ১৮৭১ সালের ৭ আগস্ট লর্ড মেয়ো যদিও শুধু ঐতিহ্যগত শিক্ষার ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করেন কিন্তু তৎকালীন বাংলার লে. গভর্নর জর্জ ক্যাম্পবেল গভর্নর জেনারেলের ঐ রেজুলেশনের বিরোধিতা করেন। ক্যাম্পবেল আরবি–ফারসির প্রতি সুযোগদানের বিষয় স্বীকার করলেও ইংরেজির মাধ্যমেই পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রদানের ওপর জোর দিয়েছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার লে. গভর্নরের প্রস্তাবকে সামান্যই রদবদল করেন এবং যার ফলে ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা হয়।

অতএব, আমীর আলীর মতে এবারেও মুসলমানেরা পরাজিত হল। তিনি বলেন পঞ্চাশ বছর পূর্বে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ না করে মুসলমানরা যে ভুল করেছিল এবং তার ঘাটতি পূরণের জন্য আবারও ইংরেজিকে বাধ্যতামূলক না করে সেই যেন একটা মৃত বস্তুর গুরুভার (মাদ্রাসা শিক্ষা) মুসলমানদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হল। এ প্রসঙ্গে তাঁর মূল বক্তব্য ছিল,

> The Government of India adopted Sir George Campbell's views with slight modifications, and the Dacca, Rajshahye, and Chittagong Madrasas were the outcome of the decision then arrived at. A dead-weight, however, seems still to press down the Muhammadan community, the mistake which was committed in 1872 was not to make English compulsory on all students who sought middle-class and high education. The consequence is that the only kind of education which is necessary to enable then to retrieve the ground they have lost within the last fifty years is in a most unsatisfactory condition. [১৫]

অত:পর তিনি কলকাতা মাদ্রাসা, হুগলি কলেজ, সেন্ট জেভিয়ার্স ও শ্রীরামপুর কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি শিক্ষায় মুসলমান ছাত্রদের দুরবস্থা হান্টার কমিশনের প্রাদেশিক কমিটির নিকট তুলে ধরেন।

তৃতীয় প্রশ্নের জবাবে আমীর আলী অভিমত প্রকাশ করেন যে, প্রদেশের মুসলমানদের শিক্ষা সংক্রান্ত চাহিদাগুলো পূরণের জন্য সরকার প্রশংসামূলক কোন বড় ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করছে না:

> As regards the educational requirments of the Muhammadans in these provinces, I do not think government is called upon to undertake any heavy outlay to carry out its benevolent intentions for promoting mass-education, as far as the Mussalmans are concerned.[১৬]

শিক্ষা কমিশনের প্রাদেশিক কমিটি চতুর্থ প্রশ্নে আমীর আলীর নিকট বাংলা ও বিহারের প্রাথমিক শিক্ষা পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশেষভাবে মতামত প্রদানের আহ্বান জানায়। এ প্রশ্নের জবাবে আমীর আলী শুরুতে মন্তব্য করেন যে, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন মসজিদগুলোকে ব্যবহার করা উচিত। তিনি বলেন, এটি উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই যে, জ্ঞান–বিতরণ ও অর্জন মুসলমানদের ধর্মীয় কর্তব্যের অংশস্বরূপ। এই বিশ্বাসের ফলে মুসলমানদের বহু সম্পত্তি শিক্ষা বা কল্যাণমূলক কাজে উৎসর্গীকৃত রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ তিনি 'সাসারাম বৃত্তি'সহ বেশ ক'টি ছোটখাট অনুদানের কথা উল্লেখ করেন যেগুলোর দ্বারা বিহার ও পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের গরিব ছাত্ররা আরবি–ফারসিতে শিক্ষা লাভ করছে। বাংলার মসজিদগুলোর জন্যও অনেক ওয়াক্‌ফ্ বা দানকৃত সম্পত্তি রয়েছে যার সাহায্যে একজন মৌলবি গরিব ছাত্রদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করে নিজের অভাব পূরণ করছেন। কলকাতার বুকেও অনেক ধর্মীয় বৃত্তি রয়েছে যেগুলো সরকারের নজরে নেই অথচ দরিদ্র মুসলিম ছাত্ররা সেগুলোর মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষায় উপকৃত হচ্ছে। তাছাড়াও পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলার মসজিদ সংলগ্ন মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হয়। আমীর আলী বলেন, এ-সব মসজিদভিত্তিক মক্তব ও বিভিন্ন দানকৃত বৃত্তিগুলোর সাধারণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার ভার যদি সরকার গ্রহণ না করেন তাহলে এগুলো অচিরেই ধ্বংসের সম্মুখীন হবে। তা ছাড়াও তিনি মক্তবগুলোর সংস্কার ও অগ্রগতির জন্য মুসলিম পরিদর্শক নিয়োগ ও সরকারি অনুদানের দাবি করেন। তিনি দরিদ্র ছাত্রদের মধ্যে পড়াশুনার আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ দেয়া উচিত বলে মনে করেন।

আমীর আলী প্রদেশের পশ্চাৎপদ অঞ্চলগুলোতে সরকারের অনুদান বৃদ্ধি করে একজন দরিদ্র ছাত্রকে কমপক্ষে ৮ আনা বা এক টাকা পর্যন্ত মাসিক ভাতা প্রদানের আবেদন জানান। সরকারি সাহায্যের জন্য পাঁচ মাইল দূরত্বের নিয়মটি মুসলমানদের জন্য প্রয়োগ না করতে

তিনি সরকারকে অনুরোধ জানান। অর্থাৎ পাঁচ মাইলের ভেতরে মুসলমানদের জন্য কোন বিদ্যালয় থাকলেও সেটি যেন অনুদান পায়। তাছাড়াও তিনি পূর্ববাংলার পশ্চাৎপদ জেলাগুলোতে সম্পূর্ণ সরকারি সহায়তায় 'হার্ডিঞ্জ পরিকল্পনা' অনুযায়ী গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন করে প্রথমে বিনামূল্যে ছাত্রদের অধ্যয়নের সুযোগ দেয়ার দাবি করেন। তিনি মনে করেন এর মাধ্যমে যখন শিক্ষার আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে তখন ছাত্রদের জন্য সেখানে বেতন নির্ধারণ করা যেতে পারে। অন্যদিকে, আমীর আলী মুসলমানদের প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যসূচি প্রণয়ন, নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের ভার জনশিক্ষা বিভাগের সাথে সংযুক্ত একটি মুসলিম সমিতির নিকট প্রদান করা উচিত বলে মনে করেন।

পঞ্চম প্রশ্নে আমীর আলীকে মুসলমানদের জন্য উচ্চ ইংরেজি শিক্ষার বৃহত্তর সুযোগ দেয়া উচিত কি-না জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, অবশ্যই এ ক্ষেত্রে মুসলমানদের বৃহৎ সুযোগ দিতে হবে অন্যথায় অন্য সম্প্রদায়ের সাথে সফলভাবে প্রতিযোগিতা করা অসম্ভব হবে। তাদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষায় বিশেষ উৎসাহ দানের প্রয়োজন নেই; উচ্চতর শিক্ষায় সহযোগিতা প্রদানের প্রয়োজন রয়েছে– সে-জন্য সরকারকে সুদূরপ্রসারী ও স্থায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন।

মুসলমানদের জন্য সুযোগ-সুবিধার প্রকৃতি কি হওয়া উচিত– এ প্রশ্নের জবাবে আমীর আলী বলেন যে, সাত নং প্রশ্নের উত্তর দেয়ার পর সাধারণ মন্তব্যে আমি এ সম্পর্কে আলোচনা করব।

অতঃপর শিক্ষা কমিশনের নিকট আমির আলী সাত নং প্রশ্নের জবাবে মুসলিম শিক্ষার পেছনে সরকারি সাহায্য প্রত্যাহারের ব্যাপারে বলেন যে, মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষায় দুরবস্থা সম্পর্কে আমি ইতিমধ্যে বর্ণনা করেছি। ইংরেজি অধ্যয়ন তাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। তার অর্থ এর মাধ্যমেই তারা তাদের হতাশাজনক অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে নাকি ভারতীয় জাতিসমূহের মধ্যে পার্থিব উন্নতির ক্ষেত্রে তাদেরকে আরও পেছনে ঠেলে দেয়া হবে। তিনি বলেন, এই মুহূর্তে মুসলমানরা তাদের অধঃপতনের কারণগুলো অনুধাবন করতে শুরু করেছে এবং তাদের হারানো ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধারের ঐকান্তিক চেষ্টা করছে। তবে এখনও তাদের দরিদ্রতা, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ধ্বংসাবশেষ, সম্পত্তির বাজেয়াপ্তি, প্রাচীন অহংকারবোধ তাদের পথরোধ করে আছে। তাদের দাতব্য বৃত্তিগুলোও বিশৃংখল অবস্থায় পরিচালনাধীন এবং নানাভাবে অপচয় হচ্ছে। এই অবস্থায় মুসলমানদের উচ্চ ও মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য সরকারি সাহায্য তা যত ক্ষুদ্রাকারই হোক না কেন তা প্রত্যাহার করা হলে তাদের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর হবে। মুসলমানদের মধ্যে উচ্চ ও মাধ্যমিক শিক্ষা বিসর্জন দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য এক টাকা খরচও তাদের অগ্রগতির পথে বিরাট বাধা হবে।

বাংলার মুসলমানদের শিক্ষার অবস্থা ও সামগ্রিক উন্নয়নকল্পে কী ধরনের সংস্কার আন্দোলনের প্রয়োজন, শিক্ষা কমিশনের এ আট নং প্রশ্নের জবাবে আমীর আলী মন্তব্য করেন যে, জর্জ ক্যাম্পবেল পূর্ব বাংলায় বিশুদ্ধ প্রাচ্য শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন তা সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। অতএব, সরকারকে প্রাচ্য অথবা পাশ্চাত্য– দুটির যে-কোন একটি পন্থা অবলম্বন করতে হবে। তিনি এ লক্ষ্যে সরকারকে রাজশাহী ও চট্টগ্রাম মাদ্রাসায় প্রাচ্য শিক্ষার মান হ্রাস করে এই দুটি প্রতিষ্ঠানকে জেলা স্কুলের সাথে একীভূত করার পরামর্শ দেন। তিনি মনে করেন এর ফলে অনেক অর্থ বেঁচে যাবে এবং সেই অর্থ অন্যান্য সৎকর্মে ব্যয় করা যাবে। দ্বিতীয়ত তিনি বলেন, কলকাতা মাদ্রাসাকে আধুনিক কলেজের পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে। কারণ, তাঁর মতে, হিন্দু প্রভাবিত কলেজগুলোতে মুসলিম ছাত্রদের অধ্যয়নে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। যদি কোন কারণে প্রেসিডেন্সি কলেজে মুসলিম ছাত্র ভর্তি বন্ধ করে দেয়া হয় তাহলে একটি মুসলিম কলেজ স্থাপন করা দ্বিগুণভাবে প্রয়োজন হবে। হুগলী মাদ্রাসার শিক্ষা পদ্ধতিও মুসলিম সংস্কৃতির বহির্ভূত পর্যায়ে নেমে এসেছে। এ জন্য সরকার না-কি মুসলিম সমাজ দায়ী সেটি আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার মতে, মুসলমানদের শিক্ষা আর মাদ্রাসায় না রাখাই ভালো। সুতরাং, হুগলী মাদ্রাসাও বন্ধ করে দিলে মহসিন তহবিলের অনেক টাকা বেঁচে যাবে যার দ্বারা হুগলী কলেজ এবং কলকাতা ও শিবপুরের বিভিন্ন কলেজে মুসলিম ছাত্রদের জন্য বৃত্তি দেয়া যাবে।

আমীর আলীর মতে, মিডল স্কুল, হাই স্কুল ও কলেজগুলোতে ইংরেজি শিক্ষা মুসলিম ছাত্রদের জন্য বাধ্যতামূলক করতে হবে। তিনি মনে করেন, মুসলমানদের ইংরেজি বাদ দিয়ে শুধু প্রাচ্য দেশীয় শিক্ষা দেয়ার ফল খুবই খারাপ হবে। শুধু এই ধরনের পড়াশুনায় কোন চাকরি বা জীবিকার সংস্থান হয় না। এই ধরনের প্রাচ্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সমাজের অকর্মণ্য এবং পরগাছা হিসেবে বিরাজ করে। বর্তমান বিশ্বের প্রগতি ও সংস্কৃতি সম্পর্কে যারা খোঁজ–খবর রাখে না তারা যথার্থই অথর্ব। ক্রমান্বয়ে তারা অধঃপতনের দিকে ধাবিত হয় এবং সবাই তাদেরকে ঘৃণার চোখে দেখেন।

আমীর আলী বলেন যে, প্রত্যেক শিক্ষিত মুসলমানের একান্ত ইচ্ছা শিক্ষা বিভাগে মুসলিম কর্মকর্তা নিয়োগ করা হোক। প্রত্যেক জেলা স্কুলেও ন্যূনপক্ষে দুই-তিনজন মুসলমান শিক্ষক বাধ্যতামূলকভাবে রাখা উচিত। তারা ছাত্রদেরকে আরবি–ফারসি শিক্ষা দেবেন। হিন্দু শিক্ষকগণ যেখানে মুসলিম ছাত্রদের নিয়ে সমস্যায় পড়েন সেখানে মুসলমান শিক্ষকরা তাদের সহযোগিতা করতে পারবেন। কেননা, হিন্দু শিক্ষকগণ উর্দু জানেন না। মুসলমানদের জন্য উর্দু পাঠ আবশ্যিক, যেমন হিন্দুদের জন্য বাংলা। হিন্দুদের ক্ষেত্রে যেমন সংস্কৃত গুরুত্বপূর্ণ মুসলমানদের জন্য ফারসি এবং আরবি। তবে আমীর আলী

ইংরেজির পাশাপাশি মুসলিম ছাত্রদের ভাষার চাপ কমানোর জন্য উর্দু–ফারসি বা উর্দু–আরবি অথবা ফারসি–আরবি অর্থাৎ অতিরিক্ত যে-কোনো দুটি ভাষা শিক্ষা যথেষ্ট বলে মনে করেন।

তিনি ছাত্রাবাস ব্যবস্থার উন্নয়নের দাবি জানিয়ে বলেন, কলকাতা ছাড়া প্রদেশের অন্যান্য জেলাতেও ছাত্রাবাসের প্রয়োজন রয়েছে। সেখানে সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ছাত্ররা একটি ভাল পরিবেশে থেকে পড়ালেখার সুযোগ পাবে। ছাত্রাবাস না থাকলে ছাত্রদেরকে অবাঞ্ছিত পরিবেশে থেকে লেখাপড়া করতে হয়। এসব ছাত্রাবাসে কতিপয় দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদের বিনা ব্যয়ে থাকার ব্যবস্থা করতে হবে এবং ছাত্রাবাসগুলো রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব মুসলিম শিক্ষকদের ওপর ন্যস্ত করতে হবে।

আমীর আলী মুসলমানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোন ব্যবস্থাপনা কমিটির হাতে ন্যস্ত করার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। কেননা এই ধরনের কমিটিতে পরস্পর বিরোধী মতের লোক থাকে। যাদের মধ্যে কেউ পাশ্চাত্য শিক্ষা, আবার কেউ- বা প্রাচ্য শিক্ষার পক্ষপাতিত্ব করবেন। ফলে তাদের মতবিরোধ চলতে থাকবে এবং ক্রমান্বয়ে প্রতিষ্ঠান ধ্বংসের সম্মুখীন হবে।

আমীর আলী শিক্ষা কমিশনের সর্বশেষ প্রশ্নের উত্তরে ভাগলপুর জেলা স্কুলে মুসলিম ছাত্রদের পরিস্থিতি সম্পর্কে বলেন যে, ভাগলপুর স্কুলে ১২০ জন মুসলিম ছাত্র ইংরেজি পড়ছে যেখানে হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা ৩৭৪ জন। এই ১২০ জন ছাত্রের মধ্যে ৭৯ জন ইংরেজির সাথে উর্দু ও হিন্দি শিক্ষা গ্রহণ করছে, ৪১ জন ইংরেজির সাথে ফারসিতেও অধ্যয়ন করছে, তবে কেউ আরবি শিক্ষা গ্রহণ করছে না। কারণ বিহারের মুসলিম ছাত্রদেরকে চাকরির প্রয়োজনে হিন্দি ভাষাও শিখতে হয়। যার ফলে তাদের ওপর বহু ভাষা শিক্ষার চাপ সৃষ্টি হয়। এ প্রসঙ্গে তিনি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের মন্তব্য তুলে ধরেন:

> ... the boys in the last four classes are not allowed to read any but a vernacular language, and since Hindi has taken the place of Urdu in the Law Courts, it has been made compulsory that all the boys in the four junior classes, Muhammadan as well as Hindu, should read Hindi. The Muhammadan boys in these classes are, however, permitted to read Urdu in addition to Hindi, and almost all of them do read Urdu, the arrangement being that they read Urdu 4 days and Hindi 2 days in the week.[১৭]

আমীর আলী উপরোক্ত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলেন যে, বিহারের বিচারালয়ে হিন্দি প্রবর্তনের ফলে মুসলিম ছাত্রদের যে অসুবিধাজনক অবস্থায় ঠেলে দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কে মন্তব্য করা প্রয়োজন মনে করি না। হিন্দু ছেলেদের যখন দুটি ভাষা পড়তে হয় তখন মুসলমান ছেলেদের শিখতে হয় কমপক্ষে তিনটি ভাষা এবং এই আরোপিত সমস্যা তাদের

বিদ্যালয় জীবন শেষ হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে, যদি না তারা জাতিগত বৈশিষ্ট্য, ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার পরিত্যাগ করতে চায়।

শিক্ষা কমিশনের বাংলা প্রাদেশিক কমিটি নবাব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলীর পর এতদঞ্চলের অপর একজন মুসলিম সংস্কারক ও শিক্ষাবিদ সৈয়দ আমির হোসাইনের নিকট সমাজের শিক্ষা সমস্যা ও উন্নতির ব্যাপারে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করে। তার মধ্যে বাংলার মুসলমানদের শিক্ষা সম্পর্কে প্রশ্নমালা ছিল নিম্নরূপ:[১৮]

১. বর্তমান প্রচলিত শিক্ষার প্রায়োগিক ব্যবস্থা কতটুকু নিরপেক্ষ? স্কুল বা কলেজগুলোতে কোন ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া বা না দেয়াতে কোন সমস্যা আছে কি?

২. বাংলার মুসলমানদের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনার কী অভিমত রয়েছে?

৩. মুসলিম নারী-শিক্ষা সম্পর্কে আপনার কোন মতামত আছে কি?

প্রথম প্রশ্নের জবাবে সৈয়দ আমির হোসাইন বলেন, সমাজের ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তার আলোকেই আমি বলতে পারি যে, সরকারি স্কুলগুলোর পাঠ্যসূচিতে ধর্মীয় শিক্ষার অনুপস্থিতিতে মুসলমানদের কোন সমস্যা হওয়ার কথা নয়। কেননা মুসলিম শিক্ষার্থীরা ঘরে কিংবা প্রাথমিক মক্তবে ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করে থাকে। ধর্মীয় শিক্ষা মুসলিম সমাজ ব্যবস্থার সাথে এমনভাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, আরবি–ফারসি ভাষায় এমন কোন ধর্মনিরপেক্ষ বা সাধারণ গ্রন্থও খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে যেখানে পরোক্ষভাবে হলেও এক আল্লাহর অস্তিত্ব ও মহানবীর প্রতি বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটেনি। সুতরাং একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জ্ঞান প্রদানের মাধ্যম হিসেবে ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া হোক বা না হোক কিংবা আদৌ ঐ শিক্ষার অনুপস্থিতিতে কিছু যায় আসে না।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, আমি এ বিষয়ে আমার বিস্তারিত অভিমত "Mahomedan Education in Bengal" নামক পুস্তিকায় আলোকপাত করেছি।[১৯] পুস্তিকাটির কপি আমি শিক্ষা কমিশনের সভাপতি ও প্রত্যেক সদস্যের নিকট বিবেচনার জন্য প্রেরণ করেছি। বাংলার লে. গভর্নরের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ যে, তিনি আমার পরামর্শকে গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করেছেন। এর ফলে তিনি "মহসিন তহবিল"-এর কিছু অর্থ কলকাতার কলেজগুলোতে মুসলিম ছাত্রদের দুই–তৃতীয়াংশ বেতন প্রদানে বরাদ্দ করেছেন। তা ছাড়াও কলকাতা মাদ্রাসার ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও আমার সুপারিশ গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু একথা আমার বলতে দ্বিধা নেই যে, মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার তুলনায় সরকারের ঐসব অনুদান ও প্রচেষ্টা নিতান্তই কম এবং তাদের প্রকৃত আশা–আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ। বাংলার মুসলমানদের মাঝে আলীগড় কলেজের ন্যায় একটি বি.এ. (সম্মান) কলেজ স্থাপনের দাবি

দিন দিন জোরালো হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে আমির হোসাইন বলেন যে, হিন্দুদের জন্য যেমন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ ও খ্রিষ্টানদের জন্য ডেভোটন কলেজ রয়েছে, মুসলমানদের জন্যও সেরূপ একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা প্রয়োজন। তিনি সরকারকে মুসলমানদের উচ্চ শিক্ষার অগ্রগতির জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ নীতি গ্রহণের দাবি জানান। তিনি বলেন, যদি শুধু মুসলমানদের সন্তুষ্ট করার জন্যই আমার প্রস্তাবের উদ্দেশ্য বলে ধরে নেয়া হয়, তবুও আমি বলব এমন একটি সম্প্রদায়ের সাধারণ অনুভূতি ও ভাবাবেগকে সরকারের মূল্য দেয়া উচিত।

মুসলিম প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়ে তিনি বলেন যে, গ্রামাঞ্চলের মক্তবগুলোকে আধুনিকায়নের জন্য পাঠ্যসূচিতে গণিত ও অন্যান্য উপযোগী বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। ইতিমধ্যে যদিও জনশিক্ষা বিভাগ এ ব্যাপারে কর্মসূচি গ্রহণ করেছে কিন্তু আমার বিশ্বাস বাংলা ও বিহারের মক্তবগুলোর বৃহদংশ এখনও পর্যন্ত সরকারি পরিকল্পনার সাথে যুক্ত হয়নি। আমির হোসাইন সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে মুসলমানদের নিকট জনপ্রিয় করে তোলার জন্য কৃষি ও স্বাস্থ্য শিক্ষার ইংরেজি পুস্তকগুলোকে উর্দুতে অনুবাদ করে প্রাথমিক শিক্ষায় প্রচলনের সুপারিশ করেন।

মুসলিম নারী শিক্ষার পরিস্থিতির ওপর উপস্থাপিত প্রশ্নে আমির হোসাইন অভিমত প্রকাশ করেন যে, বাংলার নিম্নবিত্ত মুসলিম নারীদের জন্য কোন প্রকার শিক্ষা ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। উচ্চ ও মধ্যবিত্ত পরিবারের মুসলিম নারীগণ যদিও তাদের বাড়িতে বসে সেলাইকর্ম, কোরআন পাঠ এবং চলনসই ধর্মশিক্ষা লাভ করছে কিন্তু তাদের লেখার জ্ঞান খুব কমই আছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি কমিশনকে জানান যে, আপাততঃ সরকারের নিকট নারীশিক্ষার বিষয়ে তাঁর তেমন কোন সুপারিশ নেই যতক্ষণ না সমাজে এই সম্পর্কে সচেতনতা তৈরী হবে। তিনি বলেন, বর্তমানে নেতৃস্থানীয় ও প্রতিনিধিত্বকারী মুসলমানদের একাংশ মেয়েদেরকে সরকারি স্কুলে পাঠানোর চেষ্টা করছেন, কিন্তু তাদের সংখ্যা খুবই স্বল্প। তবে এদের সংখ্যা সময়ের আবর্তনে বৃদ্ধি পাবে বলে তাঁর বিশ্বাস এবং সেই সময় আসার পূর্ব পর্যন্ত নারী শিক্ষার ব্যাপারে সৈয়দ আমির হোসাইন যতটুকু সম্ভব কম বলতে চেয়েছেন।

উপসংহার

১৮৮২ সালের ভারতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন ছিল ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক এদেশের শিক্ষা পরিস্থিতি অনুসন্ধান, সমস্যা পর্যালোচনা ও অগ্রগতির জন্য সুপারিশ গ্রহণের লক্ষ্যে একটি ইতিবাচক এবং গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে মাদ্রাজে মনরো, বোম্বেতে এলফিনস্টোন এবং বাংলায় উইলিয়াম ওয়ার্ড ও অ্যাডাম শিক্ষার ওপর তদন্ত কাজ

পরিচালনা করলেও সেসব রিপোর্ট ছিল আঞ্চলিক ভেদে সীমাবদ্ধ। কিন্তু হান্টারের নেতৃত্বে গঠিত ভারতীয় শিক্ষা কমিশনই সর্বপ্রথম উপমহাদেশব্যাপী শিক্ষার অবস্থা নিয়ে তদন্ত কাজ পরিচালনা করে। শুধু তাই নয়, কমিশন প্রতিটি প্রদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধানের লক্ষ্যে পৃথক কমিটিও গঠন করে। এ পরিপ্রেক্ষিতেই বাংলা প্রাদেশিক কমিটির তদন্ত কাজ পরিচালিত হয়।

হান্টার কমিশন পশ্চাৎপদ মুসলমানদের শিক্ষার বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টিপাত করে। কমিশন সভাপতি উইলিয়াম হান্টার ব্যক্তিগতভাবেও মুসলিম শিক্ষা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। কমিশন গঠনের এক যুগ পূর্বে অর্থাৎ ১৮৭১ সালে তাঁর লিখিত গ্রন্থে *(The Indian Mussalamans)* এর প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থটির বিভিন্ন উদ্ধৃতি নবাব আবদুল লতিফ ও আমীর আলী তাঁদের সাক্ষ্যের বিবরণেও উল্লেখ করেন। ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের আগ্রহ ও উৎসাহের ফলে এর রিপোর্টের নবম অধ্যায়ে অনগ্রসর মুসলিম সমাজের শিক্ষা সম্পর্কে পৃথকভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। মুসলিম শিক্ষার প্রতি আগ্রহের ফলেই কমিশনের বাংলা প্রাদেশিক কমিটি নবাব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী ও সৈয়দ আমির হোসাইনের সাক্ষ্য গ্রহণ করে। উপরোক্ত তিন ব্যক্তিত্বের সাক্ষ্যসমূহ ছিল বাংলার তৎকালীন মুসলিম সমাজের শিক্ষা পরিস্থিতির গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এই তিন মনীষীর সাক্ষ্য শুধু উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুসলিম শিক্ষার পশ্চাৎপদতার মূল কারণ ও সার্বিক পরিস্থিতিই জানা যায় না, তৎকালে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁদের গভীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতারও প্রমাণ পাওয়া যায়। আলোচিত ব্যক্তিগণ তৎকালে বাংলার মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষা আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন। তাঁদের দাবি–দাওয়া ও প্রচেষ্টার মাধ্যমেই মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহের সূচনা হয়েছিল। সুতরাং উনিশ শতকে বাংলার মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষার পরিস্থিতি ও অনগ্রসরতার ক্ষেত্রে তাঁদের বক্তব্য ও মতামত খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়।

নবাব আবদুল লতিফ বাংলার মুসলমানদের প্রাথমিক শিক্ষার অনগ্রসরতার জন্য উপযোগী বিদ্যালয়, শিক্ষা পদ্ধতি ও পাঠ্যপুস্তকের অভাবকে দায়ী করেন। তা ছাড়াও প্রশিক্ষণরত শিক্ষকের শূন্যতা, সরকারের উদাসীনতাও প্রাথমিক শিক্ষায় মুসলিম সমাজকে পিছিয়ে রেখেছে বলে তিনি মনে করেন। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষায় মুসলমানদের অনগ্রসরতার জন্য সমাজের দরিদ্রতা ও পর্যাপ্ত স্কুল না থাকাকে তিনি দায়ী করেন। এ সব সমস্যার প্রেক্ষাপটে নবাব আব্দুল লতিফ শিক্ষা কমিশনের মাধ্যমে সরকারের নিকট যথেষ্ট অর্থ অনুদান, বিনা বেতনে অধ্যয়ন, বৃত্তি প্রদান, ধর্মীয় শিক্ষার সুযোগ, ইংরেজির পাশাপাশি আরবি–ফারসি শিক্ষার প্রচলন, মুসলিম শিক্ষক নিয়োগ ইত্যাদি দাবিসমূহ তুলে ধরেন। শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে নবাব আবদুল লতিফ দুটো ভাষার প্রবর্তনের দাবি জানান। তিনি মনে করেন,

সাধারণ কৃষক মুসলমানদের শিক্ষা প্রাথমিক স্তর পর্যন্তই সীমিত থাকে এবং যেহেতু তাদের মুখের ভাষা বাংলা সেহেতু প্রাথমিক শিক্ষা বাংলা ভাষায় দেয়া উচিত। তবে তা সংস্কৃত ঘেঁষা হবে না, সেখানে আরবি–ফারসি শব্দের মিশ্রণ থাকবে। অপরদিকে উচ্চবিত্তের মুসলমানরা যেহেতু উচ্চ শিক্ষায় অধিক সুযোগ লাভ করে থাকে এবং তারা মধ্য এশিয়া থেকে আগত ও তাদের মুখের ভাষা উর্দু, সেহেতু তাদের সন্তানদের মাতৃভাষায় শিক্ষা দেয়া উচিত। আবদুল লতিফের এ প্রশ্নের সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট বোঝা যায়, বাংলার মুসলিম সমাজেও তখন অভিজাত–অনভিজাত দুটো শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। আবদুল লতিফও সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের দৃষ্টিতে শিক্ষা বিস্তার কামনা করেছিলেন বলে মনে হয়। বাংলা ভাষাকে শুধু প্রাথমিক শিক্ষায় সীমিত রাখলে যে সাধারণ শ্রেণীর মুসলমান উচ্চশিক্ষা গ্রহণে বাধাপ্রাপ্ত হবে নবাব লতিফের ন্যায় উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা সেটা চিন্তা করেননি। তাঁদের মনোভাব ও চিন্তাধারা মধ্য ও উচ্চবিত্ত মুসলিম সমাজের শিক্ষার মধ্যে অধিক বিস্তৃত ছিল বলা যায়।

সৈয়দ আমীর আলী তাঁর সাক্ষ্যে বাংলার মুসলমানদের শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতার জন্য রাজনৈতিক অধঃপতন এবং সমাজের অভাব-অনটন ও দরিদ্রতা, সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক সুযোগের অভাব, ধর্মীয় শিক্ষার শূন্যতা, সরকারি অপর্যাপ্ত সাহায্য ইত্যাদি কারণগুলোকে দায়ী করেছেন। তা ছাড়াও আমীর আলী সমাজের মধ্যবিত্তের একাংশের মধ্যে শিক্ষার প্রতি অনীহা ও কুসংস্কারকেও বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর মতামত আবদুল লতিফের চিন্তাধারার সাথে অনেকটাই অভিন্ন ছিল বলা যায়। তবে আমীর আলীর শিক্ষাচিন্তা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে আবদুল লতিফের চেয়ে ভিন্ন ছিল। তিনি ইংরেজির পাশাপাশি মুসলমানদের জন্য আরবি–ফারসি ও উর্দু শিক্ষার প্রতিও অধিক গুরুত্বারোপ করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ১৮৫৩ সাল থেকে ১৮৬৯ সাল পর্যন্ত কলকাতা ও হুগলী মাদ্রাসা সংক্রান্ত যে কয়েকটি শিক্ষা কমিটি গঠিত হয়েছিল তার প্রতিটির সাথেই নবাব আবদুল লতিফ যুক্ত ছিলেন এবং তিনি ঐ সকল কমিটির সুপারিশে মাদ্রাসা শিক্ষা বহাল রাখার আবেদন জানান।[২০] এর ফলে সরকার 'মহসিন তহবিলে'র অর্থ দ্বারা ১৮৭৩-৭৪ সালে বাংলায় মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসার ঘটান। কিন্তু আমীর আলী সরকারের মাদ্রাসা শিক্ষা বিস্তার নীতির তীব্র সমালোচনা করে ইংরেজি শিক্ষার অধিক প্রয়োজনীয়তা কমিশনের নিকট তুলে ধরেন। শুধু তাই নয় তিনি হুগলী, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম মাদ্রাসা বন্ধ করে দিয়ে মহসিন তহবিলের অর্থ দ্বারা কলকাতায় মুসলমানদের জন্য স্নাতক পর্যায়ের একটি আধুনিক কলেজ প্রতিষ্ঠার দাবি জানান। তিনি পাশাপাশি শিক্ষার সকল স্তরে মুসলমানদের জন্য ইংরেজি বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করেন। তবে আমীর আলী ব্যাপকভাবে মাদ্রাসা শিক্ষার বিরোধী থাকলেও ধর্ম শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপক্ষে ছিলেন না। এজন্য তিনি আধুনিক স্কুলগুলোতে প্রয়োজনীয়

আরবি–ফারসি বা উর্দু শিক্ষা প্রচলনের দাবি জানান। অবশ্য ভাষাগত চাপ কমানোর জন্য তিনি উপরোক্ত তিনটি ভাষার মধ্যে যে-কোন দু'টিকে গ্রহণ করার জন্য মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানান। তবে আবদুল লতিফের ন্যায় তিনিও উর্দুকে ভারতীয় মুসলিম সমাজে 'লিঙ্গুয়া ফ্রাংকা' হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।

অন্যদিকে, সৈয়দ আমির হোসাইন শিক্ষা প্রতষ্ঠিানে ধর্ম শিক্ষার প্রচলন পছন্দ করেননি। তিনি মনে করেন মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তি এত মজবুত যে, তাদের পারিবারিক শিক্ষা ও সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে তারা ইসলাম ও সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে যে জ্ঞান লাভ করে তারপর আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্ম না থাকলেও তাতে কিছু আসে যায় না। সুতরাং আমির হোসাইনের চিন্তাকে সম্পূর্ণ আধুনিক বলা যায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনিও আমীর আলীর ন্যায় চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও হুগলী মাদ্রাসা মুসলমানদের জন্য যুগোপযোগী শিক্ষা প্রদানে ব্যর্থ হচ্ছে বলে মনে করেন ও ঐসব মাদ্রাসা বন্ধ বা এগুলোর ব্যয় হ্রাস করে 'মহসিন তহবিলে'র অর্থ দিয়ে কলকাতায় একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার দাবি জানান।

শিক্ষা কমিশনের প্রাদেশিক কমিটির প্রশ্নমালার পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, মুসলিম নারী সমাজের শিক্ষার বিষয়ে কমিশন ততটা সচেতন ছিল না। এ সম্পর্কে শুধুমাত্র সৈয়দ আমির হোসাইনকে একটি মাত্র প্রশ্ন করা হয়। নবাব আবদুল লতিফ বা আমীর আলীকে নারীশিক্ষার বিষয়ে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়নি। তবে আমির হোসাইন নারী শিক্ষার অগ্রগতির ব্যাপারে কোন স্পষ্ট বক্তব্য দেননি। তিনি মুসলিম নারীশিক্ষার দুরবস্থার জন্য সমাজের অসচেতনতাকেই প্রধানত দায়ী করেছেন। তবে কেন তিনি নারী শিক্ষার সুপারিশ বিস্তারিতভাবে দেননি এটি গবেষকদের নিকট প্রশ্নের বিষয়। এখানে এটিও উল্লেখ্য, নবাব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলীর সাক্ষ্যে মুসলিম সমাজের নানা প্রসঙ্গ থাকলেও নারী শিক্ষা সম্পর্কে কোন উচ্চারণ তারা করেননি। এ ধরনের মনোভাবকে তাদের প্রগতিশীল চিন্তাধারার বড় সীমাবদ্ধতা বলা যায়। সুতরাং এটি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, নারীশিক্ষার বিষয়টি তখন সমাজে স্পর্শকাতর ছিল। ধর্মীয় কুসংস্কারের ফলেই যে ঐ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ ক্ষেত্রে যোগ্য নেতৃত্বের অভাবকেও অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে দায়ী করা যায়। তা ছাড়া ব্রিটিশ সরকার দীর্ঘকাল নারীশিক্ষার বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোন পৃষ্ঠপোষণ বা সহযোগিতা করেননি। শিক্ষা কমিশনের প্রশ্নমালা তার প্রমাণ বহন করে।

নারীশিক্ষার বিষয়ে আবদুল লতিফ, আমীর আলী ও সৈয়দ আমির হোসাইনের তেমন ভূমিকা না থাকলেও সার্বিকভাবে মুসলিম সমাজের শিক্ষার অগ্রগতি নিয়ে তাঁরা যে চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন ছিলেন সে বিষয়ে দ্বিমত নেই। তবে আধুনিক শিক্ষার পদ্ধতি নিয়ে তাঁদের মধ্যে বিতর্ক অব্যাহত ছিল। আমরা লক্ষ্য করেছি আমীর আলী এবং আমির হোসাইনের সাক্ষ্যে

মাদ্রাসাশিক্ষা বন্ধ করে দেয়ার জোর দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি তাঁদের ঐসব দাবি তখন স্মারকলিপি আকারেও কেন্দ্রীয় সরকার ও শিক্ষা কমিশনের সভাপতির নিকট তাঁরা প্রেরণ করেন।[২১] তবে সরকার প্রথমে আমীর আলী ও আমির হোসাইনের প্রস্তাবসমূহ অধিক বিবেচনা করেন এবং এগুলোর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সুপারিশ যখন বাস্তবায়নের চিন্তাভাবনা শুরু করেন ঠিক তখনই নবাব লতিফের পক্ষ থেকে একটি পাল্টা স্মারকলিপি সরকারের নিকট পেশ করা হয়।[২২] হুগলী, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী মাদ্রাসা তুলে দিয়ে এগুলোর অর্থ দ্বারা কলকাতায় একটি নতুন ইংরেজি কলেজ স্থাপনের যে পরিকল্পনার কথা তখন শোনা যাচ্ছিল এই দ্বিতীয় স্মারকলিপিতে তার তীব্র বিরোধিতা করা হয়। আবদুল লতিফের মতে, মাদ্রাসা পরিচালনার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থার কারণে ঐ শিক্ষা ব্যর্থ হতে যাচ্ছে। তিনি বলেন যে, মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা ব্যর্থ হওয়ার কারণ সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থায় তুলনামূলকভাবে ফারসি শিক্ষার উপর কম গুরুত্বারোপ। ধর্মভীরু মুসলমানরা মনে করেন যে, সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থায় আরবি–ফারসির স্থান না থাকার জন্যই ইংরেজি শিক্ষিত মুসলমান যুবকদের চরিত্র বিকৃত হয়ে পড়ে এবং সমাজে আর তারা সম্মানিত হয় না। সুতরাং মাদ্রাসা বিলুপ্ত করা সরকারের সংগত কাজ হবেনা। এর ফলে সরকার শেষ পর্যন্ত আবদুল লতিফের মতকেই গ্রহণ করেন এবং মাদ্রাসাশিক্ষা অব্যাহত রেখে হান্টার কমিশনের প্রতেবেদনে মুসলিম শিক্ষার উন্নতিকল্পে ১৭টি বিশেষ সুপারিশ করা হয়।[২৩] কমিশনের এ সকল সুপারিশের ভিত্তিতেই ১৮৮৫ সালে লর্ড ডাফরিন মুসলমানদের শিক্ষার উন্নয়নে বেশ কটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন।[২৪] সৈয়দ আমীর আলী তখন ডাফরিনের প্রস্তাবসমূহকে মুসলিম অধিকারের 'মহাসনদ' বলে অভিনন্দিত করেন।[২৫]

পরিশেষে, ভারতীয় শিক্ষা কমিশনে বাংলার মুসলিম নেতৃবৃন্দের সাক্ষ্যের পর্যালোচনায় দুটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এক. উনিশ শতকের বাংলার মুসলমানদের শিক্ষার চিত্র ও পশ্চাৎপদতার মৌলিক কারণসমূহ, দুই. সমাজে নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিদের শিক্ষা ও সমাজ চিন্তার স্বরূপ। মুসলিম সমাজের দরিদ্রতা, কুসংস্কার, ধর্মীয় ও আর্থিক কারণেই যে তারা শিক্ষায় অনগ্রসর ছিল উপরোক্ত আলোচনায় সেটিই প্রতীয়মান হচ্ছে। তাদের অনগ্রসরতা দূরীকরণে আবদুল লতিফ মাদ্রাসাশিক্ষা পদ্ধতি চালু রেখে ধর্মশিক্ষা ও পাশ্চাত্য বিদ্যা উভয়ের সপক্ষে ওকালতি করেছেন; এতে মনে হয় তিনি গোঁড়ামি ও রক্ষণশীলতারই আশ্রয় নিয়েছেন।[২৬] কিন্তু এটিও ধারণা করা যায়, সমাজ ও পরিস্থিতির চাপেই তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। সমাজকে আঘাত না করে সমাজের সাথে আপোষ করে সমাজের গতিমুখ ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন তিনি। এর অধিক করা হয়ত তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। অন্যদিকে আমীর আলী ও আমির হোসাইনের শিক্ষাচিন্তা অনেকটা একই ধারায় প্রবাহিত ছিল। এ ক্ষেত্রে আমির হোসাইন আমীর আলীর চেয়েও প্রগতিশীল ছিলেন বলা যায়। তাঁরা

আধুনিক ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমই মুসলিম নবজাগরণ চেয়েছিলেন। সুতরাং, তাঁদের চিন্তার বিভক্তির ফলে মুসলিম সমাজে দুটো ধারার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বা এলিট শ্রেণীর উৎপত্তি ঘটে। এ প্রসঙ্গে ড. নাজমুল করিম 'লতিফ গোষ্ঠীকে' 'Old Elite' ও 'আমির গোষ্ঠীকে' 'New Elite' বলে অভিহিত করেন।[২৭]

তথ্যনির্দেশ

১. এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হল: M. Mohar Ali (ed.), *Nawab Abdul Latif Khan Bahadur: Autobiography and other Writing's,* Reprinted, Chittagong: Mehrub Publication, 1968.Enamul Haque (ed.), *Nawab Bahadur Abdul Latif: His Writings and Related Documents*, Dacca: Samudra Prokasani, 1968. Muhammad Abdur Rahim, *Nawab Abdul Latif and Education of Muslims of Bengal,* Dacca: Mrs. Farida Hossain, 1969. K.K. Aziz (ed.), *Ameer Ali: His Life and Work*, Lahore: Publishers United Ltd., 1968. Syed Razi Wasti (ed.), *Memoirs and Other Writings of Syed Ameer Ali,* Karachi: Peoples Publishing House, 1968. Muhammad Abdur Kahim, *Syed Amir Ali & the Muslim Renaissance Movement,* 2nd Edition, Chittagong: Islamic Cultural Centre, 1980.

২. *Despatch from the Court of Director of the East India Company, to the Government General of India in Council on the subject of the Education of the People of India,* Reprinted, No. 49, dated 19th July, 1854, E.B. & A.S.P.O., 1906-07.

৩. Abdul Karim, *Muhammadan Education in Bengal*, Calcutta: Metcalf Press, 1900, p.25.

৪. *Report of the Indian Education Commission 1882,* Calcutta: The Superintendent of Government Printing, 1883.

৫. *প্রাগুক্ত,* p. 2.

৬. কমিশনের ২০ জন সদস্যের নাম ও পেশাগত পরিচয়:
   ১. সৈয়দ আহমদ খান বাহাদুর সি.এস.আই. (পরে তিনি সদস্যপদ প্রত্যাহার করলে তাঁর পুত্র সৈয়দ মাহমুদ নিযুক্ত হন)
   ২. ডি.এম. বারবোর, সচিব, ভারত সরকারের অর্থ বিভাগ।
   ৩. ডব্লিউ.আর. ব্ল্যাকেট, প্রিন্সিপাল, চার্চ মিশন ডিভিনিটি কলেজ, কলকাতা।
   ৪. আনন্দ মোহন বসু, বার এট.ল.।
   ৫. আলফ্রেড ডব্লিউ. ক্রফট, পরিচালক, জনশিক্ষা বিভাগ, বাংলা।
   ৬. কে. ডিটন, প্রিন্সিপাল, আগ্রা কলেজ, উত্তর–পশ্চিম প্রদেশ।
   ৭. জে.টি. ফাউলার, স্কুল পরিদর্শক, মাদ্রাজ।
   ৮. এ.পি. হাউয়েল, কমিশনার, বেড়ার (Berar).
   ৯. এইচ.পি. জেকব, শিক্ষা পরিদর্শক, বোম্বে।
   ১০. ডব্লিউ. লি. ওয়ারনার, ফার্স্ট অ্যাসিটেন্ট কালেক্টর, সাঁতারা, বোম্বে।
   ১১. ডব্লিউ. মিলার, প্রিন্সিপাল, মাদ্রাজ খ্রিষ্টান কলেজ।
   ১২. পি. রঙ্গনাধা মাধলিয়ার, অধ্যাপক, গণিত, প্রেসিডেন্সি কলেজ, মাদ্রাজ।
   ১৩. বাবু ভূদেব মুখার্জী, স্কুল পরিদর্শক, বাংলা।
   ১৪. সি. পিয়ারসন, স্কুল পরিদর্শক, পাঞ্জাব।

১৫. মহারাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর, সদস্য, ভাইসরয়ের আইন পরিষদ।
১৬. কাশীনাথ ত্রিম্বুক তেলাঙ, বার এট.ল., বোম্বে।
১৭. জি.ই. ওয়ার্ড, কালেক্টর, জৌনপুর, উত্তর–পশ্চিম প্রদেশ।
১৮. এ. জিন, পরিচালক, সেন্ট জোসেফ কলেজ, ত্রিচিনপলি।
১৯. সি.এ.আর. ব্রাউনিং, শিক্ষা মহাপরিদর্শক, মধ্যপ্রদেশ।
২০. গোলাম হোসাইন, পাঞ্জাব, এছাড়াও বি.এল. রাইস, পরিচালক, জনশিক্ষা বিভাগ, মহীশূর কমিশনের সচিব হিসেবে মনোনীত ছিলেন। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২

৭. ঐ প্রদেশগুলো ছিল: মাদ্রাজ, বোম্বে, বাংলা, উত্তর–পশ্চিম এবং অযোধ্যা, পাঞ্জাব, সেন্ট্রাল প্রদেশ, হায়দ্রাবাদ।

৮. *Education Commission: Report by the Bengal Provincial Committee with Evidence taken before the Committee and Memorials Addressed to the Education Commission,* Calcutta: The Superintendent of Governemnt Printing, 1884.

৯. *Report of the Indian Education Commission1882*, Appendix B, pp. 629-30.

১০. *Education Commission: Report by the Bengal Provincial Committee1884,* pp.211-215. এ সম্পর্কে আরও দেখুন, *Government of India: Proceedings of the Education Commission in Calcutta and the Evidence of Bengal and Assam Witnesses*, No. 165, Home Department: Central Printing Office, 10-10-1882.

১১. W.W. Hunter, *The Indian Mussulmans,* p. 178, quoted in *Education Commission: Report by the Bengal Provincial Committee 1884,* p. 213. *Proceedings of the Education Commission 1882.*

১২. W.W. Hunter, *The Indian Mussulman*, pp. 178-179, quoted in *Education Commission: Report by the Bengal Provincial Committee 1884*, p.214. *Proceedings of the Education Commission 1882.*

১৩. *Education Commission: Report by the Bengal Provincial Committee 1884*, pp.217-223.

১৪. *প্রাগুক্ত,* p.218. মুসলিম ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ সম্পর্কে আমির আলীর সাক্ষ্যের আরও সমর্থন পাওয়া যায় মুন্সি মেহের উল্লাহর (১৮৬১-১৯০৭) বক্তব্যে: "মুসলমান ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহারা বলেন, লেখাপড়া শিখিয়া কি হইবে? যাহা আছে তাহাই খাইয়া শেষ করিতে পারিব না। যাহারা নিতান্ত দরিদ্র, যাহাদের আহারের সংস্থান নাই, তাহারাই ভিক্ষা করিয়া কোন মতে লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া চাকুরীর উপায় করিতে যত্নবান হয়।" মুন্সি মেহের উল্লাহ,'আমাদের শিক্ষা', *নবনূর*, প্রথম বর্ষ, ১৯ সংখ্যা, ১৩১০, পৃ.৯৭।

১৫. *Education Commission: Report by the Bengal Provincial Committee 1884,* p.219.

১৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২০

১৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৩

১৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৮-২২৯

১৯. মোট ৩০ পৃষ্ঠার ঐ পুস্তিকায় সৈয়দ আমির হোসাইন বাংলা ও ভারতের মুসলিম শিক্ষা সম্পর্কে ১৮৭১-১৮৭৪ সালের সরকারি রেজুলেশনের বিবৃতি তুলে ধরে এর পরবর্তী পদক্ষেপ এবং ফলাফল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তাঁর আলোচনায় তিনি কলকাতা, হুগলী, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীর মাদ্রাসা শিক্ষার পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন। ঐসব মাদ্রাসাগুলো যে মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষা প্রদানে ব্যর্থ হচ্ছে তার সমর্থনে ঐসব প্রতিষ্ঠানের ছাত্র পরিসংখ্যান সরকারের নিকট উপস্থাপন করেন। তিনি তাঁর পুস্তিকায় মুসলমানদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জাগরণের লক্ষ্যে আধুনিক শিক্ষার সংস্কার সম্পর্কে সাত দফা প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ঐ সকল প্রস্তাবে তিনি বলেন যে, জীবিকার ক্ষেত্রে মুসলিম সমাজে সীমিত ইংরেজির চর্চা হিন্দুদের তুলনায় তাদেরকে পশ্চাৎপদ করে রেখেছে। তাঁর মতে, মহসিন

তহবিলের টাকায় পরিচালিত মাদ্রাসাগুলো মুসলমানদেরকে যুগোপযোগী করে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। সুতরাং হুগলি মাদ্রাসার বিলোপ সাধন এবং চট্টগ্রাম ও রাজশাহী মাদ্রাসার ব্যয় হ্রাসকরণ প্রস্তাব তিনি নির্দ্বিধায় করেছেন। ফলে মহসিন তহবিলের যে অর্থ বেঁচে যাবে তা দ্বারা কলকাতা মাদ্রাসা সংলগ্ন পরিসরে একটি বি.এ. কলেজ প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেন– যেখানে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য আবশ্যিক বিষয় হিসেবে পাঠ্য থাকবে। তিনি মনে করেন এভাবে বাংলার মুসলমানদের উচ্চশিক্ষার পথ সুগম হবে। বিস্তারিত দেখুন, Syud Ameer Hossein, *A Pamphlet on Mahomedan Education in Bengal,* Calcatta: G.C. Bose & Co., 1880, pp.20-30.

২০. Abdool Luteef, *A Short Account of My Humble Efforts to Promote Education, Specially Among the Mohamedam*, Calcutta, 1885, pp.7-8, 20-22. আরও দ্রষ্টব্য, Abdool Luteef, *A Minute on the Hooghly Mudrassah,* Written on request of the Hon'ble Sir J.P. Grant, Reprinted, Alipore: Suburban Municipal Press, 1877.

২১. *Report of the Indian Education Commission 1882,* pp.499-500. æMemorial of the National Muhammadan Association, Calcutta to His Excellancy the most Hon'ble the Marquis of Ripon K.G.P.C.G.C.S.I., Viceroy and Governor General of India, 6 February 1882", *Government of India: General Department, Education Proceedings,* para-24, March, 1882.

২২. *Report of the Indian Education Commission1882*, p.500.

২৩. এ সকল সুপারিশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল: মুসলিম শিক্ষার ব্যয়ভার বহনে স্থানীয় পৌরসভা ও প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক তহবিল গঠন, দেশীয় মুসলিম শিক্ষার প্রতিষ্ঠানে ধর্মনিরপেক্ষ বিষয় চালু করা, মুসলিম প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের জন্য বিশেষ মান নির্ধারণ, প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উর্দু ভাষার প্রবর্তন, ইংরেজি শিক্ষার জন্য কলেজ প্রতিষ্ঠা, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের মধ্যম ও উচ্চ বিদ্যালয়ে ফারসি ও উর্দুর প্রচলন, মুসলিম শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ স্কুল স্থাপন, মুসলিমশিক্ষা-পরিদর্শক নিয়োগ, জনশিক্ষা কমিটির প্রতিবেদনে স্বতন্ত্র অধ্যায়ে মুসলিম শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা ইত্যাদি। বিস্তারিত দেখুন, *প্রাগুক্ত*, pp. 505-507.

২৪. Alfred Croft, *Review of Education in India,* Calcutta: Central Printing Office, 1886, pp.320-321.

২৫. Muhammad Abdur Kahim, *Syed Amir Ali and the Muslim Renaissance Movement,* p.20. Amalendu De, *Roots of Seperatism in Nineteenth Century Bengal,* Calcutta: Ratna Prakasan, 1974, p. 34. এই প্রসঙ্গে তিনি লেখেন æAfter this Resolution, Sir William Aitchison,Governor of the Punjab,established eighty scholarships for Muslim students in the province,and Sir Rivers Thompson,Lieutenant Governor of Bengal,likewise encouraged English education and established 120 scholarships for Muslim subjects of the Queen." *Memoirs of Rt. Hon'ble Syed Ameer Ali*, Ernest H. Griffin (ed.), *Islamic Culture,* Vol.V1, 1932, p.170.

২৬. তিনি সৈয়দ আমীর আলী ও তাঁর ন্যায় উচ্চ শিক্ষিত এবং প্রগতিশীল মুসলিম নেতাদের সমালোচনা করতেন এই কারণে যে, তাঁরা পাশ্চাত্য পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করেন এবং ব্রিটিশ কায়দা কানুন অনুসরণ করেন এবং নিজেদের সংস্কারপন্থী বলে নিজেদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। Wilfrid Scawen Blunt, *India Under Ripon: A Private Diary*, London:T.Fisher Unwin, 1909, p. 97.

২৭. Abdul Khair Nazmul Karim, *The Modern Muslim Political Elite in Bengal* (Unpublished Doctoral Thesis), University of London, 1964, p.300, উদ্ধৃত, ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, পুনর্মুদ্রণ ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭, পৃ. ৬৬।

পরিশিষ্ট ১

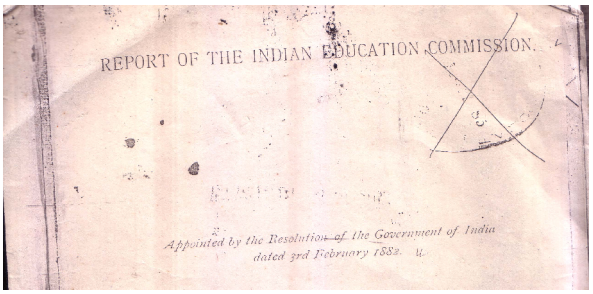

REPORT OF THE INDIAN EDUCATION COMMISSION.

Appointed by the Resolution of the Government of India dated 3rd February 1882.

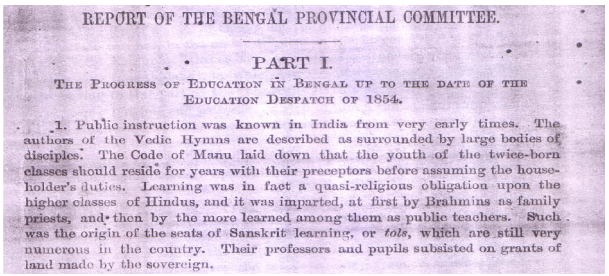

REPORT OF THE BENGAL PROVINCIAL COMMITTEE.

PART I.

THE PROGRESS OF EDUCATION IN BENGAL UP TO THE DATE OF THE EDUCATION DESPATCH OF 1854.

1. Public instruction was known in India from very early times. The authors of the Vedic Hymns are described as surrounded by large bodies of disciples. The Code of Manu laid down that the youth of the twice-born classes should reside for years with their preceptors before assuming the householder's duties. Learning was in fact a quasi-religious obligation upon the higher classes of Hindus, and it was imparted, at first by Brahmins as family priests, and then by the more learned among them as public teachers. Such was the origin of the seats of Sanskrit learning, or *tols*, which are still very numerous in the country. Their professors and pupils subsisted on grants of land made by the sovereign.

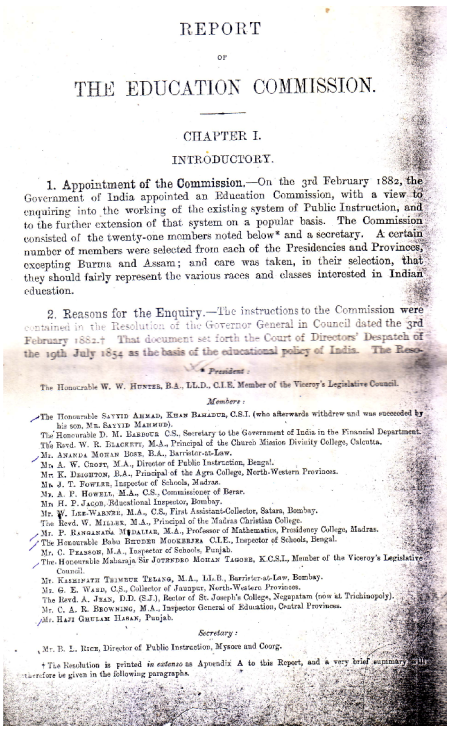

REPORT

OF

THE EDUCATION COMMISSION.

CHAPTER I.

INTRODUCTORY.

1. **Appointment of the Commission.**—On the 3rd February 1882, the Government of India appointed an Education Commission, with a view to enquiring into the working of the existing system of Public Instruction, and to the further extension of that system on a popular basis. The Commission consisted of the twenty-one members noted below* and a secretary. A certain number of members were selected from each of the Presidencies and Provinces, excepting Burma and Assam; and care was taken, in their selection, that they should fairly represent the various races and classes interested in Indian education.

2. **Reasons for the Enquiry.**—The instructions to the Commission were contained in the Resolution of the Governor General in Council dated the 3rd February 1882.† That document set forth the Court of Directors' Despatch of the 19th July 1854 as the basis of the educational policy of India. The Reso-

* *President :*

The Honourable W. W. Hunter, B.A., LL.D., C.I.E. Member of the Viceroy's Legislative Council.

Members :

The Honourable Sayyid Ahmad, Khan Bahadur, C.S.I. (who afterwards withdrew and was succeeded by his son, Mr. Sayyid Mahmud).
The Honourable D. M. Barbour C.S., Secretary to the Government of India in the Financial Department.
The Revd. W. R. Blackett, M.A., Principal of the Church Mission Divinity College, Calcutta.
Mr. Ananda Mohan Bose, B.A., Barrister-at-Law.
Mr. A. W. Croft, M.A., Director of Public Instruction, Bengal.
Mr. K. Deighton, B.A., Principal of the Agra College, North-Western Provinces.
Mr. J. T. Fowler, Inspector of Schools, Madras.
Mr. A. P. Howell, M.A., C.S., Commissioner of Berar.
Mr. H. P. Jacob, Educational Inspector, Bombay.
Mr. W. Lee-Warner, M.A., C.S., First Assistant-Collector, Satara, Bombay.
The Revd. W. Miller, M.A., Principal of the Madras Christian College.
Mr. P. Ranganada Mudaliar, M.A., Professor of Mathematics, Presidency College, Madras.
The Honourable Babu Bhudeb Mookerjea C.I.E., Inspector of Schools, Bengal.
Mr. C. Pearson, M.A., Inspector of Schools, Punjab.
The Honourable Maharaja Sir Jotendro Mohan Tagore, K.C.S.I., Member of the Viceroy's Legislative Council.
Mr. Kashinath Trimbuk Telang, M.A., LL.B., Barrister-at-Law, Bombay.
Mr. G. E. Ward, C.S., Collector of Jaunpur, North-Western Provinces.
The Revd. A. Jean, D.D. (S.J.), Rector of St. Joseph's College, Negapatam (now at Trichinopoly).
Mr. C. A. R. Browning, M.A., Inspector General of Education, Central Provinces.
Mr. Haji Ghulam Hasan, Punjab.

Secretary :

Mr. B. L. Rice, Director of Public Instruction, Mysore and Coorg.

† The Resolution is printed *in extenso* as Appendix A to this Report, and a very brief summary will therefore be given in the following paragraphs.

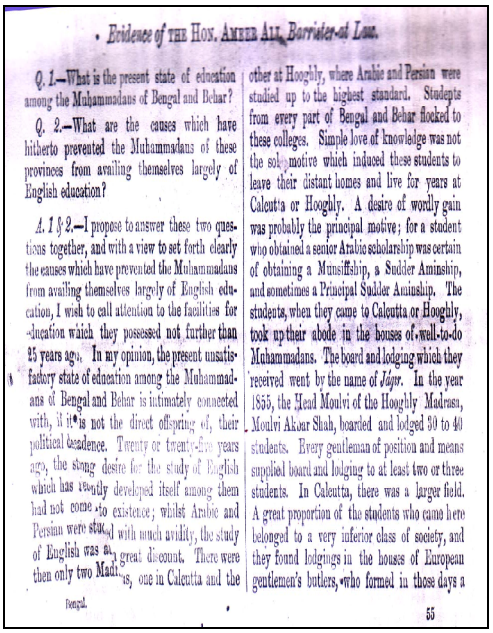

Evidence of THE HON. AMEER ALI, *Barrister-at Law.*

Q. 1.—What is the present state of education among the Muhammadans of Bengal and Behar?

Q. 2.—What are the causes which have hitherto prevented the Muhammadans of these provinces from availing themselves largely of English education?

A. 1 & 2.—I propose to answer these two questions together, and with a view to set forth clearly the causes which have prevented the Muhammadans from availing themselves largely of English education, I wish to call attention to the facilities for education which they possessed not further than 25 years ago. In my opinion, the present unsatisfactory state of education among the Muhammadans of Bengal and Behar is intimately connected with, if it is not the direct offspring of, their political decadence. Twenty or twenty-five years ago, the strong desire for the study of English which has recently developed itself among them had not come to existence; whilst Arabic and Persian were studied with much avidity, the study of English was at a great discount. There were then only two Madrasas, one in Calcutta and the other at Hooghly, where Arabic and Persian were studied up to the highest standard. Students from every part of Bengal and Behar flocked to these colleges. Simple love of knowledge was not the sole motive which induced these students to leave their distant homes and live for years at Calcutta or Hooghly. A desire of wordly gain was probably the principal motive; for a student who obtained a senior Arabic scholarship was certain of obtaining a Munsiffship, a Sudder Aminship, and sometimes a Principal Sudder Aminship. The students, when they came to Calcutta or Hooghly, took up their abode in the houses of well-to-do Muhammadans. The board and lodging which they received went by the name of *Jágir*. In the year 1855, the Head Moulvi of the Hooghly Madrasa, Moulvi Akbar Shah, boarded and lodged 30 to 40 students. Every gentleman of position and means supplied board and lodging to at least two or three students. In Calcutta, there was a larger field. A great proportion of the students who came here belonged to a very inferior class of society, and they found lodgings in the houses of European gentlemen's butlers, who formed in those days a

Bengal. 55

Evidence of MOULVI SYED AMIR HOSSAIN, *Khan Bahadur*.

Ques. 1.—Please state what opportunities you have had of forming an opinion on the subject of education in India, and in what Province your experience has been gained.

Ans. 1.—I entered the Government service 21 years ago. I have ever since taken an interest in the education of my countrymen, though I lay no claim to an active part in the management of educational affairs. For a period of five years I was Personal Assistant to the Commissioner of Bhagulpur Division, and in that capacity was charged with the preparation of annual reports on public instruction in that division. I also dealt with such education questions as came before the Commissioner for disposal. I have been a member of the District School Committee in the several districts of Behar and Bengal. I have been employed since its establishment in the year 1872-73; and I was appointed Secretary of that Committee in the district of the 24-Pergunnahs in the year 1879, which appointment I still hold. In the year 1872-73, while holding the post of Sub-divisional Officer in one of the Behar districts, I was entrusted with the duty of carrying out the scheme of primary education formulated by Sir George Campbell, and the District Officer of Gya thus noticed my services in that direction in his education report for 1872-73:—

"The Sub-divisional Officer of Nowada has personally taken a lively interest in the scheme of primary education, and was the first to carry out the scheme in a full and comprehensive manner. My acknowledgments are specially due to him."

In the year 1880 I wrote a pamphlet on Muhammadan education in Bengal after a careful study of the subject. The pamphlet received the attentive consideration of His Honour the Lieutenant-Governor and the Director of Public Instruction, and some of the suggestions therein made were accepted by the Government.

Ques. 2.—Do you think that in your Province the system of primary education has been placed on a sound basis, and is capable of development up to the requirements of the community? Can you suggest any improvements in the system of administration or in the course of instruction?

Ans. 2.—I think that in the several provinces under the Lieutenant-Governor of Bengal the system of primary education has been placed on a sound footing, and is capable of development up to the requirements of the community. Up to the year 1871-72 less attention seems to have been paid by the Bengal Government to this branch of public instruction; but under the orders passed by Sir George Campbell on the 30th September 1872, a real and substantial effort was made to establish a good system of primary education throughout Bengal. The measures prescribed were of the simplest character. The district officers and the educational authorities were ordered to work together in promoting the rural education of the country, by hunting up the then existing indigenous schools, bringing them on their books, and subsidising them with fixed monthly grants varying from Rs. 2-8 to Rs. 5. The district officers were also asked to open new primary schools or *pathsalas* where none existed. No immediate change was enjoined in the mode of teaching then in vogue in the village *pathsalas*, but a training class was ordered to be established at each district and sub-divisional head-quarters to train the newly-appointed *gurus* in the improved method of teaching. The officers interested in the management of the primary schools were, however, directed to observe the following principles as regards the description of education to be imparted:—

পরিশিষ্ট ২

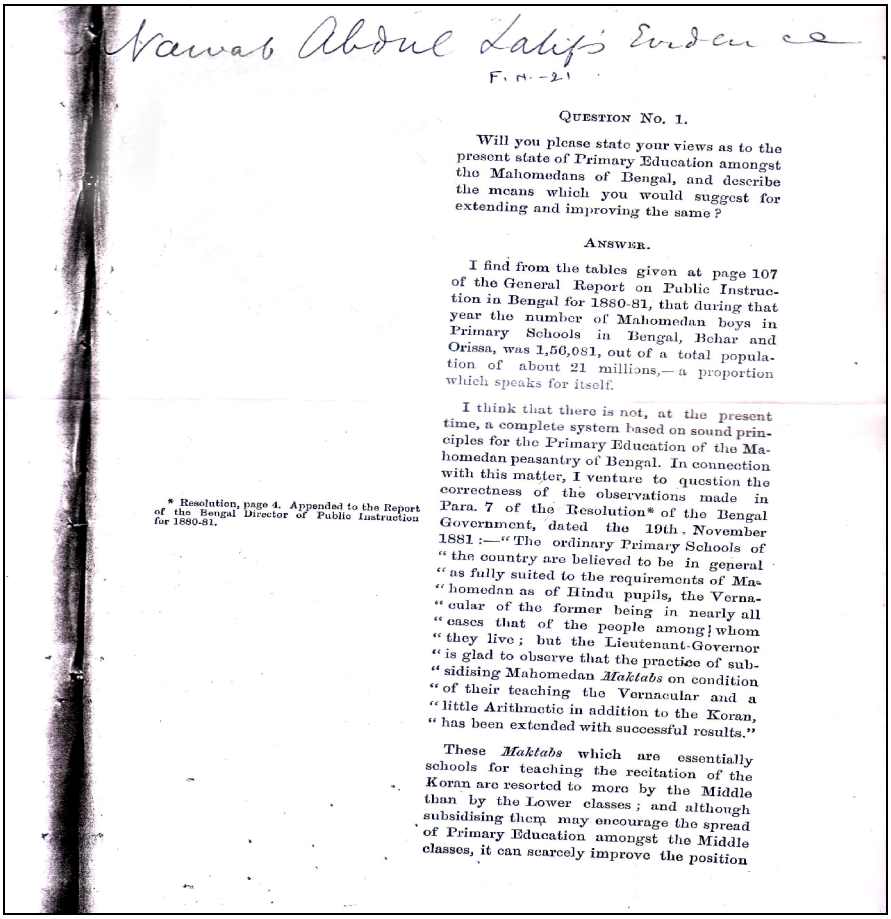

Nawab Abdul Latif's Evidence

F. N.-21

QUESTION No. 1.

Will you please state your views as to the present state of Primary Education amongst the Mahomedans of Bengal, and describe the means which you would suggest for extending and improving the same?

ANSWER.

I find from the tables given at page 107 of the General Report on Public Instruction in Bengal for 1880-81, that during that year the number of Mahomedan boys in Primary Schools in Bengal, Behar and Orissa, was 1,56,081, out of a total population of about 21 millions,—a proportion which speaks for itself.

I think that there is not, at the present time, a complete system based on sound principles for the Primary Education of the Mahomedan peasantry of Bengal. In connection with this matter, I venture to question the correctness of the observations made in Para. 7 of the Resolution* of the Bengal Government, dated the 19th November 1881:—"The ordinary Primary Schools of "the country are believed to be in general "as fully suited to the requirements of Ma- "homedan as of Hindu pupils, the Verna- "cular of the former being in nearly all "cases that of the people among whom "they live; but the Lieutenant-Governor "is glad to observe that the practice of sub- "sidising Mahomedan *Maktabs* on condition "of their teaching the Vernacular and a "little Arithmetic in addition to the Koran, "has been extended with successful results."

These *Maktabs* which are essentially schools for teaching the recitation of the Koran are resorted to more by the Middle than by the Lower classes; and although subsidising them may encourage the spread of Primary Education amongst the Middle classes, it can scarcely improve the position

* Resolution, page 4. Appended to the Report of the Bengal Director of Public Instruction for 1880-81.

[11]

knowledge of Hindi imparted to them only to the small extent which might enable them to read and write the Hindi character —a matter of a few months' study for any student of average parts who has already been well grounded in his own Vernacular.

ABDOOL LUTEEF.

CALCUTTA,
20*th March* 1882.

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, ত্রিংশ খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৯/জুন ২০১২

বাংলার প্রাক-মুঘল শিলালিপিতে হাদিসের ব্যবহার : একটি পর্যালোচনা

মোহাম্মদ মাহমুদুর রহমান*

সারসংক্ষেপ

ইতিহাসের উপাদান হিসেবে শিলালিপির গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাক-মুঘল বাংলার বিভিন্ন স্থানে নির্মিত বিভিন্ন স্থাপত্যের গাত্রে উৎকীর্ণ শিলালিপিতেও একই ভাবে ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিভিন্ন তথ্য ও দলিল পাওয়া যায়। স্থাপত্যগুলো যেমন অধিকাংশই ধর্মীয় উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল, তেমনি শিলালিপিগুলোতে ধর্মীয় উপাদানের ব্যবহারও উল্লেখযোগ্য মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। মহানবীর (স.) হাদিসও সেই ধর্মীয় উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন শিলালিপিতে ব্যবহৃত এ হাদিসগুলো ধর্মীয় উদ্দেশ্য প্রকাশ করলেও এগুলোর মাধ্যমে ইমারতের বিভিন্ন আঙ্গিক, সমাজ-সংস্কৃতির বাস্তব প্রকৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য প্রতিফলিত হয়েছে। তাছাড়া শিলালিপিতে এরূপ ধর্মীয় উপাদানের ব্যবহার তাদের ধর্মীয় জ্ঞান ও ধর্মচর্চা সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করে।

ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিকে বাংলায় মুসলিম বিজয়ের মাধ্যমে মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে এ অঞ্চলে মুসলিম সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। মুসলিম সংস্কৃতির মূল দুটো উৎস হল– কুরআন ও সুন্নাহ। এটাই মহানবীর (স.) আদর্শ। তাঁর ইন্তেকালের পর সেই আদর্শকে সামনে নিয়ে মুসলমানরা সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। বঙ্গ বিজয়ী এবং আগত মুসলমানরাও সে আদর্শে উদ্বুদ্ধ ছিল। ফলে বঙ্গীয় মুসলিম সংস্কৃতিতে কুরআন ও হাদিসের সুস্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তারা বাংলায় মসজিদ মাদ্রাসাসহ প্রচুর স্থাপত্য গড়ে তোলে। এসব স্থাপত্যের শিলালিপিতে কুরআনের অনেক আয়াত ও হাদিস জায়গা করে নেয়। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা প্রাক-মুঘল মধ্যযুগের বাংলার স্থাপত্যের শিলালিপিতে স্থান করে নেয়া হাদিসগুলো নিয়ে আলোচনার প্রয়াস পাব। প্রাপ্ত হাদিসগুলোতে তেমন বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত না হলেও বাংলার শিলালিপিতে হাদিসের ব্যবহারিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

প্রাক-মুঘল যুগে বাংলায় প্রাপ্ত শিলালিপিগুলোকে ব্যবহৃত হাদিসের বিষয়বস্তু অনুসারে ছয় ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১) মসজিদ নির্মাণের ফজিলত তথা মাহাত্ম্য ও পুণ্যলাভের বর্ণনা
২) মসজিদের গুরুত্ব বর্ণনা
৩) মসজিদের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৪) নামাজ আদায় সংক্রান্ত
৫) জ্ঞানার্জন ও জ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতায় উৎসাহ প্রদান এবং
৬) 'আয়াতুল কুরসি'র গুরুত্ব বর্ণনা।

মসজিদ নির্মাণের মাহাত্ম্য ও পুণ্যার্জন তথা ফজিলত বর্ণনা

প্রাক-মুঘল যুগে বাংলার অধিকাংশ শিলালিপিতে মসজিদ নির্মাণের ফজিলত বর্ণনা বিষয়ক হাদিসের ব্যবহার দেখা যায়। হাদিসগুলোতে মসজিদ নির্মাণের ফজিলত বর্ণনার সাথে সাথে মসজিদ নির্মাণে উৎসাহও প্রদান করা হয়েছে। হাদিসগুলোর বিষয়বস্তু ও শব্দচয়ন সাদৃশ্যপূর্ণ। যেমন–

১. যে ব্যক্তি পৃথিবীতে একটি মসজিদ নির্মাণ করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন।
২. যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করেন।
৩. যে ব্যক্তি পৃথিবীতে একটি মসজিদ নির্মাণ করে আখেরাতে আল্লাহ তার জন্য সত্তরটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন।
৪. যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন।
৫. যে ব্যক্তি পৃথিবীতে একটি মসজিদ নির্মাণ করে আখেরাতে আল্লাহ তার জন্য চল্লিশটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন।
৬. যে ব্যক্তি পৃথিবীতে একটি মসজিদ নির্মাণ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করে আল্লাহ জান্নাতে তার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করেন।

মসজিদ নির্মাণকারীর জন্য পরকালে কয়টি প্রাসাদ নির্মিত হবে এ নিয়ে হাদিসে মতপার্থক্য রয়েছে।

শিলালিপিতে এসব হাদিস উল্লেখের মাধ্যমে নির্মাতার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। নির্মাতাগণ মসজিদ নির্মাণের এত বড় ফজিলত অর্জনের নিমিত্তে এসব মসজিদ নির্মাণ করেন বলে এই হাদিসগুলোর মাধ্যমে ঘোষিত হয়েছে। মহানবীর হাদিসের প্রভাব যে তৎকালীন সমাজে ব্যাপকভাবে পড়েছিল তা বাংলার প্রাক-মুঘল যুগের মসজিদের সংখ্যা গণনায় প্রমাণিত। উল্লেখ্য, প্রাথমিক আমলে মুসলমানরা যখন বিভিন্ন এলাকা অধিকার করেছিল তখন সে-সব স্থানে তারা বিশেষ করে মসজিদ নির্মাণ করে নিজেদের সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপন করে। সে-সব স্থাপত্যের শিলালিপিতে যে-সব কুরআনের আয়াত ও হাদিস রয়েছে তা দ্বারা সেগুলো নির্মাণের উদ্দেশ্য যাচাই করা হয়েছে। যেমন– উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিক কর্তৃক ৬৯১ সালে জেরুজালেমে নির্মিত "কুব্বাতুস্ সাখ্‌রা" (Dome of the

Rock)-কে অনেকে মহানবীর মিরাজ গমনের স্মৃতি বিজড়িত বলে বর্ণনা করেন। কিন্তু পবিত্র কুরআনে মিরাজের ঘটনা সম্পর্কিত প্রসিদ্ধ আয়াতটি[১] শিলালিপির অন্যান্য অনেক আয়াতের মধ্যে অনুপস্থিত বলে সেটিকে মিরাজের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত ইমারত বলে গ্রহণ করতে অনেক আধুনিক পণ্ডিত রাজি নন।[২] আর বাংলার প্রাক-মুঘল যুগে অনেক মসজিদ নির্মাণ ও সেগুলো নির্মাণের উদ্দেশ্যও একই সূত্রে গাঁথা।

শিলালিপিতে মহানবীর হাদিসের উল্লেখ নির্মাতার উদ্দেশ্য প্রমাণের পাশাপাশি পরবর্তী অন্যান্য অনেক মসজিদ নির্মাণে যে উৎসাহ যুগিয়েছিল তা বলা বাহুল্য। ইমারতের শিলালিপিতে হাদিসের ব্যবহার নির্মাতাদের হাদিস জ্ঞান সম্পর্কে ধারণা দেয়।

মসজিদ নির্মাণের ফজিলত বর্ণনা বিষয়ক হাদিস সম্বলিত শিলালিপিগুলোর মধ্যে ইলিয়াস শাহী সুলতান সিকান্দার শাহের বিহারের ভাগলপুর শিলালিপিতে (১৩৬৭ খৃ.) একটি বিশেষ বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। সাধারণভাবে বাংলার মুসলিম আমলের শিলালিপিতে কুরআনের আয়াত অথবা হাদিস লিপির প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু এখানে মহানবীর হাদিসের উল্লেখ করা হয়েছে শেষ দিকে এবং মুদ্রায় ব্যবহৃত সুলতান তাঁর উপাধি '*আল-মুজাহিদ ফি সাবিল আল-রাহমান*' (আল্লাহর পথে সংগ্রামী) অথবা '*আবুল মুজাহিদ*' (মহান সংগ্রামী)-এর পরিবর্তে শুধু '*আল-মুজাহিদ*' (সংগ্রামী) উপাধি গ্রহণ করেছেন।[৩]

সুলতান সিকান্দার শাহের হুগলির মুল্লা সিমলা শিলালিপিতে (১৩৭৫-৭৬ খৃ.) মসজিদ নির্মাণের ফজিলত বিষয়ক হাদিস বর্ণনার পূর্বে পবিত্র কুরআনের সুরা জিনের ১৮ নম্বর আয়াতের উল্লেখ রয়েছে–

وان المساجد لله فلاتدعوا مع الله احدا-

(আর নিশ্চয়ই মসজিদসমূহ আল্লাহর জন্য, সুতরাং তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডেকো না।)

শিলালিপিটি হুগলি জেলার বৈদ্যবাটি রেল স্টেশনের পশ্চিম দিকে মুল্লা সিমলা গ্রামে সুফি শাহ আনওয়ার কুলি হালভির[৪] সমাধিতে পাওয়া গেছে। শিলালিপিতে মসজিদ নির্মাণের ফজিলত সম্পর্কিত হাদিসের সাথে শির্‌ক্ বিরোধী বিশেষ করে মসজিদে শির্‌ক্ বিরোধী পবিত্র কুরআনের আয়াতের উল্লেখের মাধ্যমে তৎকালীন সমাজ জীবনের একটি বিশেষ দিক উন্মোচিত হয়েছে। তৎকালে সে সমাজে শির্‌কের ব্যাপক প্রচলন ছিল। হয়ত এমন অনেক মসজিদ ও ধর্ম চর্চার কেন্দ্র ছিল যেগুলো শির্‌কের লালন ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। অবশ্য হিন্দু প্রধান বাংলার মুসলমানদের ধর্ম চর্চায় শিরকের প্রভাব অস্বাভাবিক কিছু নয়।

সুলতান জালালুদ্দিন মুহাম্মদ শাহের সুলতানগঞ্জ (গোদাগাড়ি, রাজশাহী) শিলালিপিতে (১৪৩২ খৃ.) প্রথমে কুরআনের আয়াতের পর হাদিসের উল্লেখ থাকলেও পরবর্তীকালে

আবার কুরআনের আয়াত এবং হাদিসের উল্লেখ রয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলার মুসলিম আমলের শিলালিপির স্বাভাবিকতায় কিছুটা ছেদ পড়েছে। অবশ্য কুরআনের আয়াত ও হাদিসের অনুবাদ অনুসরণ করলে দেখা যায় যে, প্রথমে কুরআনের আয়াতে আল্লাহর মহিমা কীর্তন করা হয়েছে, তারপর মসজিদ নির্মাণের ফজিলত সম্পর্কিত হাদিসের বর্ণনা রয়েছে। পরবর্তী সময়ে সেই মসজিদে নামাজ আদায়ের সময় নির্দেশক আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর মসজিদের গুরুত্ব সম্পর্কিত হাদিস এবং সবশেষে জ্ঞানার্জন ও পৃষ্ঠপোষকতায় উৎসাহ প্রদান বিষয়ে মহানবীর হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বারবার কুরআনের পরে হাদিস এবং হাদিসের পরে কুরআনের উল্লেখ দ্বারা পরস্পরের পরিপূর্ণতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন পবিত্র কুরআনে[৫] এসেছে–

وما ينطق عن الهوى- ان هو الا وحى يوحى-

(তিনি কিছুই বলেন না তা ব্যতীত, যা ওহি হয়।)

এ থেকে পবিত্র কুরআন ও হাদিসের পারস্পরিক অবস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। লিপির ঐতিহাসিক অংশে শুধু মসজিদ নির্মাণের বর্ণনা পাওয়া যায়। অথচ এটি ছিল একটি মাদ্রাসা ভিত্তিক মসজিদ। যেমন উৎকীর্ণ হাদিসে এসেছে– 'যদি কেউ জ্ঞান অনুসন্ধানকারীর জন্য এক দিরহাম খরচ করল, সে যেন আল্লাহর রাস্তায় এক স্তূপ লাল স্বর্ণ ব্যয় করল'। উৎকীর্ণ হাদিস অনুসারে ইমারতটি একটি আবাসিক মাদ্রাসা ভিত্তিক মসজিদ যে ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এখানে হাদিসের জ্ঞান অনুসন্ধানকারী (**طالب العلم**) শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ। হাদিসে জ্ঞান অনুসন্ধানকারী শব্দের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, জ্ঞান অনুসন্ধানের (**طلب العم**) ওপরে নয়; যাতে শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ প্রকারের আবাসিক ব্যবস্থা মসজিদের মধ্যে অথবা চারদিকে ছিল বলে ধারণা পাওয়া যায়।[৬] এম এ গফুরের মতে, যদিও এই মাদ্রাসা ভিত্তিক মসজিদটি সুলতান জালালুদ্দিন মুহাম্মদ শাহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তবুও এর পরিচালনার খরচ মাঝে মধ্যে জনসাধারণের দান থেকে ব্যবস্থা করা হত; যার ইঙ্গিত লিপিতে পাওয়া যায়। শিলালিপির **خيرة** (খায়রাত) শব্দটি দ্বারা এক্ষেত্রে ধারণা পাওয়া যায়। শব্দটি অন্যান্য মাদ্রাসা তৈরির শিলালিপিতেও পরিলক্ষিত হয়। আমরা আরবি সূত্র থেকে জানি যে, সুলতান জালালুদ্দিন মুহাম্মদ শাহ একজন মহান নির্মাতা ছিলেন। তাঁর পিতা কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রচুর মসজিদ এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তিনি নতুনভাবে গড়ে তোলেন। তাঁর ক্ষমতায় আসীন হওয়ার প্রেক্ষাপট এমন একটি ধর্মীয় নীতি গ্রহণকে প্রয়োজনীয় করে তোলে, যা তাঁর ক্ষমতার মূল অবলম্বন মুসলিম ধর্মবেত্তা ও উচ্চপদস্থদের আশ্বস্ত করেছিল। ইসলামী বিশ্বের নৈতিক সমর্থন লাভের জন্য তিনি পবিত্র শহর মক্কায় একটি বড় মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন।[৭]

সুলতান জালালুদ্দিন ফতেহ শাহের মাহদিপুর (গৌড়, পশ্চিমবঙ্গ) শিলালিপিতে (১৪৮৪ খৃ.) সর্বপ্রথম[৮] *'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম'* ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা সাধারণভাবে পবিত্র কুরআনের আয়াত উল্লেখের পূর্বে আল্লাহর নাম উল্লেখ করে থাকি। কিন্তু এখানে শুধু হাদিসের পূর্বে *'বিসমিল্লাহর'* ব্যবহার দ্বারা একটি ব্যতিক্রমী উদাহরণ পাওয়া যায়।[৯] এখানে সুলতানের অতি ধার্মিকতার প্রমাণ রয়েছে। অবশ্য সুলতানের অপর কোন কুরআনের আয়াত অথবা হাদিস সম্বলিত শিলালিপিতে *বিসমিল্লাহর* উল্লেখ দেখা যায় না। তাই শিলালিপিটি পৃথক গুরুত্ব বহন করে। এ শিলালিপিতেই সুলতান জালালুদ্দিন ফতেহ শাহ সর্বপ্রথম বিভিন্ন উপাধি গ্রহণ করেছেন, যার দ্বিতীয় উদাহরণ নেই। তিনি *'সুলতান আল-সালাতিন'* (রাজাদের রাজা), *'কাহ্‌রমান ফিল-মায়ে ওয়াল-তিন'* (নৌ এবং স্থলযুদ্ধে পরাক্রমশালী), *'আলিম উলুম আল-আদইয়ান ওয়াল-আবদান'* (ধর্ম বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের সর্ব বিষয়ে শিক্ষিত), *'কাসিফ-ই-আসরার আল-কুরআন'* (কুরআনের গোপন বিষয়সমূহ প্রকাশকারী), *'খলিফাতুল্লাহ বিল-হুজ্জাত ওয়াল-বুরহান'* (নিদর্শন ও প্রামাণ্য সাক্ষ্যের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতিনিধি) প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করেছেন। এখানে ধর্মীয় দুটো উপাধি খুবই গুরুত্বপূর্ণ – *'কাসিফ-ই-আসরার আল-কুরআন'* এবং *'আলিম উলুম আল-আদইয়ান ওয়াল-আবদান'* বাংলার সুলতানদের এরূপ উপাধি কিছুটা ব্যতিক্রমী। সে-হিসেবে স্বতন্ত্র উপাধি সম্বলিত এ শিলালিপিতে হাদিসে রাসুলের প্রথমে *'বিসমিল্লাহ'* ব্যবহারের যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া সম্ভব। অবশ্য বাংলার প্রাক-মুঘল আমলের শুধু হাদিস সম্বলিত শিলালিপিতে *'বিসমিল্লাহ'* ব্যবহারের আরো উদাহরণ পাওয়া যায়, যাতে মুসলিম সংস্কৃতির *বিসমিল্লাহর* মাধ্যমে যে-কোন কাজ শুরু করার মত একটি সাধারণ বিষয় প্রকাশিত হয়।[১০] যেমন– সুলতান শামসুদ্দিন মুজাফফর শাহের চম্পানগর (ভাগলপুর, বিহার) শিলালিপি (১৪৯১ খৃ.) ও সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের সাদিপুর (মালদা, পশ্চিমবঙ্গ) খণ্ডিত শিলালিপি।

মসজিদের গুরুত্ব বর্ণনা

প্রাক-মুঘল যুগের দুটো শিলালিপিতে মসজিদের গুরুত্ব সম্পর্কিত হাদিসের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ক. সুলতান গিয়াসুদ্দিন ইওয়াজ খলজির পুত্র আলিশেরের বাংলায় প্রাক-মুঘল যুগের সর্বপ্রাচীন সিয়ান শিলালিপিতে (১২২১ খৃ.) প্রাপ্ত হাদিসটি হল:

الصحيح الناس فى مساجدهم والله فى حوايجهم-

(সৎ লোকেরা যখন মসজিদে অবস্থান করে তখন আল্লাহ তাদের প্রয়োজনগুলো দেখাশুনা করেন।)

খ. সুলতান জালালুদ্দিন মুহাম্মদ শাহের সুলতানগঞ্জ শিলালিপিতে (১৪৯২) উল্লেখিত হাদিসটি হল:

خير البقاع مساجدها شر البقاء اسواقها (كانه زنى)-

(পৃথিবীর উৎকৃষ্ট স্থান হল মসজিদসমূহ আর নিকৃষ্ট স্থান হল বাজারসমূহ।)

মুসলিম সংস্কৃতির মূল কেন্দ্র হল মসজিদ। মদিনা মসজিদে বসে মহানবী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করতেন। আমরা বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদের বিভিন্ন ব্যবহার সম্পর্কে তথ্য লাভ করেছি। আলোচ্য হাদিস দুটোর শাব্দিক অর্থ ও শব্দ চয়ন ভিন্ন হলেও হাদিস দুটোতে স্পষ্টভাবে মুসলমানদের জন্য মসজিদের গুরুত্ব ঘোষণা করা হয়েছে, যাতে মুসলমানরা মসজিদমুখী হয়, মসজিদকে তাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে পরিণত করে; যেমনটি প্রাথমিক যুগে ইসলামে পাওয়া যায়। শিলালিপিদুটোতে বাংলার প্রাক-মুঘল আমলে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত মসজিদ নির্মাণের ফজিলত বর্ণনা বিষয়ক হাদিসের পরিবর্তে মসজিদের গুরুত্ব সম্পর্কিত হাদিসের ব্যবহার একটি লক্ষণীয় বিষয়। এখানে নির্মাতার উদ্দেশ্যের ব্যাপকতা পরিলক্ষিত হয়। নির্মাতা মসজিদ নির্মাণের ফজিলত উপলব্ধি করার সাথে সাথে মসজিদ নির্মাণকে সার্থক করার নিমিত্তে মহানবীর বাণী খোদাই করেছেন, যাতে মুসলমানদের মসজিদমুখী করে মসজিদ ভিত্তিক সংস্কৃতি সমাজে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়।

মসজিদের গুরুত্ব বিষয়ক হাদিস সম্বলিত দ্বিতীয় শিলালিপিতে সে সময়কার সমাজের অপর আরেকটি চরিত্রের বিষয় ফুটে ওঠে। হাদিসে উৎকৃষ্ট স্থান হিসেবে মসজিদের সাথে নিকৃষ্ট স্থান হিসেবে বাজারকে চিহ্নিত করা হয়েছে। আমাদের বাংলাদেশে গ্রামে-গঞ্জে এখনও লোকজনের সবচেয়ে বড় আড্ডাখানা হল বাজার। সুলতান জালালুদ্দিন মুহাম্মদ শাহের সময়ও এটি চালু ছিল, যেখানে মানুষের বিভিন্ন কাজে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। হয়ত সে সময় সুদের কারবার জমজমাট ছিল, যা ইসলামে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এখনও আমাদের দেশে হাট-বাজারে জুয়া খেলার প্রচলন রয়েছে। এটা জালালুদ্দিন মুহাম্মদের শাসনকালেও বাংলায় প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়। এছাড়া বাজারে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষের সমাগম হত, আর বেশি সংখ্যক মানুষের সমাগমে সমাজ ও রাষ্ট্র-বিরোধী কার্যকলাপ বেশি হওয়ার সুযোগ থাকে। ফলে এ বিষয়গুলো সামনে এনেই নির্মাতা সংশ্লিষ্ট হাদিসটি সচেতনভাবে উৎকীর্ণ করেছেন এবং সে সময়ের সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মানুষকে নিকৃষ্ট স্থান বাজারে বেশি সময় কাটানো থেকে মসজিদে সময় কাটানোর আহ্বান জানানো হয়। এছাড়া হয়ত সে সময় বাজারের ব্যবসায়ীরা ধর্ম-কর্ম বাদ দিয়ে তাদের ব্যবসা নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকত বলে এ ধরনের হাদিস উৎকীর্ণ করে তাদেরকে মসজিদে এসে ধর্ম-কর্ম পালনের আহবান জানানো হয়ে থাকতে পারে। অবশ্য শামসুদ্দিন আহমেদ শিলালিপির লেখায় কিছু

ভুল প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর মতে এই ভুল মিসকার্ভিং অথবা লিপি উৎকীর্ণকারীর কারণে হতে পারে। যেমন দ্বিতীয় লাইনে আমরা বহুবচন শব্দ **اقيموا** পাই। কিন্তু পবিত্র কুরআনে এখানে একবচন শব্দ **اقيم** ব্যবহৃত হয়েছে। আর এখানে উদ্ধৃত দুটো হাদিস যেমন–

شرالبقاء الخ এবং **خير البقاء الخ** প্রকৃত উদ্ধৃতি নয়। কিন্তু প্রকৃত বিষয়টি অন্যান্য বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশ পায়।[১১]

মসজিদের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ

সুলতান নাসিরুদ্দিন নুসরাত শাহের সময়ে মসজিদের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কিত একটি হাদিসের উল্লেখ পাওয়া যায়। সাতগাঁওয়ের দ্বিতীয়[১২] শিলালিপিতে (১৫৩০ খৃ.) হাদিসে মসজিদের সম্পত্তি অবৈধভাবে দখল করাকে কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করা হয়েছে।

মহানবী বলেছেন:

من تصرف باغضب مال المسجد والاوقان كالزنا ابنه وامه واخته-

المساجد من الاوقات... نوروجهه يوم القيامة كليلة البدر-

(যে ব্যক্তি মসজিদের সম্পত্তি ও ওয়াক্‌ফ্ সম্পত্তি অবৈধভাবে দখল করে সে যেন তার কন্যা, মাতা এবং বোনের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ্ . . . (করলে) কিয়ামতের দিন তার মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় আলোকিত হবে।)

মসজিদ নির্মাণের ফজিলত বর্ণনা ও মসজিদের গুরুত্ব সংক্রান্ত হাদিসের পরিবর্তে মসজিদের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও মসজিদে দান সংক্রান্ত হাদিসের উল্লেখ সমাজ-সংস্কৃতির নতুন দিক উন্মোচন করে। মসজিদের প্রাত্যহিক, মাসিক ও বার্ষিক ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়। আর উৎসাহী মুসলমানরা সে ব্যয় নির্বাহের জন্য মসজিদে বিভিন্নভাবে দান করে থাকে। তাছাড়া মসজিদ যখন নির্মাণ করা হয় তখন বা তার পরবর্তী সময়ে মসজিদের ব্যয় নির্বাহের জন্য সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ্ করা হয়। আর আল্লাহর ঘরের সেই সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশেষভাবে হাদিসটি শিলালিপিতে উল্লেখ করার কারণে ধারণা হয় যে, সে সময় সংশ্লিষ্ট এলাকায় মসজিদের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ হুমকির সম্মুখীন হয় এবং সেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তিও যে হুমকির বাইরে ছিল না তা বলা বাহুল্য। আবার একই সাথে মসজিদে দানকরণে উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়ক হাদিসের উল্লেখের মাধ্যমে ধারণা করা হয়, তখন মসজিদটি পরিচালনার ব্যয় নির্বাহে সংকট দেখা দিয়েছিল। অথবা মসজিদটির ব্যয় নির্বাহের ক্ষমতা সাধারণ মানুষের ছিল না।

নামাজ আদায় সংক্রান্ত

নামাজ আদায়ের আহ্বান সংক্রান্ত দুটি হাদিস পাওয়া যায়:

ক. সুলতান আলাউদ্দিন হুসাইন শাহের আজিম নগর (ঢাকা) শিলালিপিতে (১৫০৪ খৃ.) উল্লিখিত হাদিস:

عجلو بالصلواة قبل الفوت وعجلو بالتوبة قبل الموت

(তোমরা নামাজের সময় শেষ হবার পূর্বে দ্রুত নামাজ আদায় করবে এবং মৃত্যুর পূর্বে দ্রুত তওবা করবে।)

খ. সুলতান নাসিরুদ্দিন নুসরাত শাহের সাতগাঁও (হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ) দ্বিতীয় শিলালিপিতে (১৫৩০ খৃ.) উল্লিখিত হাদিস:

اذا خرجت من بيتك ويوم الجمعة فانت مهاجر - فان مات فى الطريق فانت فى الجنة فى عليين -

(যখন তুমি তোমার ঘর থেকে জুময়ার দিন বের হও তখন তুমি মুহাজির। যদি তুমি সে পথে মৃত্যুবরণ কর, তবে তুমি জান্নাতে সর্বোচ্চ আসন লাভ করবে।)

প্রথম হাদিসে সাধারণভাবে সময় অনুযায়ী নামাজ আদায় করার এবং দ্রুত তওবা করার নির্দেশনা রয়েছে। বিশেষভাবে এই হাদিস দুটি উল্লেখের কারণে শিলালিপি দুটি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। সাধারণভাবে মসজিদ নির্মাণের ফজিলত বর্ণনা সংক্রান্ত হাদিস উল্লেখের পরিবর্তে নামাজ আদায়ে যত্নবান হওয়ার নির্দেশনা রয়েছে। প্রথম হাদিসে যথাসময়ে নামাজ আদায় এবং দ্বিতীয় হাদিসে জুময়ার নামাজের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। এই হাদিস দুটিতে সমসাময়িক কালে নামাজের গুরুত্ব হারিয়ে যাওয়ার ফলে নতুনভাবে নামাজে যত্নশীল হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে বলে মনে হয়। প্রথম হাদিসে যথাসময়ে নামাজ আদায়ের তাগিদ সুস্পষ্ট।

দ্বিতীয় হাদিসে জুময়ার মসজিদে উপস্থিতির গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। মহানবী (স.) বলেছেন– জুময়ার দিন হল গরীবের ঈদের দিন। তাছাড়া জুময়ার নামাজের ধর্মীয় বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। জুময়ার নামাজের খুতবায় উপস্থিত মুসল্লিদের জন্য দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য থাকে – যেখানে সপ্তাহে একবার মুসলমানরা একত্রিত হয় এবং মুসলমানদের সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি পায়। এ ছাড়া হাদিসটি দ্বারা নির্মিত মসজিদটি যে জামি মসজিদ ছিল তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। শিলালিপির ঐতিহাসিক অংশে জামি মসজিদের কথা উল্লেখ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে নির্মাতার হাদিস জ্ঞান যে উন্নত ছিল তা বলাই বাহুল্য। নির্মাতা জামি মসজিদের শিলালিপিতে অত্যন্ত সার্থকভাবেই হাদিসটি উৎকীর্ণ করেছেন।

প্রথম হাদিসে যথাসময়ে নামাজ আদায়ের নির্দেশনার সাথে সাথে তওবা করার নির্দেশনা দ্বারা ধারণা হয় সে সময় সংশ্লিষ্ট সমাজে নামাজ যথাসময়ে আদায়ে মুসলমানদের মধ্যে তেমন আগ্রহ ছিল না এবং তারা ইচ্ছাকৃত নামাজ কাজা করত। কিন্তু এটা ছিল কবিরা গুনাহ। কবিরা গুনাহ থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হল তওবা করা। উৎকীর্ণ শিলালিপিতে হয়ত সে বিষয়ে মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

জ্ঞানার্জন ও জ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতায় উৎসাহ প্রদান

জ্ঞানার্জন ও জ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতায় উৎসাহ প্রদান বিষয়ক হাদিস সম্বলিত প্রাক-মুঘল বাংলার তিনটি শিলালিপি পাওয়া যায়–

ক. জাফর খানের মসজিদ (ত্রিবেণী, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ) শিলালিপিতে (১২৯৮ খৃ.) উল্লিখিত হাদিসটি হল:

تعلمو العلم فان تعلمه لله طاعة وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح وتحسينه لله مسرة...

(তোমরা জ্ঞানান্বেষণ কর, আল্লাহর খাতিরে জ্ঞানার্জন হল তাঁর আনুগত্য করা, জ্ঞানের অনুসন্ধান হল আল্লাহর প্রতি অনুরক্ত হওয়া, জ্ঞানের আলোচনা হল ইবাদত, আল্লাহর জন্য এর সৌন্দর্য বৃদ্ধি হল আনন্দ . . .।)

খ. সুলতান আলাউদ্দিন হুসাইন শাহের সময়কালের (১৫০২ খৃ.) গৌড় মাদ্রাসার শিলালিপিতে (পশ্চিমবঙ্গ, ভারত) উল্লিখিত হাদিসটি হল:

اطلبو العلم ولو بالصين-

(জ্ঞানানুসন্ধান কর, যদিও তা চীনে হয়।)

গ. সুলতান আলাউদ্দিন হুসাইন শাহের সময়কালের (১৫০৩-৪ খৃ.) দারাসবাড়ি মাদ্রাসা শিলালিপিতে (ফিরোজপুর, গৌড়, নবাবগঞ্জ) উল্লিখিত হাদিসটি হল:

من اوى عا لما اواه الله يوم القيامة-

(যে ব্যক্তি আলেমদের আশ্রয় প্রদান করবে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন আশ্রয় প্রদান করবেন।)

যদিও প্রথম শিলালিপিটি জাফর খানের মসজিদের সাথে পাওয়া যায়, তথাপি এতে একটি মাদ্রাসা নির্মাণের বর্ণনা পাওয়া যায়। লিপিতে জনৈক কাজি আন-নাসির মুহাম্মদ মাদ্রাসার আবাসিক ছাত্র ও কর্মচারীদের জন্য যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বর্ণনা পাওয়া যায়। এটা হল বাংলার মাদ্রাসা নির্মাণ সংক্রান্ত প্রাচীনতম শিলালিপি, যা বংলার মুসলিম শাসকদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রমাণ হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।[১৩]

লিপির বর্ণনায় যেভাবে মাদ্রাসাটি কল্যাণ তহবিল থেকে নির্মিত ও পরিচালিত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় তার সাথে উৎকীর্ণ হাদিসের বর্ণনা পুরোপুরি সাদৃশ্যপূর্ণ। এখানে জ্ঞানার্জনের বিভিন্ন দিক নিয়ে সাধারণ যে-সব হাদিস পাওয়া যায় যেমন– 'প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর জ্ঞানার্জন ফর্‌জ্', সেগুলোর উল্লেখ না করে একটি অপ্রচলিত হাদিসের ব্যবহার দ্বারা তাদের হাদিস জ্ঞানের গভীরতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। আর হাদিসের এমন গভীর জ্ঞানের জন্য অবশ্যই বড় মাদ্রাসা প্রয়োজন, যেখানে হাদিস শাস্ত্রের ব্যাপক চর্চা হয়। এ থেকে নিশ্চিত যে, জাফর খানের এই মাদ্রাসার পূর্বেই বাংলায় সুপ্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা ছিল যেখানে শিক্ষার্থীরা হাদিস চর্চা করত।

এরূপ প্রমাণ মিনহাজের[১৪] বর্ণনায়ও পাওয়া যায়:

چون محمد بختنار آن ممالك راضبط كرد شهر نودية راخراب كرد وبرموضعى كه لكهنوتى است دار الملك ساخت واطواف آن ممالك را درتصرف آورد وخطبه وسكه در (هر) خطه قايم كرد – ومساجد ومدارس وخانقاهات دران اطواف بسعى جميل اووامر اوبناشد-

(যখন মোহম্মদ বখতিয়ার ঐ রাজ্য অধিকার করেন (তখন তিনি) 'নওদীয়াহ' নগর ধ্বংস করেন এবং লাখনৌতি নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। সেই রাজ্যের (চতুষ্পার্শ্বস্থ) অঞ্চল তিনি অধিকার করেন এবং প্রত্যেক অঞ্চলে (তাঁর নামে?) খুতবা ও মুদ্রা প্রচলন করেন। এবং ঐ অঞ্চলসমূহে (অসংখ্য) মসজিদ, মাদ্রাসা ও উপাসনালয় তাঁর ও তাঁর আমিরদের প্রচেষ্টায় ও নির্দেশে দ্রুত ও সুন্দরভাবে নির্মিত হয়।) [১৫]

হাদিসের বর্ণনায় এবং লিপির অন্য অংশের বর্ণনায় এখানে কোন মসজিদের উল্লেখ না পাওয়া গেলেও লিপিটি যে সমাধি সম্বলিত কমপ্লেক্সে পাওয়া যায় তাতে আব্দুল কাদির বর্তমানে জাফর খানের সমাধি নামে পরিচিত অংশটিকেই মাদ্রাসা বিল্ডিং হিসেবে প্রমাণ করেছেন।[১৬]

জ্ঞানার্জন সম্পর্কিত দ্বিতীয় হাদিসটি একটি জইফ (দুর্বল) হাদিস। গৌড় মাদ্রাসার শিলালিপিতে এরূপ একটি জইফ হাদিসের ব্যবহার ইতিহাসে ভিন্ন মাত্রা আনে। সুলতান আলাউদ্দিন হুসাইন শাহ তাঁর ধর্মীয় নীতিতে অত্যন্ত উদার ছিলেন। তাঁর সময় শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশে তিনি ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেছিলেন। তাঁর সেই উদার চিন্তা থেকেই হয়ত বাধাহীন সীমাহীন জ্ঞানার্জনে উৎসাহ প্রদান করার জন্য এ জইফ হাদিসটি ব্যবহৃত হয়েছে।

দারাসবাড়ি মাদ্রাসা শিলালিপিতে ব্যবহৃত হাদিসটি শিলালিপিতে মাদ্রাসা নির্মাণের যে রেকর্ড রয়েছে তার সাথে সমার্থক। তবে সরাসরি মাদ্রাসা নির্মাণের ফজিলত বর্ণনা বিষয়ক

হাদিসের পরিবর্তে আলেমদের আশ্রয় প্রদানের ফজিলত বর্ণনা অর্থাৎ মাহাত্ম্য ও পুণ্যার্জন বিষয়ক হাদিসটি ব্যবহার দ্বারা তৎকালীন সমাজের একটি নতুন দিক উন্মোচিত হয়। সে সময় মাদ্রাসার আলেমদের ও ছাত্রদের শিক্ষা দান ও গ্রহণের বিষয়টি ছিল অবৈতনিক। আর সে ক্ষেত্রে সমাজই এদের খাওয়া, থাকার ব্যবস্থা করত। সমাজের এটা দায়িত্ব ছিল। এ কাজে উৎসাহ প্রদান করার জন্য সুলতান আলাউদ্দিন হুসাইন শাহ সংশ্লিষ্ট শিলালিপিতে হাদিসটি উৎকীর্ণ করেছেন বলে ধারণা হয়। তাছাড়া যে মাদ্রাসাটিতে এই লিপি পাওয়া যায় তা যে অবৈতনিক ছিল তা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

আয়াতুল কুরসির গুরুত্ব বর্ণনা

আয়াতুল কুরসির গুরুত্ব সম্পর্কিত একটি হাদিসের উল্লেখ পাওয়া যায়– সুলতান রুকনুদ্দিন কায়কাউসের মহাস্থানগড় (বগুড়া) শিলালিপিতে (১৩০১ খৃ.)। হাদিসটি হল– "যে নিয়মিত আয়াতুল কুরসি পাঠ করবে, মৃত্যুর পরে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" আয়াতুল কুরসি পাঠের গুরুত্ব বর্ণনা বিষয়ক হাদিসটি অন্য হাদিসগুলো থেকে ব্যতিক্রমী। একান্তই ধর্মীয় গুরুত্ব নিয়ে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। এটা একান্তই ব্যক্তিগত ধর্মানুশীলনের অংশ। লিপিটি একজন সুফির সমাধি নির্মাণ সম্পর্কে তথ্য দিলেও এখানে কোন সুফির নাম উল্লেখ করা হয়নি এবং সমকালীন সুলতানের নামও উল্লেখ করা হয়নি। এর সাথে আয়াতুল কুরসি পাঠের গুরুত্ব সম্পর্কিত হাদিসের উল্লেখ দ্বারা ধারণা হয় যে, স্থাপত্যটি শুধুই ধর্মীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নির্মিত হয়েছিল এবং তাতে ধর্মচর্চায় মুসলমানদেরকে অধিক উৎসাহী করার জন্য আয়াতুল কুরসি পাঠের গুরুত্ব সম্পর্কিত এই হাদিসটি উৎকীর্ণ করা হয়েছে।

বাংলার প্রাক-মুঘল শিলালিপিতে হাদিসের উল্লেখ তৎকালীন সমাজের একটি সাধারণ দিক উন্মোচন করে। তৎকালীন সমাজে হাদিসের যেমন গ্রহণযোগ্যতা ছিল তেমনি সাধারণ মানুষও হাদিস-সচেতন ছিল। বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে হাদিসের ব্যাপক প্রভাব ছিল, যার মর্মার্থ অনুধাবন করে সমগ্র বাংলায় প্রচুর ধর্মীয় স্থাপত্য বিশেষ করে মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। আর নির্মাতাগণ তাঁদের ইমারতসমূহ সাধারণ্যে গ্রহণযোগ্য করার জন্য মুসলিম সংস্কৃতির অন্যতম উৎস হাদিসকে ব্যবহার করেছিলেন।

তথ্যনির্দেশ

১. সুরা বনি ইসরাঈল, ১ নম্বর আয়াত।

২. Said Nuseibeh & Oleg Grabar, *The Dome of the Rock*, Thames & Hudson, London, 1996, pp.43-51

৩. Abdul Karim, *Corpus of the Arabic and Persian Inscriptions of Bengal*, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1992, p.87

৪. তাঁর প্রকৃত নাম হযরত মুহাম্মদ কবির সাহিব, যিনি আলেপ্পোর শাহ আনওয়ার কুলি নামে পরিচিত। দ্র. Shamsuddin Ahmed, *Inscriptions of Bengal,* Vol. IV, Varendra Research Museum, Rajshahi, 1960, p.38

৫. সুরা আন-নাজম, ৩-৪ নম্বর আয়াত

৬. Abdul Karim, *প্রাগুক্ত*, p.105

৭. *JASP*, Vol. VIII, No. 1, 1963, p. 61

৮. Abdul Karim, *প্রাগুক্ত*, pp. 205-06

৯. Shamsuddin Ahmed, *প্রাগুক্ত*, p.123

১০. এ কে এম ইয়াকুব আলী, 'সুলতানি শিলালিপির বিষয় ভিত্তিক শ্রেণী বিভাজন', *ইতিহাস*, তেতাল্লিশ বর্ষ, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা, মে ২০১০, পৃ. ৩৪

১১. Shamsuddin Ahmed, *প্রাগুক্ত*, p. 48

১২. Abdul Karim, *প্রাগুক্ত*, p. 352

১৩. *প্রাগুক্ত*, p. 56

১৪. মিনহাজ-ই-সিরাজ, *তবকাত-ই-নাসিরি*, আ ক ম যাকারিয়া অনূদিত, ফার্সি পাঠ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ৯

১৫. মিনহাজ, *প্রাগুক্ত*, বাংলাপাঠ, পৃ. ২৯

১৬. উদ্ধৃত, Abdul Karim, *প্রাগুক্ত*, pp.261-62; দ্রষ্টব্য *JASBD*, Vol. XXIV-XXVI, 1979-81, pp. 20-25; আ ক ম যাকারিয়া, *বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ২৮৫-২৮৮

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, ত্রিংশ খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৯/জুন ২০১২

উনিশ শতকে বাংলায় পাটচাষ বিরোধী আন্দোলন

এস.এম. রেজাউল করিম রেজা*

সারসংক্ষেপ

বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাসে পাট চাষের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাচীন আমল হতে বাংলায় পাটচাষ হলেও উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসে বাংলার কৃষক শ্রেণীর আর্থ-সামাজিক জীবনে পাটচাষ একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে। কিন্তু এই একই সময়ে অর্থাৎ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে লক্ষ করা যায় বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি অংশ এবং তাঁদের মুখপত্র *ঢাকা প্রকাশ*[১] নামে একটি পত্রিকা পাট চাষের বিরোধিতা শুরু করে। আলোচ্য প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য হলো পাটচাষ বিরোধীদের বক্তব্য বস্তুনিষ্ঠ ছিল কি-না তা পর্যালোচনা করা।

বাংলায় পাট চাষের ইতিহাস সুপ্রাচীন। তবে সর্বপ্রথম পৃথিবীর কোথায় কিভাবে পাটের উৎপত্তি ও পাট চাষের প্রচলন শুরু হয় এবং বাংলা তথা ভারতবর্ষে প্রথম কিভাবে পাটের আগমন ঘটে তা সঠিকভাবে জানা যায় না। যতদূর জানা যায়, খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শুরুতে মিশরে পাটের চাষ আরম্ভ হয় এবং সেখানে পাট 'মেলোকিচ্' নামে পরিচিত ছিল।[২] কিন্তু মতিলাল মজুমদারের মতে সাদাপাট ভারত ও ইন্দো-বার্মায় এবং তোষাপাট আফ্রিকায় উৎপত্তি হয়েছে।[৩] তবে ললিতপাট বা তোষাপাট মিশর ও সিরিয়ার অধিবাসীদের নিকট পরিজ্ঞাত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সেখানে শাকের পরিবর্তে পাট ব্যবহৃত হত। গ্রীকরা পাটকে করকোরাস বলে অভিহিত করত। তবে গ্রীকদের নিকট পাট করকোরাস নামে পরিচিত হলেও এখনকার পাটকেই তারা করকোরাস বলত কি-না তা বলা কঠিন। কারণ গ্রীক করকোরাস শব্দের অর্থ চক্ষুরোগবিনাশক, কিন্তু এখনকার করকোরাসে এ গুণ নেই। যাহোক, এ জাতীয় পাট বহুদিন পর্যন্ত আলেপ্পোর নিকট চাষ হত এবং শাক-সবজির ন্যায় ব্যবহৃত হত।[৪] অপর মতটি হল, চীনের ক্যান্টন নগরের নিকট বহুশতাব্দী পর্যন্ত ঘি নালিতাপাট বা সাদাপাটের চাষ হত এবং সেখানে পাট 'ওইমোয়া' নামে পরিচিত ছিল। এ মতানুসারে চীনদেশ থেকেই ঘি নালিতা পাট বা সাদাপাট সর্বপ্রথম বাংলা তথা ভারতবর্ষে আসে।[৫] আর পাট কখন থেকে বয়নযোগ্য আঁশ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে তা সঠিকভাবে বলা না গেলেও এটা জানা যায় যে, বাইবেল-লিখিত সময় থেকেই সবজি হিসেবে পাটের চাষ হয়ে আসছে এবং তখন পাট জিউস মেলো (Jew's Mallow) বা দরিদ্রের খাদ্য বলে

* সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অভিহিত হত।[৬] সুতরাং উপরোক্ত মতামত থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, সর্বপ্রথম পৃথিবীর কোন স্থানে পাটের উৎপত্তি ও পাট চাষের প্রচলন হয়েছিল তা সঠিকভাবে জানা সম্ভব না হলেও পাট চাষের ইতিহাস যে অতি প্রাচীন তা নিয়ে কোন বিতর্ক নেই। উপরন্তু পাটের উৎপত্তি ও পাটচাষের প্রচলন পৃথিবীর যে অঞ্চলেই শুরু হোক না কেন, প্রাচীনকাল থেকেই যে বাংলায় পাট চাষ হত তাতে কোন সন্দেহ নেই। ১৯৬১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে *Marketing of Jute in East Pakistan* গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যে একটি গবেষণা পরিষদ গঠন করা হয়। এ পরিষদ উক্ত গ্রন্থে বাংলায় পাটচাষের সময়কাল সম্পর্কে মন্তব্য করে যে, অতি প্রাচীনকাল থেকেই বাংলায় পাটচাষ করা হয়।[৭] ১৮৭৩ সালে Bengal Jute Enquiry Committee গঠন করে পাটচাষ, উৎপাদন ইত্যাদি বিষয়ে সরকার তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করে। সরকারের এ উদ্যোগ সফল করার লক্ষ্যে জেলা কমিশনারদেরকে পাট বিষয়ে তথ্য প্রদানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। সরকারের এ নির্দেশে সাড়া দিয়ে সিরাজগঞ্জ জেলার কমিশনার ই. ম্যাকডোনেল (E. McDonell) বাংলায় পাটচাষ সম্পর্কে এক দীর্ঘ রিপোর্ট দেন এবং এ রিপার্টের শুরুতে বাংলায় পাট চাষের সময়কাল সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, "It would be difficult to say when *Koshtah* was first grown in this country, but we have every reason to believe that it has been used to a great extent for many centuries."[৮] ১৮৭৩ সালে হুগলী জেলার কালেক্টর বাংলায় পাট চাষের সময়কাল সম্পর্কে বলেন, স্মরণাতীতকাল থেকেই বাংলায় পাট উৎপন্ন হয়। অবশ্য এ উৎপন্নের পরিমাণ ছিল সীমিত এবং তা প্রধানত গৃহকর্মের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হত।[৯] প্রাচীনকালে রচিত মহাভারত ও মনুসংহিতায় পট্টবস্ত্রের ব্যবহারের কথা উল্লেখ আছে যা এতদঞ্চলে পাট দ্রব্যের সুপ্রাচীন ব্যবহারের সাক্ষ্যবহ।[১০] অর্থাৎ প্রাচীনকাল থেকেই বাংলা তথা ভারতে পাটের চাষ হত। মধ্যযুগেও বাংলার পাট চাষ সম্পর্কে সুস্পষ্ট এবং বিস্তারিত প্রমাণ পাওয়া যায়। চতুর্দশ শতকে তীরভুক্তিবাসী জ্যোতিরীশ্বর তাঁর *বর্ণরত্নাকর* গ্রন্থে 'মেঘ উদুম্বর', 'গঙ্গা-সাগর', 'লক্ষ্মীবিলাস', 'সিলহট' (শ্রীহট্টজাত), 'গাঙ্গেরী' প্রভৃতি পট্ট ও নেতবস্ত্রের উল্লেখ করেছেন।[১১] মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পট্টবস্ত্রের উল্লেখ সুপ্রচুর। এমনকি উনিশ শতকের মাঝামাঝি অবধি পাটের আবাদ ছিল অতিশয় সামান্য।[১২] অর্থাৎ পাট-বাণিজ্যের ইতিহাস এদেশে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার সাথে সংশ্লিষ্ট। তবে এর অর্থ এই নয় যে, ইংরেজরাই সর্বপ্রথম এদেশে পাটের উৎপাদন ও বাণিজ্যের সূচনা করে।

সুতরাং, ইউরোপীয়দের আগমনের পূর্ব থেকেই বাংলায় পাটচাষ এবং পাটজাতদ্রব্য উৎপদিত হলেও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে আগমনকারী ইউরোপীয়রা এদেশে এসেই এদিকে নজর দেয়নি বা গুরুত্ব দেয়নি। অষ্টাদশ শতকে এসে পাট ও পাটজাত দ্রব্য ইউরোপীয়দের

আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়। অষ্টাদশ শতকে ইউরোপীয়রা সস্তায় থলে প্রস্তুতের জন্য শনের পরিবর্তে ব্যবহার করা যায় এরূপ বিকল্প কোন আঁশের সন্ধান করতে থাকে।[১৩] ১৭৯১ সালে কলকাতার শিবপুর বোটানিকেল গার্ডেনের পরিচালক ও বিখ্যাত উদ্ভিদতত্ত্ববিদ রক্সবার্গ (Roxburgh) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর জাহাজের দড়ির জন্য এবং সস্তায় থলে প্রস্তুতের জন্য ইউরোপীয় শনের পরিবর্তে বিকল্প আঁশ প্রাপ্তির লক্ষ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ডের ডান্ডিতে নমুনা হিসেবে একশ টন কাঁচা পাট প্রেরণ করেন।[১৪] অতঃপর দীর্ঘদিন ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ডে পাট রপ্তানি করা হয় এবং পাট থেকে যান্ত্রিকভাবে পাটজাত পণ্য সামগ্রী তৈরির নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে থাকে। এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে ১৮৩২ সালে মেসার্স বেলফোর (Belfour) এবং মেসার্স মেলভেল (Melvelle) কোম্পানী সর্ব প্রথম সফলতার সাথে যন্ত্রের সাহায্যে পাট থেকে সুতা তৈরী করতে সমর্থ হয়।[১৫] অবশ্য সফলতার সাথে পাট থেকে সুতা বের করা হলেও তা তুলনামূলকভাবে শক্ত ও অনমনীয় হওয়ায় যান্ত্রিকভাবে তা দিয়ে পণ্য উৎপাদনে অসুবিধার সৃষ্টি হয় এবং তখন প্রধানত মোটা এক প্রকার দ্রব্যসামগ্রী (Coarsest goods) তৈরীতে পাটের আঁশ ব্যবহৃত হয়।[১৬] ১৮৩৮ সালে তৈল ও পানি মিশিয়ে পাটের আঁশের সুতা নরম ও ব্যবহার উপযোগী করার মাধ্যমে এ অসুবিধা দূর করা সম্ভব হয় এবং বাজারে বিক্রয় উপযোগী পণ্য তৈরী শুরু হয়।[১৭] মতিলাল মজুমদারের মতে, "ডান্ডির শন কলগুলিকে সংস্কার করে পাটের আঁশ থেকে বস্ত্রাদি প্রস্তুতের উপযোগী করা হয়।"[১৮] এম. মোফাখখারুল ইসলামের মতে পাটের ওপর নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে শনের চেয়ে ভাল মনে হওয়ায় ডাচ সরকার শনের পরিবর্তে পাট দিয়ে কফির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাগ তৈরীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[১৯] অর্থাৎ দীর্ঘদিন পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের দিকে যন্ত্রের মাধ্যমে গুণগত মানের পণ্য উৎপাদনের উপাদান (কাঁচামাল) হিসেবে পাট প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সুতরাং অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে পাট থেকে পণ্য প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে যে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে থাকে তার ফলস্বরূপ উনিশ শতকে এসে পাট থেকে সফলভাবে পাটজাত পণ্য প্রস্তুত শুরু হয়। বিশেষ করে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে পাট গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে আবির্ভূত হয় এবং তখন থেকেই বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পাটচাষ শুরু হয়।[২০] সুতরাং বলা যায় বাংলায় পাট চাষের সুদীর্ঘ ইতিহাস থাকলেও ইংরেজ শাসন আমলেই বাণিজ্যিকভাবে পাটের উৎপাদন শুরু হয় এবং একটি প্রধান অর্থকরী ফসল হিসেবে পরিগণিত হয়। তবে ইংরেজ শাসন আমলে বিশেষ করে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাণিজ্যিকভাবে পাট চাষ শুরু হলেও এর চাষে প্রবৃদ্ধির হার ছিল অনেক বেশি এবং অল্প সময়ের মধ্যে পাট চাষের আওতাধীন জমির পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এর ফলে কাঁচা পাটের বাণিজ্যিকীকরণ তথা পাট রপ্তানির পরিমাণও উল্লেখযোগ্য হারে বর্ধিত হয়। একটি পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় ১৮৬০-এর

দশকে কাঁচা পাটের রপ্তানিমূল্য ৪.১ মিলিয়ন থেকে ২০.৫ মিলিয়নে বৃদ্ধি পায়[২১] এবং আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলার পাট একটি শক্তিশালী অবস্থান করে নেয়। এ কারণেই সুগত বসু মন্তব্য করেন যে, পাটের মাধ্যমে বাংলার কৃষি অর্থনীতি বিশ্ববাজারের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত হয়।[২২]

সংক্ষেপে বলতে গেলে বাণিজ্যিক কৃষিপণ্য হিসেবে পাটকে আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠা করতে ১৮৫৪-৫৬ সালের ক্রিমিয়ার যুদ্ধ এবং ১৮৬১-৬৫ সালের আমেরিকার গৃহযুদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ দুটি ঘটনার পর পাটজাত সামগ্রী এত জনপ্রিয়তা পায় যে, ডান্ডিতে অনেকগুলি পাটকল গড়ে ওঠে। পাশাপাশি আমেরিকা, জার্মানী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, অস্ট্রিয়া, ইতালী, স্পেন এবং ব্রাজিলেও অসংখ্য পাটকল স্থাপিত হয়।[২৩] এভাবে পাটজাত পণ্যের আন্তর্জাতিক জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি এবং বহু পাটকল প্রতিষ্ঠার কারণে বাংলা থেকে কাঁচাপাট রপ্তানির পরিমাণও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। একটি পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় ১৮৩৮/১৮৪৩ থেকে ১৮৬৮/১৮৭৩ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কাঁচাপাট রপ্তানি ৪১ গুণ বৃদ্ধি পায়।[২৪]

আন্তর্জাতিক চাহিদা বৃদ্ধির পাশাপাশি অভ্যন্তরীণভাবেও কাঁচা পাটের চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাংলা থেকে রপ্তানীকৃত কাঁচা পাট দিয়ে প্রধানত ডান্ডির পাটকলগুলিতে পণ্য সামগ্রী তৈরী করে ইংল্যান্ডসহ অন্যান্য দেশে সরবরাহ করা হত। ফলে কিছু দেশী ও বিদেশী ব্যবসায়ী মনে করেন যে, কাঁচা পাট ডান্ডিতে রপ্তানি করে পণ্য উৎপাদনের পাশাপাশি এদেশেই পাটকল প্রতিষ্ঠা করে পণ্য সামগ্রী উৎপাদন করে রপ্তানি করলে তুলনামূলকভাবে লাভ বেশি হবে। এ ধারণা থেকেই ১৮৫৫ সালে হুগলী নদীর তীরে কলকাতার সন্নিকটে রিষড়ায় বাংলার প্রথম পাটকল স্থাপিত হয়।[২৫] ১৮৫৫ সালে কলকাতায় প্রথম পাটকল স্থাপনের পর কারখানার সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। ১৮৭৩ সালে পাটকলের সংখ্যা ১২৫০ টি তাঁতসহ ৫টি থেকে ১৮৭৫ সালে ৩৫০০টি তাঁতসহ ১৩টিতে বৃদ্ধি পায়। আর ১৯৩৮-৩৯ সাল নাগাদ পাটকলের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৯,০০০ তাঁতসহ ১১০টি।[২৬] এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাংলায় পাটকল প্রতিষ্ঠার পর তৈরীকৃত পাটজাত পণ্য সামগ্রী বিদেশে রপ্তানির পাশাপাশি কিছু পরিমাণ পণ্য দেশের অভ্যন্তরেও ব্যবহার শুরু হয়। ১৮৭৩ সালে সিরাজগঞ্জ জেলার কমিশনার ই. ম্যাকডোনেল বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নরকে বাংলার পাট সম্পর্কে লিখিত বিবরণ (Memorandum on the Subiect of Jute) দেবার সময় পাটের অভ্যন্তরীণ ব্যবহার সম্পর্কে উল্লেখ করেন যে, বাস্তবতা হচ্ছে পাটের আন্তর্জাতিক রপ্তানি বা বাণিজ্যের থেকে বরং পাটের অভ্যন্তরীণ ব্যবহারই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।[২৭] ১৯০১ সালের আদমশুমারীর রিপোর্টে বাংলায় উৎপন্ন পাটের ব্যবহার সম্পর্কে উল্লেখ করা হয় যে, আন্তর্জাতিক রপ্তানির পাশাপাশি পাটের অভ্যন্তরীণ

ব্যবহারও ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঐ রিপোর্টে আরও বলা হয় বাংলায় মোট যে পরিমাণ পাট উৎপন্ন হয় তার অর্ধেক রপ্তানি হয় এবং বাকি অর্ধেক দেশের অভ্যন্তরেই ব্যবহৃত হয়।[২৮]

সুতরাং, একদিকে আন্তর্জাতিক বাজারে বিশেষ করে ডান্ডির পাটকলগুলিতে এবং অন্যদিকে অভ্যন্তরীণভাবে অর্থাৎ কলকাতার পাটকলগুলিতে কাঁচা পাটের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে বাংলায় উল্লেখযোগ্য হারে পাট চাষের সম্প্রসারণ ঘটে। অর্থাৎ বাংলায় পাট চাষের সম্প্রসারণ ঘটে প্রধানত দুটি কারণে, (১) বিদেশে কাঁচা পাটের চাহিদা বৃদ্ধি এবং (২) অভ্যন্তরীণভাবে কাঁচা পাটের চাহিদা বৃদ্ধি।[২৯] এ দুটি কারণে পাটচাষ আন্তর্জাতিকভাবে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পাটজাত পণ্য সমাগ্রী জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এর ফলস্বরূপ বাংলায় পাটচাষের ক্ষেত্রে সূচিত হয় আমূল পরিবর্তন। সুতরাং আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণভাবে পাটের চাহিদা বৃদ্ধির কারণে বাংলায় পাটচাষের উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ ঘটে।

উপরোক্ত কারণে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার কৃষকেরা উত্তরোত্তর পাটচাষ বৃদ্ধি করতে থাকে। এর মূল কারণ ছিল পাটচাষ অন্যান্য ফসলের তুলনায় লাভজনক ছিল। কিন্তু একই সময়ে লক্ষ করা যায় যে, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি অংশ পাট চাষের বিরোধিতা শুরু করে। পাটচাষ সম্প্রসারণের বিরোধিতা করার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি অংশ এবং তাঁদের মুখপত্র *ঢাকা প্রকাশ* নামে একটি পত্রিকা। পাটচাষ সম্প্রসারণে বিরোধীদের প্রধান যুক্তিগুলি ছিল,

(১) পাটচাষ বৃদ্ধির ফলে দেশে ধান উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে এবং এর ফলে দেশে দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়েছে।

(২) পাটচাষ বৃদ্ধির ফলে দেশে মশার উপদ্রব হেতু ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব শুরু হয়েছে এবং এর ফলে দেশে স্বাস্থ্যসমস্যা বৃদ্ধি ও অসংখ্য লোকের মৃত্যু হচ্ছে।

(৩) পাটচাষ বৃদ্ধির কারণে কৃষক শ্রেণী আর্থিকভাবে সচ্ছল হওয়ায় তাঁদের সন্তানেরা শিক্ষিত হয়ে পূর্বপুরুষের পেশা কৃষিকাজ ছেড়ে ভদ্রলোকে পরিণত হচ্ছে এবং এর ফলে কৃষিতে জনবল হ্রাস পাচ্ছে।

(৪) পাটচাষ বৃদ্ধির ফলে আবাদি জমির উর্বরতা হ্রাস পাচ্ছে।

(৫) পাটচাষ বৃদ্ধির ফলে কৃষক শ্রেণীর হাতে নগদ অর্থের সমাগম হচ্ছে এবং এর ফলে তাঁদের সন্তানেরা শিক্ষিত হয়ে উচ্চবিত্ত ও ভদ্রলোক শ্রেণীর সন্তানদের চাকুরী ও ব্যবসায়ে অংশগ্রহণপূর্বক তীব্র প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করছে।

উপরোক্ত অভিযোগসমূহ উত্থাপনের মাধ্যমে পাটচাষ বিরোধীরা আন্দোলনে অনুকূল সাড়া দিয়ে দেশের কৃষক, জমিদার, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং সরকারকে অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে সমগ্র দেশবাসীকে পাটচাষ বিরোধী আন্দোলনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানায়।

অতএব, পাট চাষ বিরোধীদের প্রধান অভিযোগ ছিল পাট চাষ বৃদ্ধির ফলে দেশে ধান উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে এবং এর ফলে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা হয়েছে। ১৮৭৪ সালের ৩০ আগস্ট *ঢাকা প্রকাশে* 'পাটের কৃষি' শিরোনামে একটি সম্পাদকীয় কলামে পাটচাষ বৃদ্ধির কারণে দেশে দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হচ্ছে উল্লেখ করে বলা হয়:

> "অনেকে অনুমান করিতেছেন, বাহুল্যরূপে পাটের কৃষি দুর্ভিক্ষেরও অন্যতম কারণ। ইতঃপূর্ব্বে যে সকল ভূমিতে নিরবচ্ছিন্ন ধান্য উৎপাদিত হইত, তাহার অনেক ভূমিতে এখন পাট উৎপাদিত হইতেছে। এতদঞ্চলে এমন কৃষক প্রায় নাই, যে ব্যক্তি ন্যূনকল্পেও তাহার আবাদী ভূমির চতুর্থাংশ স্থানে পাট বপন না করিতেছে। কেহ কেহ তদপেক্ষাও অধিকাংশ ভূমিতে পাটের কৃষি আরম্ভ করিয়াছে। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে শ্রবণ করিয়াছি, সাভার ষ্টেশনের অনুপাতী কোন এক পল্লীগ্রামের কয়েকজন কৃষক তাহাদিগের যাবতীয় ভূমিতেই এবার পাট বপন করিয়া বসিয়াছে! ধান্য বপন করিবার নিমিত্ত একখানি ক্ষেত্রও অবশিষ্ট রাখে নাই। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলে 'ধানবাইন করিয়া যে লাভ পাওয়া যায় পাটের বাইনে তদপেক্ষা অধিকতর লাভ হইয়া থাকে, এবার চিনা অধিক পাওয়াতে এবং গত বৎসরের ধান্যও কিছু সঞ্চিত থাকাতে পেটের চিন্তা এক প্রকার দূর হইয়াছে, ইহার পর নিতান্ত আবশ্যক হইলে পাট বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাইব, তাহার কিছু দিয়া বরং ধান কিনিয়া লইব, তথাপি আমাদিগের অনেক লাভ থাকিবে।' এক্ষণ বিবেচনা করা উচিৎ, যদি অধিকাংশ কৃষক এইরূপ মনে করিয়া ধান্যের কৃষির সংকোচ করণান্তর বিস্তৃতরূপে পাটের কৃষি করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে দেশের কিরূপ পরিবর্ত্তন হইবার সম্ভাবনা, শস্যের অল্পতা নিবন্ধন দুর্ভিক্ষ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে কি না? ...অনেকের বিশ্বাস এই, পাটে এদেশ সমুৎসন্ন হইবে।"[৩০]

ঢাকা প্রকাশ পত্রিকায় এধরনের বহু নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশের মাধ্যমে পাটচাষ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলা হয়। কিন্তু একটু পর্যালোচনা করলেই দেখা যায় এসব বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ সামগ্রিকভাবে মোট আবাদযোগ্য জমির মাত্র ১০ শতাংশ পাটচাষের আওতাধীন ছিল, যেখানে শীত ও বসন্তকালীন ধানচাষের আওতাধীন জমির পরিমাণ ছিল শতকরা ৮০ ভাগ।[৩১] আকবর আলী খানের মতে, পাটচাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল তুলনামূলকভাবে কম লাভজনক বাণিজ্যিক ফসল, যেমন নীল, আফিম, ইক্ষু, তামাক, তুলা প্রভৃতি ফসলের বিকল্প হিসেবে।[৩২] প্রাসঙ্গিকক্রমে উল্লেখ্য যে, জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের অভিযোগ ছিল দেশে খাদ্য সংকট সৃষ্টির অন্যতম একটি কারণ হল অর্থকরী ফসলের চাষ বৃদ্ধির কারণে খাদ্য-শস্যের ভূমির হ্রাস। কিন্তু এ অভিযোগের বিপরীতে পিটার হার্নেটির যুক্তি ছিল খাদ্য শস্যের ভূমি গ্রাস করে নয় বরং অর্থকরী ফসলের চাষ বৃদ্ধি পেয়েছিল পতিত জমি চাষের আওতায় এনে।[৩৩] যদিও পিটার হার্নেটি তাঁর যুক্তি প্রমাণের জন্য ভারতবর্ষের তুলা উৎপাদন অঞ্চলকে বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর যুক্তিকে বাংলার প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করলে সহজেই বোঝা যায় যে, বাংলায় অর্থকরী ফসল হিসেবে পাট চাষের বৃদ্ধি ঘটেছিল পতিত জমি চাষের আওতায় এনে– খাদ্যশস্যের ভূমিকে ব্যবহার করে নয়। এমনকি কোন জাতীয় ঐতিহাসিকও নিশ্চিত করে বলতে পারবেন না যে, পাট চাষের আওতাধীন ভূমি খাদ্য শস্যের ভূমিকে গ্রাস করেছিল।[৩৪] অর্থাৎ পাট চাষ বৃদ্ধির কারণে খাদ্যশস্য বিশেষ করে

ধানচাষের ভূমির হ্রাস ঘটেছিল খুবই সামান্য একটি অংশের। সুতরাং, এর পর কোনভাবেই সমর্থন করা যায় না যে, পাটচাষ বৃদ্ধির কারণেই ধানচাষ হ্রাস পেয়েছে এবং এর ফলে দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব হয়েছে। তাছাড়া উনিশ শতকের শেষার্ধে সংঘটিত দুর্ভিক্ষের সঙ্গে পাটচাষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায় না। ১৮৯৬-৯৭ সালে পাটচাষকালীন সময়ে বাংলায় যে বড় ধরনের দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তার প্রধান কারণ ছিল অনাবৃষ্টি এবং এর ফলে শস্যহানি।[৩৫] বি. এম. ভাটিয়ার মতে ১৮৯৬-৯৭ সালে অনাবৃষ্টির ফলে শরৎকালীন ধান উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার কারণেই বাংলায় এ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।[৩৬] সুতরাং উনিশ শতকে বাংলায় পাটচাষ বিরোধী আন্দোলনের প্রধান যুক্তি পাট চাষ বৃদ্ধির কারণে ধান উৎপাদন হ্রাস এবং দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি সমর্থনযোগ্য নয়।

উনিশ শতকেও পাটচাষ বিরোধীদের আরেকটি অভিযোগ ছিল পাটচাষ বৃদ্ধির ফলে দেশে মশার উপদ্রব হেতু ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব শুরু হয়েছে। এর ফলে দেশে স্বাস্থ্য সমস্যা হচ্ছে এবং অসংখ্য লোকের মৃত্যু হচ্ছে। ১৮৭৪ সালের ৩০ আগস্ট *ঢাকা প্রকাশে* 'পাটের কৃষি' শিরোনামে একটি সম্পাদকীয়তে বলা হয় পাটচাষের কারণে মানুষের নানা রকম পীড়া হচ্ছে এবং স্বাস্থ্যহানি হচ্ছে।[৩৭] ১৮৯১ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর পত্রিকাটিতে প্রচার করা হয় যে, 'এদেশে যখন এত পাট ছিল না, মেলেরিয়ার কথাও তখন বড় কেহ শুনে নাই।"[৩৮] অর্থাৎ পাটচাষের কারণেই ম্যালেরিয়া রোগের আগমন ঘটেছে। ১৮৮৮ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর পত্রিকাটিতে 'পাটের কথা' শিরোনামে এক প্রবন্ধে পাটচাষ বৃদ্ধির কারণেই ম্যালেরিয়া রোগ বিস্তার লাভ করছে উল্লেখ করে বলা হয়, "যে হইতে এদেশে পাটের আবাদ বাহুল্য রূপে হইতেছে, সেই হইতে ম্যালেরিয়ার প্রকোপটা বড় বাড়িয়া গিয়াছে। পাট পচানিতে জল বিস্বাদ ও দুর্গন্ধময় হয়; পাটের জল যেখানে, সেখানে মৎস্য যায় না। ইহাতে বোধ হয় পাটের জলে মাছের অপকার হয়; এবং এই জন্যই বোধ হয় এদেশ দিন দিন মৎস্যহীন হইতেছে। অন্য নানা দোষ আছে। থাকিলে কি হয়, আমরা পাট বিক্রয় করিয়া যখন টাকা হাতে পাই, তখন আমাদের কিছুই মনে থাকে না।"[৩৯]

কিন্তু মশার উপদ্রব ও মাছ ধ্বংসসহ অন্যান্য ক্ষতির কথা মাঝেমধ্যে উল্লেখ করা হলেও উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রায় পুরোটা সময় ধরেই পত্রিকাটি প্রচার করতে থাকে যে, পাট চাষ বৃদ্ধির কারণেই দেশে ম্যালেরিয়াসহ নানা প্রকার রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটছে। এমন কি পত্রিকাটি মাঝে মধ্যে এমন কথাও প্রচার করে যে, পাটচাষ বৃদ্ধিই মানুষের রোগবৃদ্ধির মূল কারণ। ১৮৮৯ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর 'পূর্ব্ববঙ্গে পাটের কৃষি' শিরোনামে একটি প্রবন্ধে বলা হয়, "বস্তুত পাটের কৃষি দ্বারা দেশের নানা প্রকার অনিষ্ট হইতেছে। কৃষকগণ যখন পাট পচাইয়া থাকে তখন এক প্রকার দুর্গন্ধ উৎপন্ন হয়, সেই দুর্গন্ধে বায়ু দূষিত হয় এবং নানা প্রকার পীড়া জন্মাইবার কারণ হইয়া থাকে।"[৪০] সুতরাং পাটচাষ বিরোধীদের অভিযোগ ছিল

একমাত্র পাটচাষ ও পাটচাষ বৃদ্ধির কারণেই ম্যালেরিয়াসহ বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব হচ্ছে এবং এর ফলে মানুষের স্বাস্থ্যহানি ঘটছে। কিন্তু অভিযোগটি গ্রহণযোগ্য ছিল না। তবে পাটচাষ বৃদ্ধির ফলে মশার বংশ বিস্তার কিছুটা হলেও হয়ত বেড়েছিল একথা ঠিক। অর্থাৎ পাটচাষের সঙ্গে মশার উদ্ভব এবং ম্যালেরিয়া রোগের কিছুটা সংশ্লিষ্টতা থাকলেও আবশ্যিকভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়। সুতরাং পাটচাষ ও পাটচাষ বৃদ্ধির ফলেই যে দেশে মশার উপদ্রব এবং ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হয়েছে একথা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা যেসব দেশে আদৌ কোন পাটচাষ হয় না দেখা গেছে সেসব দেশেও মশা ও ম্যালেরিয়া রোগ পরিলক্ষিত হয়। বস্তুত ম্যালেরিয়াকে অনেকে উষ্ণমণ্ডলীয় বা উপ-উষ্ণমণ্ডলীয় রোগ বললেও কিন্তু আসলে তা সত্য নয়। অতীতে সুইডেন, ফিনল্যান্ড ও উত্তর রাশিয়াতে ম্যালেরিয়ার মহামারী দেখা যায়।[৪১] এমনকি ম্যালেরিয়া রোগের ইতিহাস থেকেও দেখা যায় যে, সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে আমেরিকার ম্যাসাচুসেট্‌স্ উপকূল এবং জর্জিয়া-ক্যারোলিনা উপকূল এলাকায় ম্যালেরিয়ার উপস্থিতি ছিল। শুধু তাই নয়, ১৯৩০-এর দশকেও আমেরিকা মহাদেশে বছরে ৬০-৭০ লক্ষ মানুষ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিল। দক্ষিণ চীন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং এশিয়া মাইনরে ম্যালেরিয়া ছিল একটি অপ্রধান আঞ্চলিক রোগ। যতদূর জানা যায় ম্যালেরিয়া রোগের সর্বাধিক প্রাদুর্ভাব স্বল্প আর্দ্র অঞ্চলে ও সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় এবং সর্বনিম্ন মরু ও পার্বত্য অঞ্চলে।[৪২] অর্থাৎ পাটচাষ হয় না এমন সব এলাকায় ম্যালেরিয়া রোগ অতীতের ন্যায় উনিশ শতকেও একইভাবে বিদ্যমান ছিল। শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত *বঙ্গবাণী* পত্রিকায় 'ম্যালেরিয়া কি দূর হইবে' শিরোনামের একটি প্রবন্ধে বলা হয়, "গ্রীষ্ম প্রধান দেশে ম্যালেরিয়ার মত মানুষের আর শত্রু নাই। এই ম্যালেরিয়াই পৃথিবীর কতকগুলি শ্রেষ্ঠ দেশকে সম্পূর্ণ ধ্বংসাবশেষে পরিণত করিয়াছে এবং আমরা যদি ইতিমধ্যেই অবহিত না হই তাহা হইলে অচির ভবিষ্যতে বাঙ্গলাদেশের ইতিহাস পুরাতত্ত্বের বিষয় হইয়া উঠিবে। এই ভীষণ রোগ শুধু রোগীকে একটু কষ্ট দিয়াই ছাড়েনা, সাবধান না হইলে ইহাতে মৃত্যু অনিবার্য্য। একা ভারতবর্ষেই প্রতিবৎসর দশ লক্ষের অধিক লোক ম্যালেরিয়ায় নষ্ট হয়। আফ্রিকা ও মধ্য আমেরিকার অবস্থানও সাংঘাতিক।"[৪৩] সুতরাং বলা যায় যে, পাট চাষের সঙ্গে অবশ্যই মশার উদ্ভব এবং ম্যালেরিয়ার আবশ্যিক কোন সম্পর্ক নেই। আর বাংলায় মশার উদ্ভব, বিস্তার এবং ম্যালেরিয়ার সঙ্গে পাটচাষ বৃদ্ধির পরোক্ষ কিছুটা ভূমিকা থাকলেও প্রত্যক্ষ কোন ভূমিকা নেই। কারণ যদি তাই থাকত তাহলে যেসব জেলায় সবচেয়ে বেশি পাট চাষ হয় সে সব জেলায়ই ম্যালেরিয়া বেশি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বাস্তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা পরিলক্ষিত হয় না। নিম্নের সারণিতে সমসাময়িক সময়ের একটি পরিসংখ্যান তথ্যের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করা হল যে, পাটচাষ ও পাটচাষ বৃদ্ধির সঙ্গে ম্যালেরিয়ার কোন সম্পর্ক নেই। প্রাপ্ত তথ্য প্রমাণ করে না যে, বেশি পাট উৎপাদনকারী এলাকায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বেশি ছিল। অর্থাৎ

পরিসংখ্যানগত তথ্য থেকেও প্রমাণ করা যায় না যে, পাটচাষ এবং পাটচাষ বৃদ্ধির সঙ্গে ম্যালেরিয়ার কোন আবশ্যিক সম্পর্ক রয়েছে।

সারণি-১: ১৯০৫ সালে জ্বরে বিশেষ করে ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর হার

এলাকা	সময়	জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর হার (প্রতি মাইলে)
১. শাহবাদ	১৯০৫	৩৭.৭৬
২. গয়া	১৯০৫	৩৬.২৪
৩. মালদা	১৯০৫	৩৪.৬৪
৪. মুঙ্গের	১৯০৫	২৮.৫৯
৫. পাটনা	১৯০৫	১৮.২৪
৬. বাংলায় (প্রধান পাট চাষ এলাকা)	১৯০৫	২৪.৩৪

সূত্র: G E. Lambourn, Bengal District Gazetteers : *Malda*, (Calcutta : The Bengal Secretariat Book Depot, 1918), p. 36 ; L.S.S. O'Malley, Bengal District Gazetteers : *Patna*, (Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot, 1907), p. 80.

ক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন সমসাময়িক সময়ের জেলা গেজেটীয়ার থেকে জানা যায় যে, পাটচাষ নয় বরং ম্যালেরিয়া রোগ বৃদ্ধির বাহক এনোফিলিস মশার (Anopheles mosquito) বংশ বৃদ্ধির সঙ্গে বাংলার বিভিন্ন জেলার পরিবেশগত সম্পর্ক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। সমসাময়িক সময়ে বিভিন্ন জেলার সিভিল সার্জন, জেলার সেনেটারী কমিশনার, বিভিন্ন জেলায় গঠিত ড্রেনেজ কমিটি এবং জেলা গেজেটীয়ার সমূহের প্রতিবেদনে প্রধানত ১০ টি কারণকে এনোফিলিস মশার বংশ বিস্তার তথা ম্যালেরিয়া রোগ বৃদ্ধির জন্য দায়ী বলে উল্লেখ করা হয়। যথা:

১. সাধারণ জলাশয় থেকে দূষিত/অপরিষ্কার খাবার পানি সংগ্রহ;
২. নোংরা পুকুর, ডোবা ও দিঘি;
৩. খাল, বিল, হাওড় ও বাওড়;
৪. জনসাধারণের প্রাচীন অভ্যাস;
৫. পানি নিষ্কাশনের অভাবে বর্ষা মৌসুমে বন্যা ও বৃষ্টির পানি জমে থাকা;
৬. অস্বাস্থ্যকর ও সেঁতসেঁতে পরিবেশ;
৭. বাড়ির আশেপাশের গাছপালা;
৮. ঘন বাঁশঝাড়;
৯. ঘনজঙ্গল এবং
১০. বাড়ির আশেপাশে ধান চাষ।[৪৪]

উপরোক্ত ম্যালেরিয়া রোগের বাহক মশার বংশ বৃদ্ধির বিভিন্ন কারণ স্পষ্টই প্রমাণ করে যে, পরিবেশগত বিভিন্ন কারণে মশার বংশ বৃদ্ধি হলেও পাটচাষ বৃদ্ধির সঙ্গে তার কোন আবশ্যিক সম্পর্ক নেই। বরং এমন প্রমাণও পাওয়া যায় যে, পাটচাষের মাধ্যমে জনসাধারণের আর্থিক সচ্ছলতাহেতু সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় মশার বংশ বিস্তার রোধে ভূমিকা পালনের মাধ্যমে তারা স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করে। এল. এস. এস. ও'মালে চব্বিশ পরগণা জেলাকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করে তারমধ্যে উত্তর ও পূর্ব ভাগের মধ্যে তুলনা করে দেখান যে, উত্তরাংশে পাটচাষ হয় না কিন্তু সেখানে মশার বংশ বৃদ্ধি তথা ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব লক্ষণীয়, কিন্তু পূর্বাংশে পাটচাষ হলেও সেখানে জনসাধারণ ম্যালেরিয়া মুক্ত। তিনি জেলার উত্তরাংশ সম্পর্কে বলেন, "The north and central thanas of Habra, Deganga, Barasat, Dum-Dum and Tollygunge. The drinking water is here very bad, being derived mainly from tanks polluted by surface drainage; the drainage channels are blocked and there are numerous swamps, and the homesteads are surrounded by dense jungle, Malaria is very prevalent."[৪৫]

অন্যদিকে জেলার পূর্বাংশ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য ছিল: "The eastern thanas of Baduria and Basirhat. The inhabitants are, for the most part, sturdy Mohammadans; the country is now healthy, and the main crop is jute, which yields a handsome profit to the cultivators."[৪৬]

অর্থাৎ নোংরা নর্দমা, ঘন বনজঙ্গলসহ অন্যান্য বিষয়সমূহ সংশ্লিষ্ট থাকলেও পাটচাষের সঙ্গে ম্যালেরিয়া রোগ বৃদ্ধির কোন সম্পর্ক নেই। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পাট চাষের সঙ্গে ম্যালেরিয়ার সরাসরি কোন সম্পর্ক পাওয়া না গেলেও ধানচাষের সঙ্গে ম্যালেরিয়া রোগ বৃদ্ধির সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। এল. এস. এস. ও'মালে ধানচাষের সঙ্গে ম্যালেরিয়ার সম্পর্ক উল্লেখপূবর্ক বলেন, "Anopheles mosquitoes, which transmit malaria, breed in the stagnant water of many of these tanks and also in the rice fields, while are likewise responsible for the propagation of malaria. In the western portion of the district malarial fevers are comparatively rare, owing to the undulating character of the land and the previous nature of the soil which lend themselve to efficient drainage."[৪৭]

তবে ধানচাষের সঙ্গে ম্যালেরিয়া রোগের বাহক এনোফিলিস মশার বংশ বৃদ্ধির সম্পর্ক থাকলেও তা একক বা প্রধান কোন কারণ নয়। প্রধানত পরিবেশগত কারণেই এনোফিলিস মশার বংশবৃদ্ধি ঘটে এবং এর মাধ্যমে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হয়। ১৯০৬ সালে হাওড়া জেলার সিভিল সার্জন লে. ক. এফ. জে. দুরুরি একটি প্রতিবেদনে বাড়ির আশেপাশের

ছোটখাট ডোবা এবং ঘন বনজঙ্গল এনোফিলিস মশার বংশ বৃদ্ধি ও ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবের প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন।[৪৮]

অর্থাৎ উপরোক্ত বক্তব্য থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, পাটচাষ নয় বরং পরিবেশগত কারণেই মশার বংশ বিস্তার ঘটে এবং ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হয়। সুতরাং পাটচাষ বিরোধীদের অভিযোগ একমাত্র পাটচাষ ও পাটচাষ বৃদ্ধির কারণেই ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে এবং এর ফলে মানুষের স্বাস্থ্যহানি হচ্ছে তা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। বরং *ঢাকা প্রকাশ* এবং তার সমর্থকদের প্রচার করা উচিত ছিল যে, ম্যালেরিয়ার হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে প্রথমেই পরিবেশগত উন্নয়ন ঘটাতে হবে। আর পরিবেশগত উন্নয়ন ঘটাতে প্রয়োজন সচেতনতা বৃদ্ধি এবং এ সচেতনতা বৃদ্ধির পূর্বশর্ত আর্থিক সচ্ছলতা যা আসতে পারে পাটচাষের মাধ্যমে। এ ধরনের কোন প্রচারণা করলে তা অবশ্যই যৌক্তিক হত কোন সন্দেহ নেই। কারণ পরিবেশগত উন্নয়ন ঘটাতে পারলেই মশার বংশ বিস্তার রোধ এবং ম্যালেরিয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। যেমনটা বলেছেন *বঙ্গবাণী* পত্রিকার সম্পাদক শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার। তিনি তাঁর পত্রিকায় 'ম্যালেরিয়া কি দূর হইবে' শিরোনামে এক প্রবন্ধে ম্যালেরিয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় সম্পর্কে বলেন, "ম্যালেরিয়া দূর করিবার একমাত্র উপায় মশক বংশের ধ্বংস সাধন করা। ইহারা সাধারণতঃ ডোবা, পুকুর, কূপ ইত্যাদি জলাভূমিতে ডিম পাড়ে এবং এই ডিম্বাবস্থায় ইহাদিগকে নষ্ট করা সর্ব্বাপেক্ষা সহজ।"[৪৯] অর্থাৎ শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার পরিবেশগত উন্নয়ন সাধনকে ম্যালেরিয়া রোগ থেকে রক্ষার উপায় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি পাটচাষ সম্পূর্ণ বন্ধ করার উপদেশ দেননি। একই রকম পরামর্শ দিয়েছেন বৃটিশ ভারতের সিভিল সার্ভিস কর্মকর্তা বি. ডস. অ্যালেন। তিনি বলেন, "The houses are buried in groves of fruittrees and bamboos, which afford indeed a pleasant shade but act as an effective barrier to the circulation of the air, and increased the humidity of the already over humid atmosphere. The Civil Surgeon has found that excellent results have attended the clearance of bamboo jungle in places where fever has been particularly bad."[৫০]

অর্থাৎ বাড়ির আশেপাশের গাছপালা, বাঁশঝাড় ও ঘন বনজঙ্গল পরিষ্কার করে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে বসবাস করলে তথা পরিবেশগত উন্নয়ন ঘটাতে পারলে অবশ্যই ম্যালেরিয়া রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। এর সঙ্গে পাটচাষের কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং, উনিশ শতকের গড়ে ওঠা পাটচাষ বিরোধী আন্দোলনকারীদের যে অভিযোগ পাটচাষ ও পাটচাষ বৃদ্ধির কারণেই দেশে মশার উপদ্রব ও ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব এবং এর ফলে মানুষের স্বাস্থ্যহানি ঘটছে, তা গ্রহণযোগ্য ছিল না।

পাটচাষ বিরোধীদের গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগের মধ্যে আরেকটি ছিল, পাটচাষ বৃদ্ধির কারণে দেশের কৃষক শ্রেণী আর্থিকভাবে সচ্ছল হওয়ায় তাদের সন্তানেরা শিক্ষিত হয়ে পূর্বপুরুষের পেশা কৃষিকাজ ছেড়ে ভদ্রলোকে পরিণত হচ্ছে। অভিযোগটির যৌক্তিকতা থেকেও গুরুত্বপূর্ণ ছিল এধরনের অভিযোগ উত্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ঈর্ষার বহিঃপ্রকাশ। ১৯০০ সালের ১৯ আগস্ট *ঢাকা প্রকাশের* এক সম্পাদকীয় কলামে বলা হয়:

> "সুলভ শিক্ষা কৃষি ও শিল্প কার্য্যের আর একটি বিঘ্ন। এ দেশের বিষয়ে অমনোযোগী গভর্নমেন্ট মনে করেন, শিক্ষা লাভে চোখ মুখ ফুটিলেই এদেশীয়গণ নিজ নিজ ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে পারিবে, কিন্তু এদেশের প্রকৃতি তাহার বিপরীত। যে কৃষকের পুত্র কলম ধরিয়াছে, সে আর কদাপি হাল ধরিতে চায় না, যে শিল্পীর পুত্র কাগজে লিখিতে শিখিয়াছে, সে কদাপি কাপড় বুনতে চায় না। এদেশে লেখা পড়া শিখিলেই বাবু সাজিতে হয়, ইহা চিরন্তন সামাজিক নিয়ম, এই নিয়মকে অগ্রাহ্য করিয়া নিম্নশ্রেণীর কাজ করিবার প্রবৃত্তি অধিকাংশ লোকেরই হইতে পারে না। বরং কৃষ্ণদাস পাল প্রধান রাজনৈতিক হইতে পারেন, কিন্তু ভাল-শাঁখা বানাইতে পারেন না; মহেন্দ্রলাল সরকার অতবড় ডাক্তার হইয়াও গো-জাতির শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারেন নাই; রাজকৃষ্ণ রায় বড় কবি হইয়াও দুগ্ধ হইতে বেশি পরিমাণে ঘৃত লাভের উপায় করিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ এ পর্য্যন্ত কৃষি ও শিল্পজীবী যত লোক লিখা পড়া শিখিয়াছে, তাহারা সকলেই নিজ নিজ ব্যবসায় পরিত্যাগ করতঃ বাবু সাজিয়াছে ভিন্ন নিজ ব্যবসায়ের কিছু মাত্র উন্নতি করিতে পারে নাই। এতদ্বারা একদিকে যেমন কৃষি শিল্পের হানি হইয়াছে, এবং সেই হানিতে দেশের ধন ক্ষয় হইতেছে, অপরদিকে তাহারা অনন্যোপায় ভদ্রবংশীয়দিগের ব্যবসায়ে ভাগ বসাইয়া তাহাদেরও অত্যন্ত কষ্ট বৃদ্ধি করিতেছে।"[৫১]

অর্থাৎ কৃষি ও শিল্পজীবীর সন্তানেরা শিক্ষা গ্রহণ করে ভদ্রলোকে পরিণত হচ্ছে। ১৯০১ সালের ১৭ মার্চ *ঢাকা প্রকাশে* ভদ্র হওয়ার পন্থাস্বরূপ শিক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে কটাক্ষ করে বলা হয়, "শ্রমজীবীর সন্তানদিগের অনায়াসে ভদ্র হইবার সখবশতঃ ছাত্র সংখ্যা বাড়িয়াছে।"[৫২] *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকার সঙ্গে একইভাবে সুর মিলিয়ে *বঙ্গবাণী* পত্রিকায় কৃষক শ্রেণীর সন্তানদের উদ্দেশে বলা হয়, "কৃষকের ছেলে শিক্ষিত হয়ে উঠলে, কৃষক বলে পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করে।"[৫৩] এসব অভিযোগের সারকথা ছিল দেশের কৃষক শ্রেণী শিক্ষিত হয়ে অথবা অন্য পেশার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কৃষি কাজ ছেড়ে দিচ্ছে এবং এতে করে কৃষিতে জনবল হ্রাস পাচ্ছে যা কৃষির জন্য খুবই ক্ষতিকর।

সুতরাং পাটচাষ বিরোধীদের অভিযোগ ছিল পাটচাষ বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থিক সচ্ছলতা হেতু কৃষক-শ্রেণী শিক্ষিত হয়ে পূর্বপুরুষের পেশা কৃষিকাজ ছেড়ে ভদ্রলোকে পরিণত হচ্ছে এবং এর ফলে কৃষিতে জনবল হ্রাস পাচ্ছে। কিন্তু এ অভিযোগটি গ্রহণযোগ্য ছিল না। কারণ উনিশ শতকের শেষ দিকে যখন আদমশুমারী শুরু হয় তারপর পরবর্তী প্রতিটি আদমশুমারীতে দেখা যায় লোকসংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি

পাচ্ছে এবং সেই সঙ্গে কৃষিজীবীর সংখ্যাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৮৭২ সাল থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত সময়ে মোট ৬ বার আদমশুমারী হয়। আদমশুমারীতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল নিম্নরূপ:

সারণি-২: আদমশুমারীতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ

আদমশুমারীর সাল	লোকসংখ্যা		প্রতি ১০ বছরে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল			
১৮৭২	৩৪, ৬৮৭,০০৩	জন	১৮৭২-১৮৮১	=	২,৩২৭,৬১৮	বৃদ্ধি
১৮৮১	৩৭,০১৪,৬২১	”	১৮৮১-১৮৯১	=	২,৭৯০,৯০৬	”
১৮৯১	৩৯,৮০৫,৫২৭	”	১৮৯১-১৯০১	=	৩,০৭৫,৮৩২	”
১৯০১	৪২,৮৮১,৩৫৯	”	১৯০১-১৯১১	=	৩,৪২৩,৮১১	”
১৯১১	৪৬,৩০৫,১৭০	”	১৯১১-১৯২১	=	১,২৮৭,২৯২	”
১৯২১	৪৭,৫৯২,৪৬২	”	১৮৭২-১৯২১	=	১২,৯০৫,৪৫৯	”

সূত্র: Census of India 1921, Bengal, Vol. V, Part II, Calcutta : Bengal Secretariat Book Depot, 1923, p. 4.

সারণি-২ থেকে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির এই পরিমাণ, দেখে সহজেই অনুমান করা যায় যে, অধিক পরিমাণে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে কৃষিভূমিতে কর্মসংস্থান সংকুলান সম্ভব ছিল না। ১৯০১ সালের আদমশুমারীতে দেখা যায় কৃষিতে মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭১.২৭ ভাগ জড়িত এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশগুলির সঙ্গে তা তুলনায় শীর্ষস্থানীয়।[৫৪] আর ১৯২১ সালের আদমশুমারী থেকে জানা যায় কৃষিতে জড়িত লোকের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭৭.৩ ভাগ।[৫৫] কৃষিতে জনসংখ্যার বৃদ্ধির এ হার দেখে সহজেই অনুমান করা যায় যে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত সময়ে জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধির কারণে কৃষিতে কর্মসংস্থান সংকুলান সম্ভব ছিল না। কারণ ব্যাপক হারে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও ভূমির পরিমাণ ছিল নির্দিষ্ট। অর্থাৎ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়নি। সঙ্গত কারণেই কৃষি ভূমির উপর লোকসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। আর ভূমিতে চাপ বৃদ্ধির কারণে কৃষক শ্রেণীর কর্মসংস্থানের সঙ্কট শুরু হয়। ১৮৭৪ সালের ২২ নভেম্বর *ঢাকা প্রকাশে* লোকসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে ভূমিতে কর্মসংস্থানের সঙ্কট উল্লেখপূর্বক বলা হয়, “যে গ্রামে যে পরিমাণ ভূমি ছিল, সকলই পত্তন হইয়া গিয়াছে, কিছুই পতিত পড়িয়া রয় নাই। অথচ দিন দিনই ভূমি পত্তনাকাঙ্ক্ষী লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। অধিকন্তু পূর্ব্বে যে ব্যক্তি যে পরিমাণ ভূমি কর্ষণ করিত, তাহার মৃত্যুর পর তদীয় বহুসংখ্যক সন্তানেরা ঐ ভূমি কিছু কিছু করিয়া বিভাগ করিয়া লইতেছে। যে ভূমি একজনে কর্ষণ করিত, সেই ভূমি ৫/৭ জন কি ১০ জনে বিভাগ করিয়া লইলে মাত্র তদুৎপাদ্য শস্যাদিতে তাহাদিগের স্বাচ্ছন্দ্যে জীবিকা নির্ব্বাহ হইবে কেন?”[৫৬] ১৮৭৪ সালের ঐ বক্তব্য থেকে অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে, লোকসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে কৃষক

শ্রেণীর জীবনযাপন যারপর নাই কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। উপরন্তু পরবর্তীকালে এ অবস্থা আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল যখন লোকসংখ্যার তুলনায় ভূমির পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছিল। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, ১৯২১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী কৃষিজীবী মানুষের মাথাপিছু জমির পরিমাণ ছিল মাত্র ২.২২ একর।[৫৭] বলার অপেক্ষা রাখে না এ সামান্য জমির উৎপাদন দিয়ে তাঁদের জীবন নির্বাহ সম্ভব ছিল না। একারণেই কৃষক শ্রেণীর একটি অংশ পেশা পরিবর্তনের চেষ্টা করেছিল। এক্ষেত্রে যারা আর্থিকভাবে কিছুটা সচ্ছল ছিল শুধুমাত্র তারাই শিক্ষা গ্রহণ করে চাকুরী ও ব্যবসায়ে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়েছিল। উনিশ শতকে এ ধরনের পেশা পরিবর্তনকারীদের সংখ্যা ছিল খুবই সামান্য। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পরবর্তীকালে বিশেষ করে বিশ শতকে এ সংখ্যার পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় এবং এদের মধ্য থেকে একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শেণীর উদ্ভব ঘটে। কৃষক শ্রেণী থেকে উঠে আসা এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী পরবর্তীকালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিশেষ করে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পাটচাষ বিরোধীদের আরেকটি অন্যতম অভিযোগ ছিল পাটচাষ বৃদ্ধির কারণে উর্বর আবাদি জমি অনুর্বর হয়ে যাচ্ছে। ১৮৯১ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর *ঢাকা প্রকাশে* 'পাটের আবাদ ও ঢাকাবাসীর সাবধানতা' শিরোনামে এক প্রবন্ধে বলা হয়, "পাটের আবাদ দিন দিন অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে। কৃষকেরা টাকার লোভে পাট বুনিয়া সারবান জমিগুলিকে উষর করিয়া তুলিতেছে।"[৫৮] একইভাবে ১৮৮৮ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর 'পাটের কথা' শিরোনামের অপর এক প্রবন্ধে বলা হয়, "যে ভূমিতে পাট আবাদ হয়, ঐ ভূমিগুলির উর্ব্বরা শক্তি নিতান্ত কমিয়া যায়। আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যে ভূমিতে যে বার পাট জন্মে, তাহার পরবর্ত্তী দুই তিন বৎসর ধান্যাদি শস্য একরূপ জন্মে না বলিলেই হয়।"[৫৯] এসব প্রচারণার মাধ্যমে বোঝাতে চেষ্টা করা হয় পাট চাষের কারণে জমির উর্বরতা শক্তি এমনভাবে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে যে, এর ফলস্বরূপ পরবর্তীকালে ফসল উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব অবশ্যম্ভাবী। এমনকি কৃষকদেরকে এও বলে সতর্ক করা হয়েছিল যে, এভাবে দীর্ঘদিন পাট চাষ করতে থাকলে একসময় ফসল উৎপাদন, বিশেষ করে ধান উৎপাদনের ক্ষেত্রে মারাত্মক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হবে এবং তখন দেশের লোক তীব্র খাদ্য সঙ্কটের সম্মুখীন হবে। ১৮৮৯ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর *ঢাকা প্রকাশের* সম্পাদকীয়তে বলা হয়, "পাটের কৃষির প্রধান দোষ এই, উহাতে ভূমির উর্ব্বরা শক্তি হ্রাস করিয়া ফেলে। যে সকল ভূমিতে পাট উৎপন্ন হইতেছে, সেই সকল ভূমিতে উপযুক্তরূপে ফাস দেওয়া হয় না, দেওয়ার দরকারও পড়ে না। কাজেই ফাসের অভাবে ভূমির উৎপাদন করিবার ক্ষমতা কমিয়া যাইতেছে। ভূমির উর্ব্বরা শক্তি হীনতায় দেশ উৎসন্ন যাইবার একটি প্রধান কারণ। পণ্ডিতেরা লোক গণনার

দ্বারা যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, প্রতি ২০ (কুড়ি) বৎসরে লোকসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বাড়ে। কিন্তু লোক সংখ্যা বৃদ্ধির সমানুপাতে ভূমির উর্ব্বরা শক্তি বাড়ে না। যদি তাহা না হয় এবং পূর্ব্বাপেক্ষা ফসল অধিক না জন্মে, তবে এই চিরবর্দ্ধনশীল লোক প্রবাহ কেমন করিয়া বহিবে? মানুষ কি খাইয়া বাঁচিবে?"[৬০] অর্থাৎ পাট চাষের কারণে জমির উর্বরতা হ্রাস পাচ্ছে এবং ফসল উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, উনিশ শতকের এ ধরণের প্রচারণা ভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিশ শতকেও পরিলক্ষিত হয়। ১৯২৪ সালে মাসিক *বঙ্গবাণী* পত্রিকায় শ্রীহৃষীকেশ সেন "কৃষকের দারিদ্র্য" শিরোনামে এক প্রবন্ধে বলেন, "যে জমিতে পাট হয় সে জমিতে পাট উঠিবার পর আর ধান চাষের সময় থাকে না। কাজেই সে জমিতে ফসল একটিই।"[৬১]

পাটচাষ বিরোধী উপরোক্ত প্রচারণা থেকে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে বাংলার ভূমির গঠন প্রকৃতি কি উক্ত অভিযোগকে সমর্থন করে? অর্থাৎ গঠন প্রকৃতি অনুসারে বাংলার মৃত্তিকা কি পাটচাষের অনুপযোগী ছিল যার ফলে পাটচাষে ভূমি অনুর্বর হয়ে যেত? দ্বিতীয়ত, পাটচাষের কারণে ভূমিতে বছরে মাত্র একটি ফসল উৎপন্ন হয়, এ অভিযোগই বা কতটুকু যৌক্তিক ছিল? প্রশ্নের প্রথমাংশের উত্তরে সংক্ষেপে বলা যায়, প্রাকৃতিক কারণে বিশেষত মৃত্তিকার গঠন প্রকৃতি, বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা বিশেষ উপযোগী ছিল বলেই শুধুমাত্র বাংলায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পাটের চাষ করা হয়। গাঙ্গেয় বদ্বীপের নদীমার্তৃক দেশ হিসেবে বাংলার ভূমির প্রধান বৈশিষ্ট্য, এখানকার অধিকাংশ ভূমি পলিমাটি দ্বারা গঠিত। সুগত বসুর মতে বাংলার মৃত্তিকার গঠন প্রকৃতি হল পলি গঠিত সমভূমি এবং অসংখ্য নদীবিধৌত হওয়ায় নদীর বয়ে আনা পলিমাটি ছিল খুবই উর্বর।[৬২] উল্লেখ্য, প্রতিবছর নিয়মিত বন্যা হওয়ার কারণে নদীর বয়ে আনা পলি দ্বারা বাংলার অধিকাংশ ভূমি উর্বর হয়ে উঠত। এ সম্পর্কে জর্জ পেটারসন বলেন, "More than half of the whole area of Bengal is composed of the rich alluvium brought down by the rivers"[৬৩] অর্থাৎ বাংলার ভূমির উর্বরতা নির্ভর করে প্রধানত নদীর বয়ে আনা পলিমাটির ওপর। এক্ষেত্রে নদীর চলমান প্রবাহ বন্ধ হলেই শুধুমাত্র ভূমি অনুর্বর হওয়ার আশঙ্কা ছিল। সুতরাং, পাটচাষের সঙ্গে জমির অনুর্বর হওয়ার কোন সম্পর্ক নেই।

প্রশ্নের দ্বিতীয়াংশের উত্তরেও একইভাবে বলা যায় অভিযোগটি গ্রহণযোগ্য ছিল না। কারণ গঠন প্রকৃতি অনুসারে বাংলার ভূমি ছিল খুবই উর্বর। বস্তুত ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণেই বাংলার অসংখ্য নদ-নদীর বয়ে আনা পলি দ্বারা গঠিত উর্বর ভূমি এবং প্রাকৃতিক কারণেই বাংলা ছিল পাট উৎপাদনের বিশেষ উপযোগী। শুধু তাই নয়, নদ-নদী, বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা এবং তাপমাত্রা অর্থাৎ প্রাকৃতিক কারণে বাংলার ভূমি এতই উর্বর ছিল যে, একই ভূমিতে বছরে একাধিক ফসল উৎপাদন করাও সম্ভব ছিল। এ সম্পর্কে জে.এন. গুপ্ত উল্লেখ

করেন যে, অসংখ্য নদী বিধৌত বাংলার পলি গঠিত ভূমি এতই উর্বর ছিল যে, এখানকার ভূমি বছরে দুই বা তিনটি ফসল উৎপন্ন হওয়ার উপযোগী ছিল।[৬৪] সুতরাং পাট চাষ করলে একই বছরে অন্য কোন ফসল উৎপাদন করা সম্ভব নয়, এমনকি পরবর্তী দুই-তিন বছরও অনুর্বরতার কারণে ফসল উৎপাদন সম্ভব নয় সম্পর্কিত অভিযোগ গ্রহণযোগ্য ছিল না।

উনিশ শতকের পাটচাষ বিরোধী আন্দোলনকারীদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ ছিল পাটচাষ বৃদ্ধির ফলে কৃষকেরা আর্থিকভাবে সচ্ছল হচ্ছে এবং এর ফলে তাঁদের সন্তানেরা শিক্ষিত হয়ে উচ্চবিত্ত শ্রেণীর সন্তানদের চাকুরী ও ব্যবসায়ে অংশগ্রহণপূর্বক তীব্র প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করছে। অর্থাৎ পাটচাষ বিরোধীদের অভিযোগে তিনটি বিষয় উঠে এসেছিল, যথা: কৃষকদের আর্থিক সচ্ছলতা, তাঁদের সন্তানদের শিক্ষিত হওয়া এবং চাকুরী ও ব্যবসায়ে অংশগ্রহণপূর্বক প্রতিযোগিতার সৃষ্টি। এসব অভিযোগ সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা যায় কৃষকদের আর্থিক সচ্ছলতা এসেছিল সন্দেহ নেই। আর সাধারণভাবে আমরা বলতে পারি শিক্ষার হারও বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ ছাড়াও শিক্ষিত শ্রেণীর চাকুরী ও ব্যবসায়ে অংশগ্রহণ প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু এসব অভিযোগ কিছুটা সত্য হলেও *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকার প্রচারণা ছিল তার থেকে অনেক বেশি অতিরঞ্জিত। উপরন্তু উনিশ শতকে গড়ে ওঠা পাটচাষ বিরোধী আন্দোলনের এ ধরণের প্রচারণা থেকে বর্তমান সময়ে যে কেউ অনুমান করতে সমর্থ হবেন যে, এ ধরনের অভিযোগ যতটা না ছিল বস্তুনিষ্ঠ তার চেয়ে বেশি ছিল তথাকথিত উচ্চবিত্ত ও ভদ্রলোকশ্রেণী নামে পরিচিত ধনিক শ্রেণীর গরিব কৃষকদের প্রতি ঈর্ষা এবং কৃষকশ্রেণীকে স্বাবলম্বী হয়ে ওপরে উঠে আসতে না দেওয়ার মানসিকতা। অধিকন্তু বাংলা বিশেষ করে প্রধান পাট উৎপাদন অঞ্চল পূর্ববাংলার অধিকাংশ কৃষক মুসলমান হওয়ায় এর মাধ্যমে একটা সাম্প্রদায়িক মনোভাবেরও বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। ১৮৭৪ সালের ২২ নভেম্বর *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকায় 'এতদ্দেশীয় লোকের বর্তমান অবস্থা' শিরোনামের একটি প্রবন্ধে চাকুরীর প্রতি অনুৎসাহিত করে বলা হয়, "চাকরি ব্যবসায়ীদিগের ত আজিকালি দুরবস্থার পরিসীমা নাই। পূর্ব্বে চাকরিতে বিলক্ষণ উপার্জ্জন ছিল, এক্ষণকার ন্যায় ব্যয়সাধ্য বাহ্যাড়ম্বর না থাকাতে তখনকার চাকরিয়াদিগের সবিশেষ সচ্ছলতাও ছিল। তাহাই দর্শন করিয়া বোধ হয় ইদানীং বহুসংখ্যক লোক চাকরিতে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক এ ব্যবসায়ে এখন আর লাভ মাত্র নাই। পরাধীনতা ও শোষিত শোষক পরিশ্রম মাত্রই উহার সার হইয়া উঠিয়াছে। আয় না থাকিলেও চাকরিয়াদিগকে বাধ্য হইয়া বিবিধ বিষয়ক ব্যয়ে প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে। সুতরাং অর্থকষ্ট ও ঋণ ইহাদিগের অধিকাংশেরই সহচর অনুচর হইয়া উঠিয়াছে"।[৬৫] অর্থাৎ কৃষকদের সন্তানেরা যেন শিক্ষিত হয়ে চাকুরীর প্রতি আকৃষ্ট না হয় সেজন্যই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী কর্তৃক চাকুরী সম্পর্কে এধরনের নেতিবাচক প্রচারণা চলতে থাকে।

বস্তুত ব্রিটিশ শাসনামলের শুরু থেকেই হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা ব্রিটিশ সরকারের দয়া ও আনুকূল্য নিয়ে বিত্তশালী হয়ে ওঠে। অন্যদিকে মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা ব্রিটিশ সরকারের বিরাগভাজন হয়ে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর শ্রেণীতে পরিণত হয়। এই অবস্থা ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করে পাশ্চাত্য শিক্ষা। মুসলমানরা ধর্মীয় বিশ্বাস ও প্রধানত আর্থিক কারণে পাশ্চাত্য শিক্ষা বর্জন করে শুধুমাত্র কৃষি উৎপাদনে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, অন্যদিকে হিন্দু সম্প্রদায় পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করে সরকারি চাকুরী, ব্যবসায়ে জড়িত হয়ে আর্থিকভাবে সচ্ছলতা লাভ করে। আর আর্থিক সচ্ছলতা ও ব্রিটিশ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দুরাই বাংলার ভূস্বামী হিসেবে আবির্ভূত হয়। এর প্রমাণ বাংলার অধিকাংশ জমিদার ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের। এই জমিদার শ্রেণী তথা ভূস্বামীরা সাধারণভাবে বসবাস করত ঢাকা এবং প্রধানত কলকাতা শহরে। এই শ্রেণীটি একদিকে যেমন শহরে বসে জমি থেকে মুনাফা ভোগ করত, তেমনি শহরে বসে বিভিন্ন ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগ করেও মুনাফা লাভ করত। উপরন্তু তাঁদের সন্তানেরাও শহরের স্কুল-কলেজ থেকে শিক্ষিত হয়ে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে ছোট-বড় চাকুরীতে প্রবেশ করত। এই শ্রেণীটি চাষের সঙ্গে জড়িত ছিল না, কিন্তু সবদিক থেকে মুনাফা ভোগ করত। এই কথা বলার অর্থ এই নয় যে, বাংলার সমস্ত জমিদার ও ভূস্বামীই ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের এবং সমস্ত কৃষকেরাই ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক। তবে বাস্তব সত্য ছিল এই যে, তুলনামূলকভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা মুসলমান সম্প্রদায়ের তুলনায় আর্থিক, শৈক্ষিক ও সামাজিকভাবে অনেক অগ্রগামী ছিল। অর্থাৎ হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা একদিকে যেমন ছিল অধিক ভূসম্পত্তির অধিকারী, তেমনি পাশাপাশি ছিল ব্যবসায়ী ও চাকরিজীবী। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তাদের অধিকাংশেরই আর্থিক সচ্ছলতা ছিল। এক কথায় মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুরা আর্থিকভাবে ও শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক বেশি অগ্রগামী ছিল।

তবে দীর্ঘদিন ধরে মুসলমানরা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি বিরাগভাজন থাকলেও উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসে বিভিন্ন কারণে শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এর প্রথম কারণ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সরকার বিভিন্নভাবে এদেশীয়দের জন্য শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। দ্বিতীয়ত, এদেশীয় জমিদার শ্রেণী, বড় ভূস্বামী এবং শিক্ষিত সচ্ছল শ্রেণীর লোকেরাও সাধারণের শিক্ষার উদ্দেশ্যে স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসে। ১৮৯৯-১৯০০ সালের শিক্ষা বিষয়ক কার্যবিবরণী থেকে জানা যায়, পূর্বের বছরের তুলনায় বর্তমান বছরে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১৯,৭৭৫ জন এবং ১৮৯৯-১৯০০ সালে কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৫টা থেকে হয়েছে ৪৪টা, হাইস্কুল বৃদ্ধি পেয়ে ৪৩টি থেকে হয়েছে ৪৭১টি এবং উচ্চ প্রাইমারী স্কুল বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৫৯টি থেকে ৪,৩০৯টি।[৬৬] উনিশ শতকের শেষ দিকে এসে ব্রিটিশ সরকারের গৃহীত শিক্ষানীতির কারণে ভারতবর্ষে শিক্ষা অনেকটা প্রসার লাভ

করে যা বাংলার ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য ছিল। শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের একটা অংশও শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করে। ১৯০৯-১০ সালে মুসলমানদের শিক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে *ঢাকা প্রকাশে* বলা হয়, "উচ্চ শিক্ষার প্রতি মুসলমান সম্প্রদায় যে অনুরাগ প্রদর্শন করিতেছেন, তজ্জন্য তাহারা ধন্যবাদার্হ। কলেজের মুসলমান ছাত্র সংখ্যা ১২৫ স্থলে ২৩০ হইয়াছে; এবং স্কুলেও মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা প্রায় ২,০০০ বর্দ্ধিত হইয়াছে। সাধারণের অর্থ সাহায্যে গবর্ণমেন্টের যোগে যে সকল মুসলমান ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তৎফলেই ছাত্রসংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়াছে।"[৬৭] অর্থাৎ মুসলমান সম্প্রদায় তাদের সন্তানদের শিক্ষিত করার জন্য এগিয়ে আসে যদিও শিক্ষা ছিল খুবই ব্যয়বহুল। উল্লেখ্য, শিক্ষা ব্যয়বহুল ছিল বলেই মূলত সাধারণ জনগণ তথা কৃষকশ্রেণী তাদের সন্তানদের শিক্ষাদান করাতে পারতেন না, বরং তারা আগ্রহ হারিয়ে ফেলতেন। ১৯১৩ সালের ৮ সেপ্টেম্বর *ঢাকা প্রকাশে* 'পল্লীগ্রামে শিক্ষা বিস্তার' শিরোনামের একটি প্রবন্ধে ব্যয়বহুল শিক্ষা সম্পর্কে বলা হয়:

> "স্কুল-কলেজে অধ্যয়ন করা যেরূপ ব্যয়সাপেক্ষ, তাহাতে বহু অভিভাবককেই পুত্রকন্যাদিগকে উচ্চশিক্ষা প্রদানের আশা একেবারেই পরিত্যাগ করিতে হয়। ফলতঃ অতি অল্প সংখ্যক যুবকই আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে। কোন কোন মেধাবী ও উদ্যমশীল বালককে অনেক সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক পরীক্ষার পরই পাঠ বন্ধ করিয়া আজীবন অতিকষ্টে কালাতিপাত করিতে হয়। একমাত্র ব্যয়বাহুল্যই যে ইহার কারণ, তৎসম্বন্ধে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান পদ্ধতি মতে একটী বালককে কলেজে শিক্ষা প্রদান করিতে অন্ততঃ মাসিক ২৫৲ টাকা ব্যয়ের প্রয়োজন, অথচ অনেক অভিভাবক হয়তঃ মাসে ২৫৲ টাকার বেশি উপার্জ্জন করিতে পারেন না; সুতরাং তাহার অধীনস্থ বালককে শিক্ষা প্রদান করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া পড়ে।"[৬৮]

শিক্ষার ব্যয়বাহুল্য সত্ত্বেও উনিশ শতকের শেষ দিকে বাংলায় শিক্ষার হার অনেক অগ্রগতি লাভ করে এবং বাংলার সাধারণ মানুষ তথা কৃষক শ্রেণীর সন্তানেরা শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করে। কারণ, পূর্বের তুলনায় কিছুটা হলেও সাধারণ মানুষ তথা কৃষক শ্রেণীর আর্থিক সচ্ছলতা এসেছিল। আর্থিক সচ্ছলতা কিভাবে এসেছিল তা গভীরভাবে বিশ্লেষণে না গিয়েও বলা যায় পাটচাষের মাধ্যমেই কৃষকদের এই আর্থিক সচ্ছলতা এসেছিল। *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকায়ও তাই বলা হয়েছে। কারণ পত্রিকাটির অভিযোগ ছিল মূলত পাটচাষ বৃদ্ধির কারণেই কৃষকেরা আর্থিকভাবে সচ্ছল হয়ে ওঠে এবং এই আর্থিক সচ্ছলতার কারণেই তাদের সন্তানেরা শিক্ষিত হয়ে উচ্চবিত্ত ও ভদ্রলোক শ্রেণীর পেশা চাকরী ও ব্যবসায় অংশগ্রহণপূর্বক তীব্র প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করছে। অর্থাৎ পাটচাষ বৃদ্ধির মাধ্যমেই যে কৃষক শ্রেণীর আর্থিক সচ্ছলতা এসেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে আর্থিক সচ্ছলতা যেভাবেই আসুক না কেন, বড় কথা হল কৃষকেরা তাদের এই আর্থিক সচ্ছলতার সুযোগে নিজেদের সন্তানদের শিক্ষিত করার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে। সুতরাং বাংলার কৃষক শ্রেণী

আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে তাদের সন্তানদের শিক্ষিত করে তোলে এবং এ কারণেই বাংলায় শিক্ষার হার অনেক বৃদ্ধি পায়।

এখন প্রশ্ন ওঠে আসলেই কি উনিশ শতকের শেষের দিকে এবং বিশ শতকের প্রথম দিকে বাংলায় শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছিল, যার ফলে পাটচাষ বিরোধী আন্দোলনে এই বিষয়টিকে তুলে ধরা হয়? দ্বিতীয়ত, এই শিক্ষার হার বৃদ্ধির কারণে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির কি সম্পর্ক ছিল? এই দুটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্বে বাংলায় বিশেষ করে প্রধান পাট উৎপাদনকারী অঞ্চলের হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যকার তুলনামূলক শিক্ষার অগ্রগতি দেখানো হলো:

সারণি-৩: বাংলার হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যকার তুলনামূলক শিক্ষার অগ্রগতি, ১৯০১-১৯৩১এ (প্রতি হাজারে)

সম্প্রদায়	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১
হিন্দু	২৩১	২৬১	৩০৪	৩০৬
মুসলমান	৭৯	৯৬	১১৫	১৩৩

সূত্র: Census of India 1931, Bengal & Sikkim, Report, Part I, Vol. V, (Calcutta : Central Publication Branch, 1933), P. 324.

সারণি-৩ থেকে দেখা যায় যে, হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমশ শিক্ষার অগ্রগতি হয়েছিল। এখানে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যকার শিক্ষার অগ্রগতি ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ ইতঃপূর্বে মুসলমানদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ছিল না বরং তারা ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষার বিরোধী; দ্বিতীয়ত, ব্যয়বহুল শিক্ষা মুসলমানদের পক্ষে গ্রহণ করাও সম্ভব ছিল না। আসলে এটাই মূলকথা। কিন্তু উনিশ শতকের শেষ দিকে এবং বিশ শতকের প্রথম দিকে মুসলমানদের এই আর্থিক সচ্ছলতা কিভাবে এসেছিল তা সঠিকভাবে জানা না গেলেও পত্রিকার প্রচারণা দেখে অনুমান করা যায় যে, পাটচাষ করার কারণেই মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে আর্থিক সচ্ছলতা এসেছিল। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন, বাংলা তথা পূর্ববাংলার অধিকাংশ মুসলমান ছিল কৃষক শ্রেণীর। অন্যদিকে পূর্ববাংলার জমিদার এবং ভূস্বামীদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের। এ ছাড়াও পূর্ব থেকেই শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রসর হিন্দু সম্প্রদায় চাকরি ও অন্যান্য ব্যবসায়ের সঙ্গেও জড়িত ছিল। অন্যদিকে সামান্য দুই একটি পরিবার ব্যতীত মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে চাকরিজীবী ও ব্যবসায়ী খুঁজে পাওয়া ছিল কঠিন ব্যাপার। অর্থাৎ মুসলমানদের অধিকাংশই ছিল কৃষক শ্রেণীর। আর যেহেতু কৃষিজ উৎপাদনই ছিল তাদের প্রধান অবলম্বন, তাই তাদের আর্থিক সচ্ছলতাও নির্ভর করত কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন ও উচ্চমূল্যে বিক্রির ওপর। উনিশ শতকের শেষ দিকে এবং বিশ শতকের প্রথম দিকে মুসলমান কৃষকেরা পাট উৎপাদন করে তুলনামূলকভাবে অন্যান্য ফসলের চেয়ে

উচ্চমূল্যে বিক্রি করে আর্থিকভাবে সচ্ছলতা পেয়েছিল। এই আর্থিক সচ্ছলতা পাওয়ার কারণেই তারা তাদের সন্তানদের শিক্ষিত করতে পেরেছিল। অর্থাৎ এই সময় কৃষকদের মধ্যে আর্থিক সচ্ছলতা আসে এবং তারা তাদের সন্তানদের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ ব্যবহার করে। সুতরাং উনিশ শতকের শেষ দিকে এবং বিশ শতকের প্রথম দিকে মুসলমানদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হারে শিক্ষার অগ্রগতি সাধিত হয়। আর এতেই উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে তথাকথিত উচ্চবিত্ত ও ভদ্রলোক শ্রেণীর হিন্দু সম্প্রদায়। বস্তুত এই শ্রেণী চেয়েছিল চাকুরী ও ব্যবসায়ে যেন তাদের একচেটিয়া অধিকার অক্ষুণ্ন থাকে। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরও এখানেই নিহিত। অর্থাৎ মুসলমানদের শিক্ষার অগ্রগতি দেখে হিন্দু সম্প্রদায়ের তথাকথিত উচ্চবিত্ত ও ভদ্রলোক শ্রেণী বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যকার চাকরিজীবী এবং ব্যবসায়ী শ্রেণীর মধ্যে এক ধরনের ঈর্ষা ও হীনমানসিকতার উদ্রেক হয়েছিল। উপরন্তু তারা এই ভেবে আরও বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল যে, কৃষকশ্রেণী যদি এমনিভাবে শিক্ষিত হয়ে নিজেদের পেশা কৃষি কাজ ছেড়ে চাকুরি ও ব্যবসায়ে অংশ গ্রহণ করে তাহলে তীব্র প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হবে এবং তাদের একচেটিয়া অধিকার ক্ষুন্ন হবে। আর এখানেই সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির উপাদান বিদ্যমান ছিল। তবে এ থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত হবে না যে, সামগ্রিকভাবে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য সূচিত হয়েছিল। মূলত পাটচাষ বিরোধী আন্দোলনকারী একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যেই এই সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি সীমিতভাবে হলেও পরিলক্ষিত হয়েছিল। উল্লেখ্য, ব্রিটিশ শাসনের সূচনালগ্ন থেকেই বৃটিশ শাসক কর্তৃপক্ষের একদিকে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি আনুকূল্য, সুযোগ-সুবিধা প্রদান এবং অন্যদিকে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণের (ব্রিটিশ পূর্ব মুসলমান শাসকগোষ্ঠী হিসেবে মুসলমানদেরকে দাবিয়ে রাখার নিমিত্তে) কারণেই মূলত হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যের সূচনা হয়েছিল। সুতরাং, এই সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির বীজ বপন করেছিল বিদেশী শাসক কর্তৃপক্ষ, যা পরবর্তীকালে মহীরূহ রূপে আবির্ভূত হয়েছিল।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে কৃষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে পাটচাষ বিরোধীদের অভিযোগসমূহ যৌক্তিক না হলে এ ধরনের অভিযোগ উত্থাপনের কারণ কি ছিল? সংক্ষেপে বলতে গেলে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কৃষকেরা পাটচাষ সম্প্রসারণে উৎসাহী হলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি অংশ পাটচাষের বিরোধিতা শুরু করে। অর্থাৎ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি অংশের পাটচাষ সম্প্রসারণ পছন্দ হয়নি বলেই কৃষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করে এবং পাট চাষের বিরোধিতা করে। তবে কৃষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে পাটচাষ বিরোধীদের অভিযোগসমূহ গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি অংশ কৃষক শ্রেণীর আর্থিক সচ্ছলতাকে সুনজরে

দেখতে পারেনি বলেই পাটচাষ বিরোধী প্রচারণা শুরু করে। অনেকের মতে পাটচাষ বিরোধী প্রচারণার মাধ্যমে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হীনমানসিকতার পরিচয় ফুটে উঠেছিল। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীটি ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের। অন্যদিকে বাংলার কৃষক শ্রেণীর অধিকাংশই ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের। একারণেই অনেকে মনে করেন যে, পাটচাষের মাধ্যমে মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত কৃষকদের আর্থিক সচ্ছলতা ও তাঁদের সন্তানদের শিক্ষা গ্রহণসহ কৃষক শ্রেণীর উন্নতিকে হিন্দু সম্প্রদায়ের গড়ে ওঠা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীটি সুনজরে দেখতে পারেনি। অর্থাৎ কৃষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে পাট চাষ বিরোধীদের অভিযোগ উত্থাপনের কারণ ছিল সম্প্রদায়গত। বলার অপেক্ষা রাখে না এ ধরনের অভিযোগ সত্য হলে ধরে নিতে হবে যে, হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থানগত কারণেই উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পাটচাষ বিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল।

এখন প্রশ্ন হল পাটচাষ বিরোধী আন্দোলনে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও জমিদার শ্রেণীর প্রতিক্রিয়া কি ছিল? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় উনিশ শতকের পাটচাষ বিরোধী আন্দোলনে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ইতিবাচক সাড়া না দিয়ে বরং নীরব ভূমিকা পালন করেছিল। উনিশ শতকের পাটচাষ বিরোধী আন্দোলনে *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকার আহ্বান সত্ত্বেও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেননি এবং বিশেষ করে উনিশ শতকের আশির দশকে প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস দল তাঁদেরকে সমর্থন করেনি। ১৮৮৯ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর *ঢাকা প্রকাশে* রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে উনিশ শতকের আশির দশকে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতি দল কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দকে আন্দোলনে সাড়া দেয়ার জন্য আহ্বান করে বলা হয়,

> "আমরা রাজনৈতিক ব্যাপার লইয়া সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত আছি; গগণ ফাটাইয়া রাজনৈতিক বক্তৃতা করিতেছি; কিন্তু দেশের অবস্থা যে কি সেটুকুও দেখিতেছি না। কত দিক দিয়া যে কত সর্ব্বনাশের পথ উন্মুক্ত হইতেছে আমরা সে দিকের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করিতেছি না। বাঙ্গালীর মত এই অবিমৃষ্যকারী ও অপরিণামদর্শী জগতে আর নাই। যাহা হউক আমরা প্রার্থনা করি, যাহারা দেশের আশা ও ভরসার স্থল তাঁহারা সতর্ক হউন। যাহাতে পাটের কল্যাণে দেশের শস্য রাশি উৎসন্ন না হয় তাহার উপায় করুন। ২ কোটি মণ পাটের পরিবর্ত্তে, দুই কোটি মণ না হউক এক কোটি মণ ধান্য উৎপন্ন হইলেও দেশের লোক খাইয়া বাঁচিতে পারে। তাই বলি এখনও সময় আছে, সতর্ক হউন।"[৬৯]

কিন্তু এ আহ্বানে তখন সাড়া দেননি কংগ্রেস দলের নেতৃবৃন্দ। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, উনিশ শতকের পাটচাষ বিরোধী আন্দোলনে সরকার নীরব ভূমিকা পালন করেছিল।

অন্যদিকে জমিদার শ্রেণীও উনিশ শতকের পাটচাষ বিরোধী আন্দোলনে ইতিবাচক সাড়া না দিয়ে বরং নীরব ভূমিকা পালন করেছিল। এমনকি অনেকে মনে করেন যে, জমিদার শ্রেণী পাটচাষের বৃদ্ধিতে পরোক্ষভাবে হলেও উৎসাহিত করেছিল। কারণ পাটচাষ বিরোধী

আন্দোলনে অংশগ্রহণপূর্বক পাটচাষ হ্রাস পেলেই বরং জমিদার শ্রেণীর স্বার্থ বিঘ্নিত হত। বস্তুত কৃষকদের পাটচাষ বৃদ্ধি ও ভাল মূল্য প্রাপ্তির ওপর নির্ভর করত জমিদারদের নিয়মিত খাজনা আদায়। ১৮৯৭ সালের ৩ জানুয়ারি *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকায় জমিদার শ্রেণীর পাটচাষের বিরোধিতা না করার কারণ সম্পর্কে বলা হয়, "দেশীয় জমিদারগণ নিজ নিজ স্বার্থেই তৎপর, পাটেরচাষে তাঁদের খাজনা আদায়ের কোন বিঘ্ন বাধা নাই, কাজেই ধান্য চাষের উপর তত লক্ষ্য নাই, গরীব প্রজারা খাইতে পায় আর না পায় তাতে বোধ হয়, তাঁদের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।"[৭০] একইভাবে ১৮৯৭ সালের ২০ জুন *ঢাকা প্রকাশে* জমিদার শ্রেণীর পাটচাষের বিরোধিতা না করে বরং কৃষকদেরকে পাটচাষে উৎসাহিত করার কারণ উল্লেখপূর্বক বলা হয়, "জমিদারগণ নিজ নিজ প্রজাবর্গকে যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ সাহায্য করিতেছে না বটে, কিন্তু এই টাকা আদায় করিবার জন্য ধান চাষের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কোষ্টার চাষের উন্নতিতেই যত্নবান দেখা যায়।"[৭১] সুতরাং, নিয়মিত খাজনা আদায়ের স্বার্থেই জমিদার শ্রেণী পাটচাষের বিরোধিতা না করে বরং নীরব ভূমিকা পালন করে, এমন কি তারা পাটচাষ বৃদ্ধির জন্য পরোক্ষভাবে হলেও কৃষকদেরকে উৎসাহিত করেছিল। উল্লেখ্য যে, কৃষক শ্রেণীও তাঁদের আর্থ-সামাজিক স্বার্থেই পাটচাষ বিরোধী আন্দোলনে নীরব ভূমিকা পালন করেছিলেন।

তথ্যনির্দেশ

১ দ্রষ্টব্য, উনিশ শতকে প্রতিষ্ঠিত *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকা ছিল একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা, কিন্তু বিশ শতকের বিশের দশকে এসে এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটি দৈনিক পত্রিকা হিসেবে নিয়মিত প্রকাশ হতে থাকে। উল্লেখ্য, পত্রিকাটি ঢাকা থেকে প্রকাশিত হত।

২ শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু (সম্পাদিত), *বিশ্বকোষ*, একাদশ ভাগ, (কলিকাতা: ইউ সি বসু এন্ড কোম্পানী, ১৩০৭), পৃ. ১২৫।

৩ মতিলাল মজুমদার, *পূর্ব ভারতের ফসল*, (কলিকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯১), পৃ. ২৭৭।

৪ বিশ্বকোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৪।

৫ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৪।

৬ মতিলাল মজুমদার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭৭।

৭ *Marketing of Jute in East Pakistan,* Prepared by A Research Team of the Dacca University Socio- Economic Research Board, (Dacca : The Dacca University Socio-Economic Research Board, 1961), P. 1.

৮ Bundle No. 1, File No. 7, No. 25, Progs. For July 1873.

৯ *Bundle No. 1, File No. VII, No. 16, Progs. For April 1873,* P. 2.

১০ সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, অর্থনৈতিক ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, (ঢাকা ঃ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯৩), পৃ. ৩২৬।

১১ নীহার রঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস*, আদিপর্ব, (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৪০০), পৃ. ৮৭।

১২ বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১, অর্থনৈতিক ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১।

১৩ মতিলাল মজুমদার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭৭।

১৪ *Report of the Bengal Jute Enquiry Committee (Finlow Committee), 1934* , Vol. I, p. 5; A. Z. M. Iftikhar-ul-Awwal, *The Industrial Development of Bengal 1900-1939*, (New Delhi : Vikas Publishing House Pvt. Ltd., 1982), p. 157; শেখ মাকসুদ আলী (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার : বৃহত্তর ঢাকা (প্রাকৃতিক ও আর্থ সামাজিক ইতিহাস)*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, (ঢাকা : বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ১৯৯৩), পৃ. ১৯৩; মতিলাল মজুমদার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭৭।

১৫ A.Z.M. Iftikhar-ul-Awwal, *পূর্বোক্ত*, p. 157.

১৬ Vera Anesty, *The Economic Development of India*, (London : Longmans, Green & Co., 1929), p. 279.

১৭ Report of the Bengal Jute Enquiry Committee (Finlow Committee), 1934 , Vol. I, p. 5; A.Z.M. Iftikhar-ul-Awwal, op, cit., p. 157.

১৮ মতিলাল মজুমদার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭৭।

১৯ M. Mufakharul Islam, 'Aspects of Jute Cultivation in Undivided Bengal', *Research Network Program (RNP) of Contemporary Economics Series*, No. 2001-01, (Japan: Graduate School of Economics Hitotsubashi University, Tokyo), p. 4.

২০ *পূর্বোক্ত*, p. 2.

২১ বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১, অর্থনৈতিক ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৩।

২২ Sugata Bose, 'General Economic Conditions Under the Raj,' *History of Bangladesh 1704-1971*, Economic History, Vol. Two, (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, Second Edition, 1997), P. 93.

২৩ Md. Wazed Ali, 'Jute Cultivation in Bengal 1870-1914', *The journal of The Institute of Bangladesh Studies*, Vol. III, 1978, Rajshahi University, p. 49.

২৪ M. Mufakharul Islam, 'Aspects of Jute Cultivation in Undivided Bengal', *op, cit*., P. 4; Binay Bhushan Chaudhuri, 'Commerciallization of Agriculture,' *History of Bangladesh 1704-1971*, Economic History, Vol. Two, (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, Second Edition,1997), P. 317.

২৫ *Report of the Bengal Jute Enquiry Committee* (Finlow Committee), 1934, Vol. I, p. 6; G. B. Jathar (et al.), *Indian Economics : A Comprehensive and Critical Survey*, Vol. Two, (London : Oxford University Press, 1941), p. 42; A. Z. M. Iftikhar-ul-Awwal, *op, cit*., p. 157; Vera Anstey, *op, cit*., p. 279; বিশ্বকোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৫; সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া : বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*, ৫ম খণ্ড, (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ৩৩২; এম. মোফাখখারুল ইসলাম, 'ইংরেজ শাসন আমলে বাংলায় পাট চাষ,' *ইতিহাস ঃ সমকালীন ঐতিহাসিকদের কলমে*..., (ঢাকা : ইতিহাস বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ২০০৪), পৃ. ১৪; মতিলাল মজুমদার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭৭; ছায়া দাশগুপ্ত (অনুবাদিকা), *ভারতে কৃষি সম্পর্ক ১৭৯৩-১৯৪৭*, (কলিকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৫), পৃ. ৬০। উল্লেখ্য, ১৮৫৫ সালে হুগলী নদীর তীরে কলকাতার সন্নিকটে রিষড়ায় বাংলার প্রথম পাটকল প্রতিষ্ঠা করেন জর্জ অকল্যান্ড। আরও উল্লেখ্য, *বিশ্বকোষ* গ্রন্থ মতে বাংলায় প্রথম পাটকল স্থাপিত হয় ১৮৫৪ সালে এবং *ভারতে কৃষি সম্পর্ক ১৭৯৩-১৯৪৭* গ্রন্থ মতে বাংলায় প্রথম পাটকল স্থাপিত হয় ১৮৫৬ সালে।

২৬ History of Bangladesh 1704-1971, Economic History, Vol. Two, *op, cit*., p. 316; *বাংলাপিডিয়া*, ৫ম খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৩৩।

২৭ *Bundle No. 7, File No. 7- No. 25, Progs. For July 1873*, P. 1.

২৮ Census of India 1901, The Lower Provinces of Bengal and their Mendatories, Vol. VIB, Part III, P. 8.

২৯ এম. মোফাখখারুল ইসলাম, 'ইংরেজ শাসন আমলে বাংলায় পাট চাষ,' *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪।

৩০ *ঢাকা প্রকাশ*, ৩০ আগস্ট ১৮৭৪ (১৫ ভাদ্র ১২৮১), পৃ. ৯৩ - ৯৪।

৩১ *Report of the Bengal Jute Enquiry Committee (*Fawcus *Committee), 1938*, Vol. I, p. 8.

৩২ Akbar Ali Khan, *Some Aspects of Peasant Behaviour in Bengal 1890- 1914 : A Neo Classical Analysis*, (Dhaka : Asiatic Society of Bangladesh,1982), pp. 51, 54, 55.

৩৩ এ সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, Akbar Ali Khan, *পূর্বোক্ত*, pp. 17-57.

৩৪ M. Mufakharul Islam, 'Aspects of Jute Cultivation in Undivided Bengal', *op, cit*., p. 4.

৩৫ *বাংলাপিডিয়া*, ৪র্থ খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৮২।

৩৬ ১৮৯৬-৯৭ সালের দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, B. M. Bhatia, *Famines in India 1860-65*, (New York : Asia Publishing House, 2nd Edition, 1967), pp. 239-250.

৩৭ *ঢাকা প্রকাশ*, ৩০ আগস্ট ১৮৭৪ (১৫ ভাদ্র ১২৮১), পৃ. ৯৩-৯৪।

৩৮ *ঢাকা প্রকাশ*, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৯১ (১১ আশ্বিন ১২৯৮), পৃ. ৫।

৩৯ *ঢাকা প্রকাশ*, ২৩ সেপ্টেম্বর ১৮৮৮ (৮ আশ্বিন ১২৯৫), পৃ. ৪।

৪০ *ঢাকা প্রকাশ*, ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৮৯ (৩১ ভাদ্র ১২৯৬), পৃ. ৫-৬।

৪১ *বাংলাপিডিয়া*, ৮ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৩।

৪২ *প্রাগুক্ত।*

৪৩ *বঙ্গবাণী*, ষষ্ঠ বর্ষ, ১৩৩৩-৩৪ (১৯২৬-২৭), পৃ. ২১৪।

৪৪ L.S.S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers: Jessore*, Calcutta, 1912, pp. 59-64; L.S.S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers: Puri*, Calcutta, 1908, p. 128; L.S.S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers: Bankura*, Calcutta, 1908, p. 81; L.S.S. O'Malley and Monmohan Chakravarti, *Bengal District Gazetteers: Howrah*, Calcutta, 1909, pp. 55-56; L.S.S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers: Patna*, Calcutta, 1907, pp. 80-811; L.S.S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers: Rajshahi*, Calcutta, 1916, P. 72; L.S.S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers: Pabna*, Calcutta, 1923, p. 40; L.S.S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers: Midnapore*, Calcutta, 1911), p. 76; J. Byrne, *Bengal District Gazetteers: Bhagalpur*, Calcutta, 1911, p. 60; J.C.K. Peterson, *Bengal District Gazetteers: Burdwan*, Calcutta, 1910, p. 76; J.N. Gupta, *Eastern Bengal and Assam District Gazetteers : Bogra*, Allahabad, 1910, pp. 52-53; J.E. Webster, *Eastern Bengal District Gazetteers: Tippera*, Allahabad, 1910, p. 34.

৪৫ L. S. S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers: 24 Parganas*, (Calcutta : The Bengal Secretariat Book Depot, 1914), p. 86.

৪৬ *পূর্বোক্ত*

৪৭ L. S. S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers : Bankura*, (Calcutta : The Bengal Secretariat Book Depot, 1908), p. 81.

৪৮ L. S. S. O'Malley and Monmohan Chakravarti, Bengal District Gazetteers : Howrah, (Chlcutta : Bengal Secretaricat Book Depot, 1909), pp. 55-56.

৪৯ বঙ্গবাণী, ষষ্ঠ বর্ষ, ১৩৩৩-৩৪ (১৯২৬-২৭), পৃ. ২১৪।

৫০ B. C. Allen, *Assam District Gazetteers : Sylhet*, Vol. II, (Calcutta : The Caledonian Steam Printing works, 1905), p. 265

৫১ *ঢাকা প্রকাশ*, ১৯ আগষ্ট ১৯০০ (৩ ভাদ্র ১৩০৭), পৃ. ৪।

৫২ *ঢাকা প্রকাশ*, ১৭ মার্চ ১৯০১ (৪ চৈত্র ১৩০৭), পৃ. ৪।

৫৩ *বঙ্গবাণী*, প্রথম বর্ষ ১৩২৮-২৯ (১৯২১-২২ সাল), পৃ. ৭৮।
৫৪ Census of India 1901, *Bengal*, *op, cit*., p. 382.
৫৫ *Census of India 1921*, Bengal, Report, Vol. V, Part II, (Calcutta : Bengal Secretariat Book Depot, 1923), p. 380.
৫৬ *ঢাকা প্রকাশ*, ২২ নভেম্বর ১৮৭৪ (৭ অগ্রহায়ণ ১২৮১), পৃ. ৩৮৯।
৫৭ Census of India 1921, *Bengal*, *op, cit*., p. 382.
৫৮ *ঢাকা প্রকাশ*, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৯১ (১১ আশ্বিন ১২৯৮), পৃ. ৪।
৫৯ *ঢাকা প্রকাশ*, ২৩ সেপ্টেম্বর ১৮৮৮ (৮ আশ্বিন ১২৯৫), পৃ. ৩-৪।
৬০ *ঢাকা প্রকাশ*, ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৮৯ (৩১ ভাদ্র ১২৯৬), পৃ. ৫-৬।
৬১ *বঙ্গবাণী*, ৩য় বর্ষ, দ্বিতীয়ার্দ্ধ ১৩৩১ বং (১৯২৪সাল), পৃ. ৬২।
৬২ Sugata Bose, *Agrarian Bengal : Economy, Social Structure and Politics, 1919-1947*, (Great Britain : Cambridge University Press, 1986), p. 38.
৬৩ George Patterson, *Geography of India : Physical, Political and Commercial*, Part II, India in Provinces and States, (London : The Christian Literature Society for India, 1909), p. 13.
৬৪ J.N. Gupta, *Eastern Bengal and Assam District Gazetteers : Bogra*, (Allahabad : The Pioneer Press, 1910), p. 58.
৬৫ *ঢাকা প্রকাশ*, ২২ নভেম্বর ১৮৭৪ (৭ অগ্রহায়ণ ১২৮১), পৃ. ৩৮৭-৩৮৯।
৬৬ ঢাকা প্রকাশ, ১৭ মার্চ ১৯০১ (৪ চৈত্র ১৩০৭), পৃ. ৪।
৬৭ ঢাকা প্রকাশ, ১ জানুয়ারি ১৯১০ (১৩১৭), পৃ. ৬।
৬৮ ঢাকা প্রকাশ, ৮ সেপ্টেম্বর ১৯১৩ (১৩২০), পৃ. ৩।
৬৯ *ঢাকা প্রকাশ*, ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৮৯ (৩১ ভাদ্র ১২৯৬), পৃ. ৬।
৭০ *ঢাকা প্রকাশ*, ৩ জানুয়ারি ১৮৯৭ (২০ পৌষ ১৩০৩), পৃ. ১০।
৭১ *ঢাকা প্রকাশ*, ২০ জুন ১৮৯৭ (৭ আষাঢ় ১৩০৪), পৃ. ৯।

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, ত্রিংশ খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৯/জুন ২০১২

আরজান শাহ্'র গানে ভজন-সাধন

মো. আবদুল ওহাব*

সারসংক্ষেপ

আরজান শাহ্ (১৮৮৫-১৯৫৮) মেহেরপুর অঞ্চলের প্রধান সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি – বাউল সাধনার শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম ও শাস্ত্রকে অগ্রাহ্য করে তিনি যে সাধনার ভুবন নির্মাণ করেছেন, তা মানবিক চেতনা ও বোধে ঋদ্ধ। জাতপাত, সম্প্রদায়বিদ্বেষ ও প্রথা-সংস্কারের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন – গানের ভেতর দিয়ে জানিয়েছেন প্রতিবাদ। বর্ণনা করেছেন ভজন-সাধনার নানা পদ্ধতি। মরমি ভাবসাধনার এই সাধককবির শিল্পচেতনা ও কবিত্বশক্তি বিস্ময়কর। এ বিষয়টি আলোচ্য প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে।

বাউল সাধনা দেহভিত্তিক গুপ্ত সাধনা। সঙ্গীতাশ্রয়ী সাধন-ভজন এই সম্প্রদায়ের আরাধনার মূলরূপ। দেহভিত্তিক সাধনাকে তাঁরা জীবন ও জগতে মুক্তির একমাত্র উপায় বলে মনে করেন। তঁরা কোনো জাতিভেদ মানেন না। সকল জাতের বা বর্ণের মানুষকে তাঁরা তাঁদের সাধন ক্ষেত্রে স্থান দিয়ে থাকেন। এই মানবতাবাদী সাধন-পথের একজন পথিক মেহেরপুর অঞ্চলের বাউল কবি আরজান শাহ্।

বাউল আরজান শাহ্ ১৮৮৫ সালে মেহেরপুর জেলার ইছাখালী গ্রামে এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মোটন বিশ্বাস ও মাতা ছনো খাতুন। মোটন বিশ্বাসের চার সন্তান– শরীয়ত, নুরজাহান, আরজান ও আরজিয়া খাতুন। আরজান শাহ্ ইছাখালী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়েন। পাশাপাশি গ্রামের এক মৌলবীর নিকট আরবি ও ফারসি ভাষায় শিক্ষা লাভ করেন। ছোটবেলা থেকেই সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন তিনি। গানের আসরের কথা শুনলেই মাইলের পর মাইল হেঁটে গানের আসরে যোগ দিতেন। গানের তত্ত্বকথা তাঁকে আকর্ষণ করত। তিনি উদাসীর মত বাংলা–ভারতের বিভিন্ন খানকা ও আখড়ায় ঘুরে বেড়াতেন। ঘরমুখি করার জন্য বাবা তাঁকে নিজ গ্রাম ইছাখালীর আইনুদ্দিনের কন্যা ফজেলান বিবির সঙ্গে বিয়ে দেন। ফজেলানের ঘরে পাঁচ সন্তান জন্মগ্রহণ করেন– আরোজুল্লাহ, ইসমাঈল, নিপজান, এরফান ও টুনু। এদের মধ্যে একমাত্র টুনু জীবিত আছেন। টুনুকে বিয়ে দিয়েছিলেন দেশবিভাগের পূর্বে ভারতের তেহট্ট থানার জীপপুর গ্রামে। সেখানেই তিনি স্বামী সন্তান নিয়ে বসবাস করছেন।[১]

* সহকারী অধ্যাপক (বাংলা), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা

পরে আরজান শাহের সঙ্গে ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার পাটকী বাড়ির গোঘাটা গ্রামের নইমুদ্দিন বিশ্বাসের কন্যা কমলাজানের বিয়ে হয়। কমলার ঘরে তিন সন্তান– রুহুল আমীন, লতিফা বেগম ও জাহানারা বেগম। রুহুল আমীন মারা গেছেন। লতিফা ও জাহানারা স্বামী-সন্তান নিয়ে ইছাখালী গ্রামে বসবাস করছেন।

আরজান শাহ্ সাংসারিক কাজে তেমন মনোযোগী ছিলেন না। যৌবনকালে তিনি বিভিন্ন সাধু-গুরুর সংস্পর্শে আসেন এবং এক সময় বাউল সাধক চাঁদপতির নিকট চিশতিয়া তরিকা অনুযায়ী শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি প্রথম জীবনে শরীয়তের বিধি-বিধান মেনে চলতেন। আর গোপনে ফকিরি সাধনা করতেন। তার ফকিরি সাধনার বিষয় জানা-জানি হলে মসজিদের মুছল্লিরা ক্ষুব্ধ হন। এ-অবস্থায় আরজান মসজিদে যাওয়া বন্ধ করে দেন। তবে কিছুদিন বাড়িতে নিয়মিত নামাজ পড়েছেন। পরে দায়েমী সালাতে নিয়োজিত হন। গুরুর চেহারা সদাসর্বদা স্মরণ করাই দায়েমী সালাতের মূল আচার। তাদের মধ্যে গুরুকে সেজদা করার রেওয়াজ আছে।

আরজান শাহ্ গ্রামের সেবামূলক কাজেও অংশ নিতেন। এলাকাবাসীর অনুরোধে একবার ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যপদে নির্বাচনে দাঁড়িয়ে বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছিলেন। তাঁর প্রায় পঁচিশ বিঘা জমি ছিল। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় তাঁর সব জমি ভারত সীমান্তের মধ্যে পড়ে যায়। ভারত সরকার সে জমিগুলোকে খাস করে নিয়েছে। তখন থেকে আরজান শাহ্র সন্তানরা হয়ে পড়েছেন ভূমিহীন।[২]

আরজান শাহ্র পঞ্চাশ বছর বয়সে এক সাধুসভায় তাঁর গুরু চাঁদপতি নিজ বাড়িতে তাঁকে খেলাফত প্রদান করেন। ফকিরি সাধনায় তিনি জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার জন্য চর্চা শুরু করেন এবং গুরুর দেয়া শিক্ষা ও তত্ত্বকথা গানের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। তিনি অনেক দেহতত্ত্ব বিষয়ক গান লিখেছেন। তাঁর গান ভারতের নদীয়া জেলা ও বাংলাদেশের মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন ভক্তের নিকট ছড়িয়ে আছে। তাঁর মোট গানের সংখ্যা প্রায় পাঁচশ। এর মধ্যে দুইশ পঁয়ত্রিশটি গান সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে।

জীবিতকালেই বাংলা ও ভারতে আরজান শাহের বহু ভক্ত তৈরি হয়। অধিকাংশ সময় তিনি ভক্তদের বাড়িতে থেকে সাধুসভা করতেন ও গান গাইতেন। একবার মেহেরপুরের বাঘাখালী আমোদ পাইকের বাড়িতে সাধুসভা করার জন্য যান। সেখানে গফুর মৌলবীর সঙ্গে তাঁর তর্ক হয়। মৌলবী সাহেব কতিপয় মুছল্লিকে সঙ্গে নিয়ে বলেন যে– গোঁফের পানি খাওয়া হারাম। উত্তরে তখন আরজান শাহ্ বলেন যে, হযরত মুহাম্মদ ১৫ বছর হেরা পর্বতের গুহায় ধ্যান করেছেন, আদম সাড়ে তিনশ বছর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেঁদেছেন। এ সময় তাঁরা হাতপায়ের নখ ও শরীরের কোন লোম কাটেন নি। এটা হচ্ছে সাধনার অবস্থা। কিন্তু মৌলবী ও তার সাঙ্গোপাঙ্গরা তা মেনে নেননি। জোর করে তারা আরজান শাহ্র বাবরী চুল

ও গোঁফ কেটে দেয়। আরজান শাহ্ সেখান থেকে ফিরে এসে মেহেরপুর কোর্টে মামলা করেন। চুল ও গোঁফ কাটার অপরাধে বিচারক গফুর মৌলবীকে তিন মাসের জেল ও পঞ্চাশ টাকা জরিমানা করেন। এতে ফকিরেরা বিজয় উল্লাস করেন। এরপর তাঁর ভক্ত ও শিষ্যের সংখ্যা আরো বেড়ে যায়।[৩]

আরজান মুখে মুখে গান রচনা করতেন এবং তা তাঁর শিষ্যগণ মুখস্থ করতেন অথবা খাতায় লিখে রাখতেন। তিনি বিচার গানের আসরে অংশগ্রহণ করেন। শিষ্য সাহারবাটির আজাদ শাহ্কে নিয়ে তিনি বিভিন্ন এলাকায় গান গেয়েছেন। যেমন– ইছাখালরী নিজ আখড়া বাড়ি, দাড়িয়াপুর খেজমত শাহ্র বাড়ি, ফতেপুর দৌলতশাহার আখড়া, সাহারবাটী আজাদ শাহ্র বাড়ি ও আমঝুপি গোলাম শাহ্র আখড়া। তাঁর গান শোনার জন্য শতশত নারী-পুরুষ ভিড় জমাত। সারারাত জেগেও তাঁর গান শুনেছে শ্রোতারা। এসব গানে সাধারণ মানুষ চিত্তবিনোদনের সঙ্গে ধর্ম এবং জীবনবোধ সম্পর্কীয় নানা জ্ঞান-পিপাসা মিটিয়েছে। তাঁর গানে অধ্যাত্মবাদ, দেহতত্ত্ব ও গুপ্ততত্ত্ব নানা প্রতীকী ব্যঞ্জনায় প্রকাশিত হয়েছে।

আরজান শাহ্র মতে, মানুষ চোখ বন্ধ করলে জগৎ সংসার আর দেখে না, তখন পরম সত্যের সন্ধানে ভাবের রাজ্যে সহজ ভ্রমণের সুযোগ আসে। চাঁদপতি সেই সহজ ভ্রমণের দীক্ষাগুরু। মানুষ যে সত্যের সাধনা করছে তার মধ্যে রয়েছে মানব দেহের অন্তর্গত বস্তুগত তথ্যকে ধ্যানেজ্ঞানে শিল্প-সৌকর্যলোকে উত্তরণের প্রয়াশ।[৪] বাউলতত্ত্বে দেহের একটি স্থান আছে, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী দেহটি তার সর্বস্ব নয়; দেহের মাঝে যে প্রাণপাখি আছে সেই প্রাণ পাখিটিই হচ্ছে মানবাত্মা। দেহটি ছেড়ে পাখিটি উড়ে যাওয়ার অর্থই হচ্ছে আত্মার গতিকে বিশেষ থেকে নির্বিশেষের অনন্তযাত্রায় উর্ধ্বমুখী করা। যিনি দিব্যজ্ঞানী তিনি সহজেই এই পরম রহস্যের সূক্ষ্মজাল ভেদ করতে পারেন। মানুষ অধ্যাত্মসাধনার দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করে। ক্ষুদ্রত্ব অতিক্রম করে বিরাট শক্তির অধিকারী হয়ে মহাসত্তার পরশ পেতে পারে।[৫] আত্মজ্ঞান লাভেই মানুষ মুক্তি লাভ করতে পারে। এ বিষয় নিয়ে আরজান শাহ্ গান রচনা করেছেন–

একমাত্র আত্মজ্ঞান মুক্তিপদ জানিবে।
আত্মজ্ঞান যার জন্মিয়াছে মুক্তি লাভ সে করিবে ॥
তপজপ কি মন্ত্র দ্বারা যাবে না মুক্তি লাভ করা
আপ্ততত্ত্ব সঞ্চার দ্বারা গুরু সদয় হইবে।
যাহার প্রসাদে জানো পরমপদ হয় দর্শন
গুরুদেবের তুল্য মন বন্ধু কোথায় পাইবে ॥
চরাচর অখিল ব্রহ্মাণ্ড একমাত্র আত্মার কাণ্ড
আরজানের তপস্যা ভণ্ড মুক্তি না পাইবে।[৬]

মানুষের মধ্যেই স্রষ্টার লীলা, মানুষের মধ্যেই তাঁর অবস্থান। মানবদেহ সাঁইয়ের লীলার প্রকাশ। নিরাকার সাঁই মানবের মধ্যে প্রকাশিত, মানব ও সাঁই একাত্ম। সাঁই নিজেকে ভালোবেসে প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করবার জন্য তাঁর অনুরূপ দেহ সৃষ্টি করলেন। মানবরূপে তিনি নিজ প্রেম আস্বাদন করছেন। মানবের ভিতরে তিনিই বিরাজিত। মানব মাত্রেই সাঁইয়ের অভিব্যক্তি। মানব আর সাঁই অভিন্ন সূত্রে গাঁথা, জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সম্বন্ধ অভেদ অটুট। ব্যক্তিসত্তা পরম সত্তায় বিলোপ হওয়ার মধ্যেই তার সার্থকতা।[৭]

আরজান শাহ্ ভক্তদের মাঝে আলোচনায় বলতেন: মন্ত্রের চেয়ে সত্য বড়, বিধানের চেয়ে মানুষ বড়। এই মানুষতত্ত্বকে প্রাধান্য দিতে হবে। মানুষতত্ত্ব আসলে মানুষ-পূজা নয়। মানুষের মাঝে আরেক মানুষ বসবাস করে। এই বক্তব্যের সমর্থনে তিনি কোরান ও হাদিসের সাক্ষ্য উপস্থাপন করতেন।

মানুষই স্রষ্টার সর্বোত্তম সৃষ্টি, মানুষের বাইরে কিছুই নাই। আরজান শাহ্ বলেন–

মানুষ বিনে আর কিছু নাই।
নৈরাকারে বিশ্ব পরে ভেসেছে এই মানুষ গোসাঁই ॥
ধন্ধকার অন্ধকারময় সাকারেতে আধার ধেয়ায়
দীপ্তাকারে হয়ে উদয় মানুষ রূপে লীলা দেখায় ॥
মানুষে মানুষের কারবার আশুক নাম দুহাকার
মনসুর হাল্লাজ মানুষ আকারে সে ফুকারিয়া আল্লা কবলায়।
চাঁদপতি কয় আরজানেরে, ভজো বর্তমানে এই মানুষ ধরে
এই মানুষে অটল বিহারে অখণ্ড গোলাকে আশ্রয় ॥[৮]

অরূপ রতন পরম সত্তার খণ্ডরূপে দেহের মাঝেই বাস করে। তাঁকে জানার সাধনাই শ্রেষ্ঠ সাধনা। কারণ তাঁকে চিনলেই পরমকে চেনা যায়। সংসার জগতে বাস করেও মুর্শিদ ভজলে পরমের সন্ধান পাওয়া যায়। আরজান শাহ্ বলেন:

ভজো এই মানুষকে
পরম পদার্থ মানুষ, বিনয় করে বলি তোকে ॥
মানুষ তত্ত্ব সত্য বটে মানুষ রয় মানুষের নিকটে
জ্ঞান চক্ষু যাহার ফোটে, সে বর্তমানে ভজে তাকে ॥[৯]

আল্লাহর নুরে মুহম্মদের সৃষ্টি, মুহম্মদের নুরে সারে জাহান সৃষ্টি। সেই পারের কাণ্ডারী নবী মুহম্মদ আজ আমাদের মাঝে নেই, তাহলে কে আমাদের মুক্তির দিশা দিবেন। নবী না থাকলেও মুহম্মদের নুর রয়ে গেছে আউলিয়া ও পীরের মধ্যে। সেই নুর চিনে নুরে মুহম্মদীকে ভজতে হবে। আরজান শাহ্ বলেন:

ক. খোদার নুরে সেই নবী নুরী
আউয়াল আখের বাতন জাহের দুই ভেদ করলেন জারি॥
বিলায়েত জানলে সিনায় নবুয়ত বোঝায় জাহেরায়
রসুলের তরিকা আইন তাহারই।[১০]

খ. নুর ধরো নুর সাধো এবার চৌদ্দ ভুবন নুরে গোলজার
যে নুরেতে আকার সাকার যোগ বিয়োগে লীলা করে।
অন্ধকারে দীপ্তাকারে হয় পিতাপুত্র এক বস্তু হয়
নুরের মাজার দুই মিশে রয় পতি কয় আরজানের তরে॥[১১]

সাধক বলেন, যাকে সৃষ্টি না করলে পৃথিবীর কোন কিছুই সৃষ্টি করা হতো না, সেই নুরে মোহাম্মদ কি সত্যি সত্যিই মারা গেছেন? এ কথা ভাবাও যে মহাপাপ। জীবন্ত নবী আমাদের মাঝে না থাকলেও 'নুরে মোহাম্মদ' এখনো আছেন। হাদিস শরীফে আছে "আল উলামাউ ওয়ারেছাতুল আম্বিয়া।" অথাৎ নবীর অবর্তমানে জ্ঞানী সম্প্রদায়ই হবে নবী রাসুলগণের উত্তরাধিকার। আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনের জন্য একজন আধ্যাত্মিক পীর ধরা প্রয়োজন। তবেই পাওয়া যাবে মানব মুক্তির পথ। আরজান শাহ্ ১৯৫৮ সালে নদীয়া জেলার নফরচন্দ্রপুর গ্রামে তাঁর ভক্ত বাড়িতে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ৭৩ বছর বয়সে সেখানে তিনি দেহ ত্যাগ করেন। সেখানে তাঁর সমাধি ও আখড়া বাড়ি রয়েছে।[১২]

আরজান শাহ্ যে পাঁচশ গান লিখেছেন তা তত্ত্বকথায় ভরপুর। গুরু বা মুর্শিদ যে এ জগতে পরম সম্পদ এবং স্রষ্টা যে গুরু-রূপে শিষ্যকে সাধনপথে পরিচালিত করছেন এটিই সাধকের বিশ্বাস। কবি অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী, সৃষ্টি ও স্রষ্টাকে অভেদ কল্পনা করেন। গুরুকে পরমসত্তা বা মনের মানুষ হিসেবে মনে করেন। মানবগুরুর প্রতি ভক্তি নিষ্ঠা না হলে সর্বোচ্চ গুরু ভগবানের অনুগ্রহ লাভ হয় না। মানব-গুরু সেই পরমগুরুরই প্রতিনিধি। সেই মানব-গুরু মুর্শিদের চরণে নিজেকে সমর্পিত করলেই জীবনের আঁধার ঘুচে যাবে। বাউল কবি আরজান শাহ্ তাঁর গানে বলেন–

ক. গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু, গুরু গুরু মহেশ্বর
গুরু ধর্ম গুরু কর্ম, গুরু চার যুগের সার ॥
অজ্ঞান তমোমধ্যে জ্ঞানাঞ্জন শলাকায়
চক্ষু উন্মীলন করায় গুরু সুজ্ঞান দেখায়
শিষ্য উদ্ধারে পরাৎপর ঈশ্বর
শ্রেষ্ঠ মন্ত্রদাতা গুরু দুর্বলের কৃপার সাগর ॥[১৩]

খ. গুরুদেব মন্ত্রদাতা পূর্বে যে যাহার
সেই গুরুর যে দাসী হবে জন্ম জন্মান্তর
প্রতি জন্মেতে গুরু দেবতার সার
দাস আরজান বলে পতির বলে গুরুর তুলনা কি দিব আর ॥[১৪]

কবির এই গানের সাথে বাউলসম্রাট লালন শাহ্-এর গানের সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। লালন শাহ বলেন:

ক. মুরশিদ বিনে কি ধন আছেরে এ জগতে।
মুরশিদ চরণ-সুধা
পান করিলে হরে ক্ষুধা;
করোনা দেলে দ্বিধা
যেহি মুরশিদ সেহি খোদা।
ভজো 'অলিয়ম মুরশেদা'
আয়াত লেখা কোরানেতে।

খ. আপনি খোদা আপনি নবী
আপনি সেই আদম ছবি
অনন্তরূপ করে ধারণ,
কে বোঝে তার নিরাকরণ
নিরাকার হাকিম নিরঞ্জন
মুরশিদ রূপে ভজন পথে ॥[১৫]

লালন শাহ্ বললেন আরো স্পষ্ট করে। কোরানে আছে যে, স্রষ্টাই আমাদের পথ প্রদর্শক। সেই নিরঞ্জন নিরাকার হাকিম খোদা-মুরশিদ রূপে সাধন পথে আমাদের পরিচালিত করছেন। তিনি নানারূপে বিরাজ করেন। তাঁর সমস্ত জ্ঞান, প্রেম ও শক্তির প্রকাশ মুহম্মদে। সে সমস্ত শক্তিই আদমে রূপায়িত। মানবের অন্তর্নিহিত সত্তা বা আত্মারূপে সর্বমানবে তাঁর অবস্থিতি। সুতরাং আল্লা, নবী, আদম অর্থাৎ সকল মানব মূলে এক সত্তা, কেবল রূপ ভিন্ন। সকল মানুষের মধ্যে স্রষ্টার অস্তিত্ব নিহিত থাকলেও যারা ধ্যান-ধারণা ও স্রষ্টার প্রেম-সাধনায় তাঁদের মধ্যে স্রষ্টার শক্তির পূর্ণবিকাশ সাধন করতে পারেন, তাঁরাই পূর্ণমানব বা সাধুগুরু। এই সাধুগুরু মানুষকে সাধন পথে পরিচালিত করছেন। কবি আরজান শাহ্ বলেন—

ভক্তের রূপে রূপ মিশায়ে ফিরি আমি মন্ত্র দিয়ে
দ্বারে গিয়ে ভিখারীর মতন।
ভক্তের সাথে নাই মোর জুদা
আছি ভক্তের দ্বারা বাঁধা
যদি থাকে ভব। ক্ষুধা গুরুসুধা খাওরে মন
লা ইলাহা শূন্য হইল ইল্লাল্লা নামে মিশিল
ভক্তের হইল ইল্লাল্লা জীবন ॥
আশকের মাশুক যিনি, ভক্তের জন্য কাঁদেন তিনি
আরজান হল পেরেশান-ই, দাও পতি যুগল চরণ ॥[১৬]

গুরুর রূপে যে নয়ন-মন বিদ্ধ করেছে, অর্থাৎ দায়েমী সালাত কায়েম করেছে, সে-ই গুরুর মাঝে নিরঞ্জনের দেখা পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে পাঞ্জু শাহ্ বলেন–

রূপে যে দিয়াছে নয়ন
সে জেনেছে ব্রহ্মাণ্ড-মাঝে গুরুরূপে নিরঞ্জন।
জেনে শুনে সঁপেছে সে গুরূপদে দেহমন॥
তার মন হয়েছে ফুলের জ্যোতি, মধুর রতি উপার্জন।
মধুর লোভে গুরু করে আত্মার সঙ্গে সম্মিলন॥
তার হৃদয় মাঝে রাজা, গুরু প্রজা সর্বক্ষণ।
পূজা করে প্রাপ্তি করে নিত্য মধুর বৃন্দাবন॥
সে নিত্যসেবায় বর্ত থেকে করছে প্রেমের আস্বাদন।
সে সঙ্গে অযোগ্য হয়ে অধীন পাঞ্জুর যায় জীবন॥[১৭]

ইসলামী সৃষ্টিতত্ত্ব ও সুফিমতে হযরত মুহম্মদ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির মূল কারণ। বস্তুত এই নবীই সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ শিক্ষক, যাঁর অনুসরণ ব্যতীত বিশ্বপ্রভুর সান্নিধ্য লাভ সম্ভব নয়। কিন্তু তিনিতো অন্তর্নিহিত, বাস্তবে তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না। তাহলে পথের দিশা কে দেবেন? বস্তুত এই দিশারী নবীর প্রতিনিধি একজন তত্ত্বজ্ঞানী মানুষ, যাঁর তত্ত্বাবধানে দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়। সুফি পরিভাষায় যাঁকে বলা হয় মুরশিদ, তন্ত্রে তিনি গুরু নামে অভিহিত। আরজান শাহের মতে এ গুরুই পথের দিশারী। গুরু ব্যতীত ভজন-সাধন বৃথা। গুরুকে এঁরা সাঁই অর্থাৎ স্বামী বা প্রভু বলেন। এঁরা রূপময় গুরুকে ভজনা করেন। গুরুর প্রেমে মত্ত হয়ে নিজে প্রজ্বলিত হন ও অমরত্ব লাভ করেন। গুরুর বীজমন্ত্র নিজ দেহে ধারণ করে দেহকে পবিত্র করেন।[১৮] আরজান শাহ্ তাঁর গানে বলেন:

গুরু প্রেম সুধা সিন্ধু পিয়ো যত ভক্তগণে।
ঊর্ধ্ব ধর্ম পাবি জন্ম রাখো হৃদয় পদ্মাসনে ॥
ষটচক্র ভেদ করিবে আত্মায় আত্মা মিশে যাবে
স্বমরণে মরে রবে দেখতে পাবে দুই নয়নে ॥
পাপের দেহ পাক হইবে নিত্য গুরু বর্ত হবে
সকল আশা পুরে যাবে দাসী হবে শ্রীচরণে
পতিচাঁদের এই বচন ঘুচে যাবে ভব বন্ধন
আরজান সদা করে রোদন মনের বেদন চরণ বিনে ॥[১৯]

কবি একজন তত্ত্বজ্ঞ সাধক। তত্ত্বকথা শ্রবণ, তত্ত্বসার গ্রহণ এবং তত্ত্ববিষয়ক চিন্তাই তাঁর মূল লক্ষ্য। তিনি সাধনার দ্বারা বুঝতে পেরেছেন– নশ্বর এই দেহভাণ্ডে পরম পুরুষের অস্তিত্ব বর্তমান। সীমাবদ্ধ জীবদেহে অসীমের লীলা বড় বিস্ময়কর। কবি আরজান শাহ্ সত্য লাভের জন্য দেহের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নানাবিধ মাধ্যমের বিকাশ ঘটানোর সাধনা করেছেন। তিনি

অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী, সৃষ্টি ও স্রষ্টাকে অভেদ কল্পনা করেন। গুরুকে পরমসত্তা বা মনের মানুষ হিসেবে মনে করেন। তাঁর মতে মনের মানুষের বাস এই দেহের মধ্যে। এই দেহের সাধনা করলেই মনের মানুষ পাওয়া যাবে। কবি আরজান শাহ্ বলেন–

ক. মানুষে মানুষ মিশেছে দেখো রে মন নজরে।
আছে আত্মারূপে পরমাত্মা চেনো গুরু ধরে ॥
মোকাম মঞ্জিল চিনো আগেতে,
খোদা বান্দা মুহম্মদ যুগল একসাথে।
কুদরত বারি কুদরত তারই তৈয়ারি এক নুরে ॥
গুড়ের সাথে মিছরি যেমন রয়,
গাছে বীজে যুগলে আছে ভিন্ন ভেদ নয়,
সকশো আকশো যুগল আছে দেখো আয়নার দ্বারে ॥

খ. করো দেখি মন আয়নার ঠিকানা,
আল্লা কুল্লে সাঁই কাদির বর্ত দেখো না
আদলা কানা হয় যে জনা চিনবে কি করে ॥
করব কি তার রূপের বর্ণনা
যদি কেহ দেখে থাকে সে তো বলবে না
হল আরজান ঠেঁটা মোনাকাটা চেনে না পতিরে ॥[২০]

এ সম্পর্কে নেত্রকোণার প্রখ্যাত বাউল কবি জালাল খাঁর গান–

মানুষ ভজো কোরান খুঁজো, পাতায় পাতায় সাক্ষী আছে,
মানুষ থুইয়া খোদা ভাজো, এ মন্ত্রণা কে দিয়াছে।[২১]

আর মরমি কবি খোদা বক্শ শাহ্ বলেন–

এই মানুষে আছে মানুষ
মানুষ ধরলে জানা যায়
ভবের মানুষ দেখতে বেহুশ,
মানুষ ছাড়া কিছুই নাই ॥[২২]

মানবদেহ মহাসত্তার একটি রাজত্ব – 'যাহা আছে ব্রহ্মাণ্ডে তাহা আছে মানব ভাণ্ডে'। এই মানবতত্ত্বকে জানলে আত্মতত্ত্বকে জানা যায়। স্রষ্টাকে পাওয়ার জন্য কবি দেহ সাধনার পথ অবলম্বন করেছেন। মাটির দেহ হচ্ছে সেই আরাধ্যের বারামখানা। বাইরে না খুঁজে দেহের মধ্যেই তাঁকে খোঁজ করতে হয়। কবি মানবদেহকে আরাধনাস্থান বলে মনে করেন। এই মানবদেহের পবিত্রতা রক্ষা করতে হলে গুরুবস্তু বা বীর্য রক্ষার বিকল্প কিছু নেই।[২৩] এই বীর্য হচ্ছে মানব দেহের চালিকা শক্তি। এই বীর্যকে গুরুবস্তু, গুরুধন, মহাজনের মাল, পুঁজি

ইত্যাদি বলে সাধকেরা আখ্যায়িত করেছেন। দেহের সারবস্তু এই বীর্য মানুষের পরম সম্পদ। এই গুরুবস্তুকে অতিযত্নে রক্ষা করে চলতে হয়। মহাজন এই মাল বা পুঁজি দিয়ে সংসারের ব্যবসায় পাঠিয়েছেন। এই পুঁজি রক্ষা করতে না পারলে ব্যবসার মূলই ধ্বংস হয়ে যাবে। নানা রিপুর উত্তেজনায় এই গুরুবস্তু নষ্ট হয়, হারিয়ে যায়; তাতে সাধন ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। শুদ্ধরসের রসিক যে হতে পারে, তার গুরুবস্তু নষ্ট হয় না। তার টলাটলের ভয় থাকে না, শমন তাকে শৃংখলিত করতে পারেনা। আরজান শাহ্ বলেন–

ক. শুদ্ধ রসের রসিক হয় যে জনা
তার নাই টলাটল সুখের কপাল শমনে পারে না।
পঞ্চ রসের ভিয়ান করে হেতু সত্তা দিয়ে দূরে
চারেতে এক রঙ করে মেরেছে দেখো না
ঈশ্বর রতি হৃদে ধরে পুরালে বাসনা ॥
কামরতি দূরে রেখে শুদ্ধ প্রেমে দেহ ঢেকে
বসে সেই প্রেমের চাকে মধু খায় দেখো না।
সে কাল শমনকে ফাঁকি দিয়ে করে উপাসনা ॥

খ. নিষ্ঠারতি শুদ্ধমতি প্রেমে মাখা প্রেম পিরিতি
অন্তরে গুরু জ্যোতি গুরু বই সে জানে না
তার ঘটে গুরু পটে গুরু গুরু বই সে দেখে না ॥
স্বরূপের সহায় পেয়ে রূপে স্বরূপ মিশায়ে
যুগল হয়ে আছে তিন জনা ॥
গুরু পতির চরণ করো ভজন আরজান তুই ভুলিস না ॥[২৪]

সাধন পদ্ধতি বা অটল সাধনাকে সাধকেরা রতিনিরোধ সাধনা বা বিন্দুসাধনা নামেও অভিহিত করেন। অতিরিক্ত বিন্দু ক্ষয়ের ফলে মানবদেহ ধীরে ধীরে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। আয়ুষ্কাল কমে যায়। দেহ রোগাক্রান্ত হয়, দৈহিক ও মানসিক শক্তি লোপ পায়; লোপ পায় জীবনীশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি। বিন্দু রক্ষা সাধনার মাধ্যমে মানুষের আয়ু বৃদ্ধি পায়। এই বিন্দু রক্ষার সাধনাকে অটল সাধনাও বলা হয়। অটল সাধনার জন্য সাধকেরা মল, মূত্র, রজঃ, বীর্য, স্তনদুগ্ধ বিনা দ্বিধায় সাধনার অঙ্গ হিসাবে ভক্ষণ করেন। রমণীর ঋতুস্রাবের প্রথম তিনদিন সেই অটল মানুষ মস্তক থেকে নেমে এসে রজের সাথে মিলিত হয়ে মূলাধারে আত্মপ্রকাশ করেন। চতুর্থ দিনে পুনরায় মস্তকে ফিরে চলে যায়। সাধকেরা এই তিনদিন মীনরূপী সাঁইকে ধরার নিমিত্তে ত্রিবেণীর ঘাটে শিকারীর মতো বসে থাকেন এবং এই তিনদিনকে সাধকগণ মহাযোগ ও প্রথম দিনকে অমাবস্যার কাল বলে থাকেন। এ সময় পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয়। অনেক সাধক রজঃ স্রাবের প্রথম দিন প্রথম বর্ষণের বিন্দু পান করেন। কারণ, জরা-মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে অমরত্ব লাভ করতে হলে বিন্দু পান অবশ্যই

করতে হবে। সাধককে এই ত্রিবেণী বা ত্রি-মোহনার স্রোতের ধারা বুঝে সাধনায় লিপ্ত থাকতে হয়।[২৫] এই ত্রিবেণীর ঘাটে ধারা বুঝে স্নান করলে পাপ থাকেনা। কবি আরজান শাহ্ তাঁর গানে বলেন–

নবগঙ্গা সরস্বতী ত্রিবেণী নাম যার
করো খণ্ড আপন ভাণ্ড নদী সরোবর॥
সপ্তনদী তিনটি ধারা, সেই নদীর জলে স্নান তাতে করলে
নিখিল পাপ তার দূরীভূত হয় সাধুতে বলে
তিন রসের রসিক যেজন সেই পেয়েছে সন্ধান তার॥
উপর চার নীচেতে তিন এই সাত ধারাতে
সপ্ত রস খেলে তাতে
দিচ্ছে সাঁতার রসিক শেখর সেই নদীতে
মানুষের গমনাগমন রয়েছে তাহার উপর॥
স্থূল হতে সূক্ষ্মদেশে যে জনা চলে
যেয়ে মেশে সে মূলে
সপ্ত তলা গেছে খোলা, তার ভাগ্যে মেলে
আরজান বলে পতির বলে অন্তিমে ঐ চরণ সার॥[২৬]

এই ত্রিবেণীর ধারে মীনরূপী সাঁই-এর আগমন সম্পর্কে লালন শাহ্ তাঁর গানে বলেন–

সময় বুঝে বাঁধাল বাঁধলে না।
জল শুকালে মীন পালাবে
পস্তাবি ভাই মনা॥
ত্রিবেণীর তিন ধারে মীন রূপে সাঁই বিহার করে
তুমি উপর উপর বেড়াও ঘুরে
সে গভীরে ডুবলে না।[২৭]

এই ত্রিবেণী বা স্ত্রীর যৌনাঙ্গের ধারে মীনরূপী সাঁইয়ের আনাগোনা হয়। মাসিক শেষ হবার পর তিন দিন ধরে যখন স্ত্রীর যোনি পথে শ্লেষ্মাজাতীয় পদার্থ নির্গত হয় তখন স্ত্রীর ডিম্বকোষ থেকে ডিম ফেটে বেরিয়ে যোনি পথে আসে। এই সময় যোনিপথে শ্লেষা জাতীয় পদার্থ থাকলে এবং তখন দৈহিক মিলন ঘটলে শুক্রকীট ডিম্বের সাথে মিশে গেলে স্ত্রীর সন্তান সম্ভাবনা থাকে। আর যোনিপথ শুষ্ক থাকলে সন্তান সম্ভাবনা থাকে না। তাই সাধককে ধারা বুঝে সাধন পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয়। তা না হলে সুধার লোভে গরল খেয়ে প্রাণে মারা যাবে। আরজান শাহ্ বলেন–

মূল সাধন সেই যে করণ তা কি সকলে পারে
সুধার লোভে গরল খেয়ে প্রাণেতে মরে ॥

রূপের কালে না যায় চেনা
দুগ্ধের নদী হয় যে নোনা
পিতল বলে ফেলায় সোনা, চিনিতে না পারে
গুরু যারে দয়া করে সেইতো অনুরাগের জোরে
গরল সেরে সুধা সুখে পান করে ॥
মরে না সে জল পিয়াসে মেঘ ঘোরে তার পাশে পাশে
কালা মেঘের বারি এসে তারে কালা রং করে ॥
বিষেশ্বরী বিষের ঘরে ঠেক মানেনা গুণমন্তরে
চাঁদপতি যদি করে অধীন আরজানের তরে ॥[২৮]

বাউল সাধনায় দেহকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং সে কারণে এই সাধনায় গুরুর প্রাধান্য। গুরু ব্যতিরেকে এই সাধনায় সফলতা আসবে না। মুরশিদ যেমন জীবনের জন্য অপরিহার্য, তেমনি সাধনায় নারী সাধিকা অপরিহার্য। যথার্থ সাধিকার সঙ্গ ছাড়া সিদ্ধ হয় না পুরুষ দেহ। নারীর শ্বাসের কাজ, দেহতত্ত্ব জানা, বস্তু রক্ষার প্রণালী পুরুষের মতই। গুপ্ত অঙ্গ, দৈহিক গঠন এবং দেহবর্ণনানুযায়ী পদ্মিনী, হস্তিনী, শঙ্খিনী এবং চিত্রিণী নারী চিহ্নিত করা হয়। সাধনায় শঙ্খিনী ও পদ্মিনী সাধিকা নারীই পারে পুরুষের দেহ সহজে শুদ্ধ করতে। এই নারীর সংখ্যা বিরল। গুরু সদয় হলে গুরুই বেছে দেবেন এই নারীকে। গুরু সেবা দিয়ে গুরুকে সন্তুষ্ট করতে হয়। গুরুর নাম সর্বক্ষণ জপতে হয়। আরজান শাহ্ বলেন–

আগে গুরু সেবা দেগা
সত্য জেনে গুরু সনে মরা হয়ে রগা॥
বাঁকাতন ফানা করে মরে সেই মরার ঘরে
দশদ্বারে চাবি মেরে গুরু নাম জপ গা
যাতে জাহান ফানা হয়ে যাবে
সেই কাজ করগা॥[২৯]

বাউল পন্থায় নারীর বিশেষ গুরুত্ব ও সম্মান আছে। ধরণীর রসে নারী, তারই উপাসনা বাউল মতের মর্মকথা। বাউল সমাজ নারী-পুরুষ দু'জনকে সমান মনে করে। কিন্তু তত্ত্বগতভাবে নারীই শ্রেষ্ঠ। নারী দীক্ষা নিলে সে গুরুর সম্পত্তি বলে বিবেচিত হয় এবং স্বামীর সঙ্গে তার মাতৃ-সম্পর্ক স্থাপিত হয়। বাউল-স্বামী দীক্ষিতা স্ত্রীকে প্রণাম করে। স্ত্রী গুরুর সম্পত্তি। তাকে রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার স্বামীর আছে। কিন্তু যথেচ্ছ ব্যবহারের অধিকার নেই। স্ত্রীকে নিপীড়ন বাউল তত্ত্বে গর্হিত অপরাধ। নারীকে ভজনা করার, মান্য করার, তার অধীনতা স্বীকার করে তাকে প্রসন্ন করার তত্ত্ব গুরু শিষ্যকে জানান।

নারী আদিশক্তি। তিনি অর্ধচেতন পুরুষ-শুক্রকে নিজ সত্তার সঙ্গে মিলিত করে প্রাণ সঞ্চার করেন এবং দেহীর জন্ম দেন। নারী বা মাতৃজাতির শ্রদ্ধা সবার ওপরে। কবি বলেন–

মা জগতের শিরোমণি মা জগতের শিরোমণি
মা হলো পরম দাতা, শিরের জীবন আত্মা,
শিশু পালন কর্তা, মা জননী
মা হলো পরম গুরু, ঐ ভবের কল্পতরু।[৩০]

আর দুদ্দু শাহ্ বলেন–

মেয়ের চরণ নেরে মাথায় করে।
মেয়ে বিনে এ ভুবনে গতি নাই রে ॥
ত্যাজে নারী বনবাসী
হলিরে মর্কট সন্ন্যাসী।
মেয়ের চরণে গয়াকাশী
দেখলিনে রে ॥[৩১]

এ সম্পর্কে হালিম বয়াতী বলেন–

প্রেম সোহাগে পরশ রতন
মাইয়ার কাছে পাওয়া যায়
সেই পরশ স্পর্শ করলে
লোহার টুকরা স্বর্ণ হয় ॥[৩২]

নারী হলেন চেতনগুরু। তার সহায়তা ছাড়া কারো পক্ষে দেহসাধনায় সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব নয়। নারী-দেহে নানা মূল্যবান বস্তু রয়েছে। নারী-রজঃ এবং অন্য তিন চন্দ্র, স্তন-দুগ্ধ, কুমারীর প্রথম স্রাব, কুমারী দেহের রসাদী দেহ রক্ষার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ। নারী প্রসন্ন হয়ে দেহের মূলবস্তু পুরুষ দেহে দিলে পুরুষদেহ অটল স্বর্ণে পরিণত হয়। কামনারত দেহীর শুক্রকে স্খলিত করে তিনি জীবের মৃত্যু ঘটান। এভাবেই নিশীথে পারঘাটায় নারী নরবলী গ্রহণ করেন। আবার নারী মাতৃভাবে কল্পিতা বা বন্দিতা হলে তিনি জীবকে হত্যা করেন না। মাতৃ সম্পর্কে কাম নেই। নারীর ওপর মাতৃভাব আরোপ করলে সেখানে প্রেম থাকে। কামনা-বাসনা দূরগামী হয়, এ সম্পর্কে স্থায়ী আনন্দে উপনীত হওয়া যায়।

পর্যালোচনা করলে দেখা যায় কবি আরজান শাহের গানের তত্ত্বমূল্য যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে তার সাহিত্যমূল্য। জীবনের বিপুল অভিজ্ঞতাকে এবং আধ্যাত্মিক সাধনালব্ধ জ্ঞানকে প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি যে ভাষা ব্যবহার করেছেন– তা অলংকারে ভূষিত। বাউল ভাবমাধুর্যে পরিপূর্ণ তাঁর গানগুলো মেহেরপুর অঞ্চলের শ্রোতাদের মুগ্ধ করে আসছে। সবসময় অন্তর্নিহিত তত্ত্ব না বুঝলেও সুরের ইন্দ্রজালে শ্রোতারা তন্ময় হয়ে যায়। একটি

উদাসী মাটির সুর তাদেরকে পৌঁছে দেয় অতীন্দ্রিয় ভাবলোকে। সর্বোপরি অনির্বচনীয় রসলোকের সন্ধান দেয়। তাঁর সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অপূর্ব গীতিময়তা। শিল্পীকণ্ঠে গীত হয়ে এসব সঙ্গীত একটা ভাবের প্লাবন সৃষ্টি করে। উদাসী মাটির সুর শ্রোতাকে অতীন্দ্রিয় ভাবলোকে নিয়ে যায়।

তথ্যনির্দেশ

১. তথ্যদাতা: কবির মেয়ে মোসাঃ লতিফা, গ্রাম: ইছাখালী, ডাকঘর: গোভীপুর, থানা: মেহেরপুর, জেলা: মেহেরপুর, বয়স: ৫৩, পেশা: গৃহিণী সংগ্রহকাল: ০৫.০৯.২০০৮।

২. তথ্যদাতা: কবির মেয়ে মোসাঃ জাহানারা, গ্রাম: ইছাখালী, ডাকঘর: গোভীপুর, থানা ও জেলা: মেহেরপুর, বয়স: ৪৯, পেশা: গৃহিণী, সংগ্রহকাল: ০৫.০৯.২০০৮।

৩. তথ্যদাতা: ফরমান ম"ল, পিতা: পাঁচু ম"ল, গ্রাম: ইছাখালী, ডাকঘর ও জেলা: মেহেরপুর, বয়স: ১০১, পেশা: কৃষি, সংগ্রহকাল: ১২.০৯.২০০৮।

৪. লেখকের সংগ্রহ: আবদুস সাত্তার ফকির, পিতা: পাচু শেখ, গ্রাম: ইছাখালী, ডাঘর: গোভীপুর, থানা ও জেলা: মেহেরপুর, বয়স: ১০০, পেশা: ফকিরী, সংগ্রহকাল: ০৫.০৯.২০০৮।

৫. নিজস্ব সংগ্রহ: মোঃ গোলাম হোসেন, পিতা: এমলাক হোসেন, গ্রাম: সাহার বাটি, ডাকঘর: ভাটপাড়া, থানা: গাংনী, জেলা: মেহেরপুর, বয়স: ৬০, পেশা: কৃষি, সংগ্রহকাল– ২৯.০৮-২০০৮।

৬. কথক: আবদুর রশিদ সোনা, পিতা: মোসলেম সেখ, গ্রাম: কামদেবপুর, ডাকঘর: গোভীপুর, জেলা: মেহেরপুর, বয়স: ৭৫, পেশা: কৃষি, সংগ্রহকাল– ১২.০৯.২০০৮।

৭. কথক: মো: আইয়ুব আলী, পিতা: ঈমান আলী, গ্রাম: ইছাখালী, পূর্বোক্ত, বয়স: ৭৬, পেশা: দলিল লেখক, সংগ্রহকাল: ১২.০৯.২০০৮।

৮. লেখকের সংগ্রহ: নেয়ামত আলী, পিতা: পাঁচু ম"ল, গ্রাম: ইছাখালী, ঠিকানা: পূর্বোক্ত, বয়স: ৬৫, পেশা: কৃষি, সংগ্রহ কাল: ১৯.০৯.২০০৮।

৯. লেখকের সংগ্রহ: মনোহর, পিতা: ইয়া"ড়লণ্ঢা, গ্রাম: ইছাখালী, ঠিকানা: পূর্বোক্ত, বয়স: ৬০, পেশা: কৃষি, সংগ্রহকাল: ১৯.০৯.২০০৮।

১০. লেখকের সংগ্রহ: আক্কাস আলী, গ্রাম: চৌগাছা, ডাকঘর: গাংনী, থানা: গাংনী, জেলা: মেহেরপুর, বয়স: ৪২, পেশা: কৃষি, সংগ্রহকাল: ০৫.০৯.২০০৮।

১১. লেখকের সংগ্রহ: কথক, মুছা কলিম, গ্রাম: ভাটপাড়া, ডাকঘর: ভাটপাড়া, থানা: গাংনী, জেলা: মেহেরপুর, বয়স: ৫০, পেশা: কৃষি, সংগ্রহকাল: ০৫.০৯.২০০৮।

১২. লেখকের সংগ্রহ: কবি আরজান শাহের মেয়ে মোসাঃ লতিফা, গ্রাম: ইছাখালী, ডাকঘর: গোভীপুর, থানা: মেহেরপুর, জেলা: মেহেরপুর, বয়স: ৫৩, পেশা: গৃহিণী, সংগ্রহ কাল: ০৫.০৯.২০০৮।

১৩. ঐ

১৪ লেখকের সংগ্রহ: কবি আরজান শাহের মেয়ে মোসাঃ জাহানারা, গ্রাম: ইছাখালী, ডাকঘর: গোভীপুর, থানা ও জেলা: মেহেরপুর, বয়স: ৪৯, পেশা: গৃহিণী, সংগ্রহকাল: ০৫.০৯.২০০৮।

১৫. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বাংলার বাউল ও বাউল গান, কলকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৩৭৮, পৃ. ৫৮৭।

১৬. লেখকের সংগ্রহ: কথক – ফরমান মন্ডল, পিতা: পাঁচু মন্ডল, গ্রাম: ইছাখালী, ডাকঘর ও জেলা: মেহেরপুর, বয়স: ১০১, পেশা: কৃষি, সংগ্রহকাল: ১২.০৯.২০০৮।

১৭. লেখকের সংগ্রহ: আবদুস সাত্তার ফকির, পিতা: পাঁচু শেখ, গ্রাম: ইছাখালী, ডাঘর: গোভীপুর, থানা ও জেলা: মেহেরপুর, বয়স: ১০০, পেশা: ফকিরী, সংগ্রহকাল: ০৫.০৯.২০০৮।

১৮. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বাংলার বাউল ও বাউল গান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪৩।

১৯. লেখকের সংগ্রহ: কথক, মোঃ গোলাম হোসেন, পিতা: এমলাক হোসেন, গ্রাম: সাহার বাটি, ডাকঘর: ভাটপাড়া, থানা: গাংনী, জেলা: মেহেরপুর, বয়স: ৬০, পেশা: কৃষি, সংগ্রহ কাল– ২৯.০৮-২০০৮।

২০. কথক: আবদুর রশিদ সোনা, পিতা: মোসলেম সেখ, গ্রাম: কামদেবপুর, ডাকঘর: গোভীপুর, জেলা: মেহেরপুর, বয়স: ৭৫, পেশা: কৃষি, সংগ্রহকাল– ১২.০৯.২০০৮।

২১. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *বাংলার বাউল ও বাউল গান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪৩।

২২. লেখকের সংগ্রহ: কথক, বাদশা ফকির, গ্রাম: শাদীপুর, ডাকঘর: সারদা, থানা: চারঘাট, জেলা: রাজশাহী, বয়স: ৫৫, পেশা: কৃষি, সংগ্রহকাল: ১৪.০৯.২০০৮।

২৩. খোন্দকার রিয়াজুল হক, *মরমী কবি খোদা বক্শ শাহ: জীবন ও সঙ্গীত*, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭, পৃ. ১৪১।

২৪. লেখকের সংগ্রহ: মো: গোলাম হোসেন, পিতা: এমলাক হোসেন, পূর্বোক্ত।

২৫. কথক: মো: আইয়ুব আলী, পিতা: ঈমান আলী, গ্রাম: ইছাখালী, পূর্বোক্ত, বয়স: ৭৬, পেশা: দলিল লেখক, সংগ্রহকাল: ১২.০৯.২০০৮।

২৬. লেখকের সংগ্রহ: মো: গোলাম হোসেন, পিতা: এমলাক হোসেন, পূর্বোক্ত।

২৭. খোন্দকার রফিউদ্দিন, ভাব সঙ্গীত, র‍্যামন পাবলিশার্স, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৬, পৃ. ১১৩।

২৮. লেখকের সংগ্রহ: নেয়ামত আলী, পিতা: পাঁচু মন্ডল, গ্রাম: ইছাখালী, ঠিকানা: পূর্বোক্ত, বয়স: ৬৫, পেশা: কৃষি, সংগ্রহকাল: ১৯.০৯.২০০৮।

২৯. লেখকের সংগ্রহ: মনোহর, পিতা: ইয়াস্ড়লণ্ডা, গ্রাম: ইছাখালী, ঠিকানা: পূর্বোক্ত, বয়স: ৬০, পেশা: কৃষি, সংগ্রহকাল: ১৯.০৯.২০০৮।

৩০. লেখকের সংগ্রহ: আক্কাস আলী, গ্রাম: চৌগাছা, ডাকঘর: গাংনী, থানা: গাংনী, জেলা: মেহেরপুর, বয়স: ৪২, পেশা: কৃষি, সংগ্রহকাল: ০৫.০৯.২০০৮।

৩১. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *বাংলার বাউল ও বাউল গান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১৬।

৩২. শফিকুর রহমান চৌধুরী, *আবদুল হালিম বয়াতি: জীবন ও সঙ্গীত*, বাংলা একাডেমী, ২০০০, পৃ. ৩৮৩।